স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
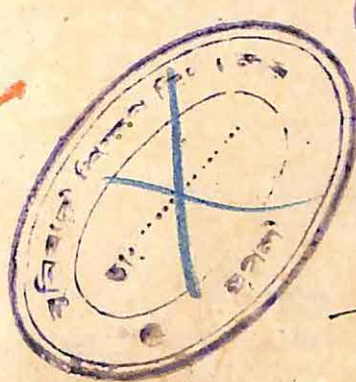
স্বর্গাদপি গরীয়সী

[তৃতীয় খণ্ড]

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
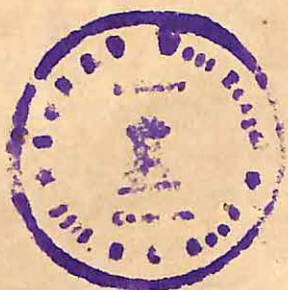
প্রকাশকঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯. ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৫৪
মূল্য চার টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পর্যায়

১
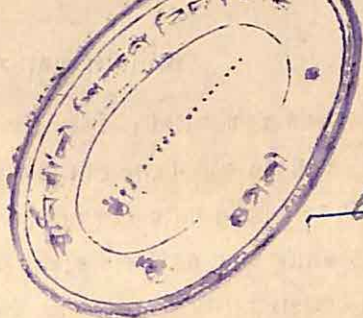
মাকে শৈলেনের প্রথম মনে পড়ে একটি বর্ষার সন্ধ্যায়। সব মিলাইয়া যেমন মনে হয়, ওর নিজের বয়স তখন বোধ হয় সাত থেকে আটের মধ্যে। ওর ছোট ভাই অহি একটু জন্ম-রুগ্ন গোছের ছিল; মা তুলসী-মঞ্চের সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মাথাটা মঞ্চের আলসেতে আলগা ভাবে চাপিয়া প্রণাম করাইতেছেন—বিশ্বাস, ঐ করিলে অহি নীরোগ হইয়া যাইবে। শৈলেন ওদ্দিককার ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—"মা আমিও।"

প্রণামের জন্য নয়, যদিও সেটাও একটা কম হুজুগ নয় সে-বয়সে; আসল কথা তুলসীর মাটি খাইতে হইবে। মূলে পাতা ঝরিয়া শুকাইয়া গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া বেশ সোঁদা সোঁদা গন্ধ আনে, শৈশব-রসনার কাছে খুব একটা উপাদেয় বস্তু। মঞ্চটা উঁচু, তাই মায়ের উপর নির্ভর।

"তা হ'লে আয় শীগ্‌গির"—বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই এক ঝলক আলো কোথা হইতে আসিয়া মা'র মুখের উপর পড়িল।

"ও মা! এখনও সূয্যি ডোবেনি,—আর আমি এদিকে সন্ধ্যে জ্বেলে বসলাম!"—বলিয়া মা আকাশের পানে চাহিলেন, মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে অল্প অল্প হাসি লাগিয়া আছে,—যেন সূর্যদেবের এই লুকোচুরির জন্যই।

ঠাকুরমা পশ্চিমের দাওয়ায় মালা জপিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"পশ্চিম দিকে মেঘটার বুঝি গোড়া কেটে গেল?"

আরও কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ে,—কোন কোনটাতে শুধুই মা আছেন, কোনটা মায়ের সঙ্গে অল্প-বিস্তর জড়িত, কোনটা বা সম্পূর্ণই আলাদা।.... একবার কি একটা দুষ্টামির জন্য শৈলেনের উপর রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন,—একটা পা সামনে বাড়ানো, ডান হাতটা উঁচানো, মুখে হাসি।....পূর্বে বোধ হয় কোথাও বলা হইয়াছে, গিরিবালার রাগের সঙ্গে হাসির একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, ওঁর নিজের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বোধ হয়।

খজনীর কথাও খুব বেশি করিয়া মনে পড়ে। গোল-গোল চোখ, দাঁত

একটু উঁচু, অসম্ভব রকম কালো ; কিন্তু কি অসম্ভব রকম ভালো লাগিত খজনীকে ! তখনকার জীবনে সেই যেন ছিল সব কিছু। শৈলেনের স্মৃতিটা যখন থেকে একটু স্পষ্ট সে সময়ে একেবারে কোলের ছেলে বলিতে ওর ছোট ভাই অহি, মাঝখানে আর একটি ভাই হরেন, সেও বড় হইয়া খজনীর কোল ছাড়িয়াছে। তাহার মানে শৈলেনের সঙ্গে খজনীর আর কোন সম্পর্কই না থাকিবার কথা। একটি করিয়া শিশু আসিতেছে, খজনীর কোল অধিকার করিতেছে, বড় হইয়া পরের শিশুটিকে জায়গা ছাড়িয়া দিতেছে, খজনী আবার নবাগতকে অন্তরের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে—এই ছিল খজনীর জীবনের ইতিহাস। ক্রমাগতই বিদায় দিতে দিতে ওর স্নেহ বিদায় দেওয়ায় যেন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, শুধু শৈলেন আসায় একটা ব্যতিক্রম ঘটিল। স্নেহ তো একটা অভ্যাস নয় ;—যখন মনে হয় সে একটা অভ্যাসের পথ ধরিয়া সামনেই চলিয়াছে, হঠাৎ দেখা যায় তাহার সাধ হইয়াছে একটিকে আশ্রয় করিয়া বাসা বাঁধিবার। তাই, মাঝে অনেক শিশু আসিয়া গেল, কিন্তু শৈলেনের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘোচে নাই খজনীর। শিশু আর কিছু না চিনুক, স্নেহ চেনে ; নবপরিত্যক্ত স্বর্গের স্বাদ আছে কি না তাহাতে ; তাই শৈলেনেরও খজনী না হইলে এক দণ্ড চলিত না, সেই অন্ধকার মূর্তি এক দণ্ড না দেখিলে তাহার নিজের চোখের আলো যেন নিবিয়া যাইত।

খজনীর মতো মিষ্ট ছিল খজনীর বাড়ির মেড়ুয়ার রুটি। প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা ছোট একখানা চাটুর মতো কালো রঙের রুটি তাহার বাড়িতে খুব নিচু ছ্যাচা-বেড়ার ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসাইয়া খজনী খাইতে দিত, সঙ্গে থাকিত একটু শাক, কি বেগুনের একটা তরকারী—টকে, ঝালে, নুণে গরগরে ; কখনও বা চুনো মাছ।....বেশ মনে পড়ে শৈলেনের,—খজনী নিজে খাইতেছে, ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাহার মুখে দিতেছে, ঝালে এক একবার তাহার সাদা সাদা গোল গোল চোখ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। খুব গল্প জমিয়াছে—"তুই আমিকে বেশি ভালবাসিস না তোর মাকে রে খোঁখা ?" শৈলেন বলিল—"তোকে ; মাকে কিন্তু বলিসনি খজনী।"...."কেনো রে ?"..."মা তাহ'লে মরে যাবে।" খজনীর চোখ দুইটা আয়ত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহযোগে অদ্ভুত দেখাইতেছে, মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"হুঁ, তুই বড় বেইমান আছিস খোঁখা, দুলহিনকেই বেশি ভালোবাসিস তুই ; আমিও তোরে ছেড়ে মরে যাবো, তখন সমঝাবি, হুঁ !"

তাহার পর উভয়-সমস্যায় পড়িয়া শৈলেনের মুখের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা দেখিয়া

রুটি তরকারীর হাতেই তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকে জড়াইয়া ধরিল, ঢুলিয়া ঢুলিয়া বলিয়া উঠিল—"নই রে বউয়া, তোরা ছোড় ক' নই মরবেই রে!"

নিজের অংশ থেকে আরও খানিকটা মাছ দিল; খাওয়া হইলে এঁটো মুখটা নিজের কাপড়ে মুছাইয়া, অহিকে কোলে লইয়া তাহারা শৈলেনদের বাসা-মুখো হইল।

রুটি-অভিযানের কথা চাপা থাকিত না, ঠাকুরমা শূদ্রের বাড়িতে খাওয়ার জন্য হৈ-হৈ বকাবকি করিতেন, পিসিমারা গঞ্জনা দিতেন, মা ভয় দেখাইতেন, এবার নিশ্চয় মরিয়া যাইবেন। বিপিনবিহারীর কানে উঠিলে তিনি একেবারে জাতে ঠেলিবার ব্যবস্থা করিতেন। শৈলেনের বেশ মনে আছে, পিতা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনয়টির তোড়জোড় করিতেন,—ছেলেকে জাতিচ্যুত করা হইতেছে বলিয়া নিস্তারিণী দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া সবাইকে উঠানে জড়ো করা হইত শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্য। শৈলেন অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পাশেই খজনী, সেই জাত খাইয়াছে, তাহাকেই বিলাইয়া দেওয়া হইবে। শৈলেন এক একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেছে, যাহার মুখের দিকেই চায়—গম্ভীর। ঘরের দুয়ারে মা দাঁড়াইয়া; ঘোমটার মধ্যে মুখটি দেখা যায় না বলিয়া অশ্রু ভিন্ন আর কিছু কল্পনার মধ্যেই আসে না। দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া বিষণ্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া বড় ভাই শশাঙ্ক; ভাইকে হারাইবার ভয়ে মুখখানি শুকাইয়া গেছে। এখন শৈলেন বুঝিতে পারে ঐ একটি মাত্র লোক তাহারই মতো হইত প্রতারিত।

ব্যাপারটাতে সত্যের রূপ ফুটাইবার জন্য এক এক সময় আবার মোহনা চাকরকে বামনপাড়ায় পুরুত ঠাকুরের নিকট দৌড় করাইয়া দেওয়া হইত, সে অল্প সময়ের মধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিত—পণ্ডিতজীও বিধান দিলেন শূদ্রের বাড়ির রুটি খাইয়াছে, এ-ছেলেকে জাতের বাহির করিয়া দেওয়া ভিন্ন কোন উপায় নাই।

দৃশ্যটা অবশ্য বেশিক্ষণ এভাবে থাকিত না। এ-মুখ ও-মুখ চাহিয়া কোন খানেই আশার বিন্দুমাত্র সঙ্কেত না দেখিয়া শৈলেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। এইটুকুরই অপেক্ষা, অশ্রু নামিলেই চারি দিক্ থেকে বিপিনবিহারীর নিকট সুপারিশ পৌঁছিত—"থাক্, তাহলে না হয় এবার ছেড়ে দে বিপিন···· এবারটা থাক্ দাদা, আর খাবে না, এবারে না হয় আমরা একটু গোবর খাইয়ে জাতে তুলে নিচ্ছি····আবার যদি খায় তো ওর খজনীকে হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুতে ফেলা হবে···"

খজনীর গঞ্জনাটা আগেই এক প্রস্ত হইয়া যাইত, এ সময়েও কয়েকটা ঝাপটা গিয়া তাহার উপর পড়িত—"তুই পোড়ারমুখী যা-তা খাওয়াস কেন ওকে অমন ক'রে ?... তোর রাক্কুসে পেটে হজম হয় বলে সবার পেটেই সইবে ঐ সব !"

শৈলেনকে প্রতিজ্ঞা করানো হইত—না, সে আর কখনও খাইবে না—কখনও নয়—এ জন্মে নয়।....সেদিনটা আর হয় না ; বোধ হয় তাহার পরদিনও নয়, তেমন সুযোগ না পাইলে বোধ হয় আরও এক-আধটা দিন যায়। তাহার পর আবার সেই গোপন পরামর্শ, গোপন অভিযান, ধরা পড়া, আবার সেই সব ব্যাপারের পুনরাবর্তন।

স্মৃতির আলোড়নে কথাগুলা সব এলোমেলো হইয়া আসিতেছে। মায়ের কথা মনে পড়ে বেশি করিয়া। বাহিরে একটু দূরে গিয়া পড়িলেই মা'র জন্য মনটা কেমন করিতে থাকিত। খজনী সঙ্গে আছে, এদিকে মেড়ুয়ার রুটির মতো অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ চলিতেছে—এমন দুর্লভ যোগাযোগে বোধ হয় থাকিত খানিকটা অন্যমনস্ক, তবুও একটু ফাঁক পাইলেই মনটা মায়ের কাছে গিয়া পড়িত। তাহার কারণ ছিল,—ছেলের ধাতটা একটু ঘড়ছাড়া গোছের দেখিয়া গিরিবালা প্রায়ই শাসাইতেন—"তুই বটতলা কি অশথ-তলার ওদিকে গেলেই আমি মরে যাব, এসে আর দেখতে পাবিনি।"...সে এক অসহ্য রকম দোটানা অবস্থা—বাহিরে না গিয়াও উপায় ছিল না, অথচ সর্বদাই মাকে হারাইবার একটা ভয়। শুধু দূরে গেলেই নয়, বাড়ির কাছে থাকিলেও এ-ভয়টা মনের কোথায় যেন জড়াইয়া থাকিত। মোট কথা, বাড়ির বাহিরে পা দিলেই মনটা বাড়িতে ফিরিয়া যেন মায়ের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিত—একটা অবুঝ আশঙ্কায় আগলাইয়া আগলাইয়া।.... ঐ একজন যাহাকে কতভাবে যে পাওয়া গেল জীবনে ! কেহ তো বলিয়া দেয়, নাই যে সব চেয়ে নিকটতম, তাহা ভিন্ন একে একে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া অল্প অল্প করিয়া কাছে থেকে দূরে—আরও দূরে করিয়া দিয়াছে, আর ওদিকেও জ্ঞানতঃ খজনীর চেয়ে কেহই আপনার ছিল না, কেহই প্রতি-পদে অত অপরিহার্য ছিল না, তবু সদা হারাইবার ভয়ের মধ্যে, শুধু মাত্র আছেন এই ভরসার মধ্যে, কি অপূর্ব যে ছিলেন ছেলেবেলার মা !....মায়ের মুখে, ঠাকুরমার মুখে যত সব দুঃখিনী মায়ের গল্প শুনিত, সবার সঙ্গে মাকে মিলাইয়া ফেলিত শৈলেন। মাকে যেন ঐতেই মানায় বেশি ; হাসি আছে, সবই আছে, তবু বেদনাই যেন মায়ের প্রাণ। তাই

সেদিনকার সন্ধ্যার ছবিটি মনে পড়িয়া পড়িয়া মনের সঙ্গে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছিল শৈলেনের,—রুগ্ন, ক্ষীণজীবী অহিকে লইয়া মা তুলসীমঞ্চের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—মুখে সূর্যের শেষ অস্তরাগ আসিয়া পড়িল।....কৈ, কারুণ্যে-মাধুর্যে অমন একটা ছবি তো আর চোখে পড়িল না জীবনে!

একটা বেশ কৌতুকের কথা মনে পড়ে শৈলেনের,—ভালবাসার চুল-চেরা বিচার করিতে করিতে খজনী একবার নিজের একটা চোখের নিচেটা টানিয়া ধরিয়া বলিল—"তুই জানিস্ না, দেখ খোঁখা, তুই আমির আঁখের ভিতরে রয়েছিস্।"...সত্যই খজনীর চোখের মধ্যে একটি ছোট্ট মানুষের প্রতিচ্ছবি, শৈলেন একটু ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে সেও দুলিল। একটা কৌতুকময় আনন্দের সঙ্গে শৈলেনের মনটা বেশ খানিকটা চিন্তাকুল হইয়া রহিল। বাড়ি আসিল। গিরিবালা অহিকে কোলে শোওয়াইয়া কাজল পরাইতেছিলেন, শৈলেন আসিয়া মায়ের মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া বলিল—"তোমার চোখ দেখি তো মা।" নিজেই চোখের নিচেটা টানিয়া ধরিল।....আছে, মায়ের চোখের মধ্যেও সে আছে।....গিরিবালা ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই সে নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেল। এর বেশি কৌতূহল কখনও হয় নাই—তাহার প্রশ্নের ঐখানেই ছিল অবধি, তাই রহস্যটা কখনও ভাঙে নাই,—সমস্ত ছেলেবেলা জুড়িয়া একটা বিস্ময় আর আনন্দ ছিল,—যে ভাবেই হোক, শুধু খজনীই নয়, মাও তাহাকে যত্ন করিয়া চোখের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন!

ঠাকুরদাদাকে মনে পড়ে না, পড়িবার কথাও নয়। ঠাকুরদাদাকে লইয়া এ-পরিবারে যে জীবনাংশ সেটা তখন ইতিহাসের সামিল হইয়া গেছে। শুইবার সময়, কিম্বা শীতকালে আগুনের কাছে বসিয়া, কিম্বা কোন বর্ষার দিনে, খেলার পাট যখন বন্ধ থাকিত শৈলেনরা ঠাকুরমার, কিম্বা মা'র, হয়তো বা কোন পিসিমার কাছে গল্প শুনিত। ঠাকুরদাদা খুব সুপুরুষ ছিলেন, পায়ের চেটো, হাতের চেটোর রং ছিল যেন দুধে-আলতা—খুব নাকি বড় হওয়ার লক্ষণ; অশেষ প্রভাব ছিল এই পাণ্ডুলে তাঁহার—তাঁহার পুণ্যময় জীবনের কাহিনী সব, যখন যেটা মনে পড়িত বক্তৗর। এ-বাড়ির অবস্থা খুব ভাল ছিল, অনেক দাসদাসী-অতিথি-অভ্যাগত। সেই সঙ্গে আসিয়া পড়িত বাবা, কাকা, পিসিমাদের বাল্য-কথা ও মা কি করিয়া আসিলেন এ-সংসারে। তন্দ্রার অস্পষ্টতা, কি বাহিরের শীত, ঘরের মধ্যে মিঠা উত্তাপ, কি অঝোর-ঝরা বাদল—এই সবের মধ্যে নিজেদের অতীত জীবনের

রোমান্স মূর্তি ধরিয়া উঠিত ...এই সেজ পিসিমা কি এই রকম ছিলেন ?—সমস্ত উঠানে চক্র দিয়া বলিতেন—"লোটন ঝা খেতে বসেছে—এ—এ—এ... লোটন ঝার পঞ্চাশটা বম্বাই আম হয়ে গেলো—ও—ও—ও...."

শশাঙ্ক, শৈলেন, হরেন হাসিভরা কৌতূহলের দৃষ্টিতে চায় পিসিমার দিকে ; ত্রিনয়নী কপট রাগের সঙ্গে বলেন—"আচ্ছা, হয়েছে ; এত মিছে কথাও আসে তোমাদের ! আমি না কি ঐ রকম ছিলুম !"

কথা-কাটাকাটির মধ্যে কতকটা অযথাই সবার মুখে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।

এখন অবস্থাটা যে আগের চেয়ে খারাপ, ঠাকুরদাদার গল্প না শুনিলে সে জ্ঞান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমতঃ তখন সে বয়স নয়, দ্বিতীয়তঃ তখনও এমন একটা কিছু ছিল যাহার জন্য আশে-পাশের সবাইয়ের চেয়ে নিজেদের একটু বিশিষ্ট বোধ হইত।...বাবা কুঠীতে চাকরি করতেন, কুঠীতে যাওয়া বারণ ছিল বলিয়া কুঠীটা ছিল একটা অভেদ্য রহস্য। বৈকালে পিতা ফিরিবার সময় হইলেই তিন ভাইয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে গুলমোহর গাছের নিচে শাদা ফটকটার দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি বাহির হইলেই হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইত। সমস্ত দিনের পর বাবাকে পাওয়ার একটা আনন্দ তো ছিলই, তাহার উপর ছিল ফুলের লোভ। বাবার খুব ফুলের সখ, সাহেবের বাগান থেকে অনেক রকম ফুল লইয়া আসিতেন—শীতকালে কত রকম বিচিত্রবর্ণ মৌসুমী ফুল, অন্য সময়ে গোলাপ আরও নানা রকম ফুল। সেইগুলা ভাগাভাগি করিয়া তিন ভাইয়ে লইয়া আসিত বাড়িতে ; আত্মসাৎ করিবার উপায় ছিল না, তবে বাড়ি পর্যন্ত এ-যে লইয়া আসা, তাহার মধ্যেই কী যে একটা উন্মাদনা ছিল ! আর, প্রতিদিনের একটা রুটিন ;—পড়া বা জোর করিয়া দুপুরবেলা ঘুমানোর মতো অপ্রীতিকর রুটিন নয়,—বাবাকে পাওয়া, বাড়ির ভালো-মন্দ খবর আগে-ভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া, ফুলের সমারোহ—সব মিলিয়া এ রুটিনে একটা অভিনব মাদকতা ছিল, সময় যত অগ্রসর হইতে থাকিত, খেলার মধ্যে তিন ভাইয়ে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত।

ওদিককার বিবাহের পাট শেষ হইয়া গিয়াছিল—দুই পিসিমার, কাকার, সকলেরই। শৈলেনের স্মৃতির শেষ রেখায় তাহাদের সংসারের যে চিত্রটি ছলিতেছে তাহাতে রহিয়াছেন ঠাকুরমা, বাবা, মা ; এদিকে তাহারা চারভাই, ছোট পিসিমা।

ছোট পিসিমার বিবাহ হইয়া গেছে, কিন্তু তিনি তখনও পাণ্ডুলেই, হয়তো

যে-সময়ের স্মৃতিটা উজ্জ্বল হইয়া আছে সেই সময়টায় তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু দিন যাবৎ এখানে আসিয়া আছেন,—মোটের উপর তাঁহাকে সে-সময়ের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে পড়ে।....কাকা চণ্ডীচরণ কাছেই রৈয়ামে কুঠীতে কাজ করিতেছেন। কাকিমা বেশি দিন পাণ্ডুলেই থাকেন, কখনও যখন রৈয়ামে যান, কেহ সঙ্গে যায়। শৈলেনরাও কখনও কখনও যায়, পাণ্ডুলের বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে একটা উৎসব-গোছের। কাকিমার আসাটাও একটা উৎসবের অঙ্গ,—টুকিটাকি কি সব কিনিয়া আনেন, আসিলেই ইহারা সবাই ঘিরিয়া দাঁড়ায়, যাহা পায় তাহারও অতিরিক্ত লোভ থাকে। কাকিমার সেটা জানা বলিয়া থাকেন সতর্ক বিশেষ করিয়া হরেনের কাছে। সে-সময়ের কাকিমার মধ্যে একটা ছেলেমানুষিও মনে পড়ে শৈলেনের।—সতর্কতার মধ্যে থেকেও হরেন বোধ হয় চিলের মতো ছোঁ মারিয়া একটা জিনিষ লইয়া গেল—একটা হাড়ের বলই সবচেয়ে লোভনীয় ছিল—কাকিমা টপ করিয়া বাক্সর ডালাটা ফেলিয়া চাবিটা ঘুরাইয়া দিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিলেন। বাড়ির বৌ, দৌড়াইয়া ধরিবার তো উপায় নাই-ই, চেঁচামেচি করিবারও পথ বন্ধ, নিরুপায় ভাবে শশাঙ্ক আর শৈলেনের সাহায্য চান—কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলেন—"যা বাবা, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আয়, আমি ওটা দিতে পারব না—তোদের জন্যে তো এনেছি কিনে কত কি....যা বাবা, লক্ষ্মীটি; শৈলেন, তুই-ই যা বাবা, শশাঙ্ক পারবে না আঁটতে ও ডাকাতের সঙ্গে...."

কখনও বোধ হয় গিরিবালা আসিয়া পড়েন, বকেন—"কেন ও হতভাগাকে ডাকিস? তোরও যেমন বাই!....দাঁড়া, দেখি।"

কাকিমা জাকে ধরিয়া ফেলেন, ভীত ভাবে বলেন—"না দিদি, তুমি থামো, এক্ষুনি মা, বড়ঠাকুর টের পাবেন। শৈলেন যাচ্ছে। এলেই জানি কাকিমা বলে ঘিরে দাঁড়াবে—মন কেমন করে না?—ফিরিও না এলেই একটা একটা করে কিনে রাখি...না, আমি বলটা দিতে পারব না কিন্তু..."

শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলেন—"তুই যা বাবা, বলবি হরেন বড় হোলে ওকেই দিয়ে দোব—সত্যি ওর জন্যেই তো রেখেছি...তদ্দিন আমার কাছে থাক্ ওটা..."

শৈলেনের মনে পড়ে, এক এক সময় চক্ষু পর্যন্ত ছল ছল করিয়া উঠিতেছে যেন কাকিমার। গিরিবালা রাগিয়া বলেন—"খুড়িমা,—কোথায়

বেশ রাশভারী হয়ে থাকবি তা না—ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষ সেজে… জানি না বাপু!…”

শৈলেন বরাবরই পাণ্ডুলে দুইটি বাঙালী-পরিবার দেখিয়া আসিয়াছে, এক তাহাদের নিজের আর এক জ্যেঠামশাইদের। কৈলাসচন্দ্রের পরিবারেও মনে পড়ে জ্যেঠাইমা, বড়দাদা, ছোটদিদি, মেজদাদা,—এঁরা তিন জনেই শশাঙ্কদের চেয়ে বড়; তাহার পর শৈলেনের সঙ্গী তারাপদ, তাহার পর বিজয়। দুইটি পরিপূর্ণ জ্ঞাতি পরিবার, একেবারেই গায়ে গায়ে বাড়ি। বিদেশের কঠিন পর্দা বাঁচাইয়া যাহাতে সর্বদাই মেয়েছেলেদের যাওয়া-আসা চলে তাহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বছরের মধ্যে দৈবাৎ কবে অন্য কুঠীর এলাকা থেকে কোন বাঙালী পরিবার দেখা করিতে আসিলে বাঙালীর মুখ দেখিবেন—সে আতুর ভাবটা আর নাই গিরিবালার জীবনে।…সে তো হইয়াও গেল বহু দিন, গিরিবালা এ বাড়িতে পা দিয়াছিলেন বয়স যখন তেরো, বারো-তেরোটা বৎসর অতীতও হইয়া গেল—একটা যুগ। হাজার মন্থর হইলেও পাণ্ডুলের জীবনের একটা গতি তো আছেই, খানিকটা পরিবর্তন তো হইবেই।

গিরিবালার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়,—সংসারে তাঁহার গৃহিণীপনার যুগ যে পরিবর্তিত সমাবেশের মধ্যে আরম্ভ হইল, তাহার মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া রহিল।

২

মধুসূদনের মৃত্যুর পর নিস্তারিণী দেবী সংসারটা পুত্রবধূর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডুল তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, তবু যে কোন রকমে চোখ-কান বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন, তাহার কারণ, গোড়াতেই একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল যাহাতে নিস্তারিণী দেবী দোটানার মধ্যে পড়িয়া যান। সাঁতরার ঘটনা,—মধুসূদনের শ্রাদ্ধাদির পর বিপিনবিহারী যখন মায়ের কাছে সকলের পাণ্ডুলে প্রত্যাগমনের কথা বলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বেশ খানিকটা বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—“সকলের গিয়ে কি হবে? শুধু শুধু এক কাঁড়ি টাকা খরচ তো বাবা।”

বিপিনবিহারী মায়ের চেয়ে কিছু কম বিস্মিত হইলেন না; খানিকক্ষণ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বুঝলাম না মা কথাটা।"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"আর পাণ্ডুলে কি রইল যে সেখানে ফিরে যাব বাবা? তুই একলা যা, যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনবার আছে নিয়ে আয়, তার পর এখানে একটা কিছু যোগাড়-যন্ত্র করে বোস; আর পাণ্ডুল কেন?"

সময়টা এমন যে সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। পিতার মৃত্যুর পরও যে সংসারের দাবিগুলি যথাপদ্ধতি মিটাইতে হইবে, বেটাছেলে হইয়া বিপিনবিহারী সেটা বুঝিলেও বেশ সবিস্তারে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারিলেন না। কিছু কিছু করিলেন, কিন্তু যে-শোকটা দু'জনের পক্ষেই জীবনে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম, তাহার মধ্যে কথা বাধিয়া যাইতে লাগিল। ফল হইল, এক দিকে পাণ্ডুলে ফিরিবার জিদে আর এক দিকে না-ফিরিবার জিদের মধ্যে পড়িয়া মাঝখানে খানিকটা ভুল ধারণা রহিয়া গেল। বিপিনবিহারী স্থির করিলেন, একাই পাণ্ডুলে যাইবেন, তাহার পর যে কি করিবেন সেটা আর প্রকাশ করিলেন না।

কথাটা মা-ছেলের মধ্যেই রহিল, তাহার পর জানাজানি হইল যাওয়ার আগের দিন, যখন যাত্রার আয়োজন করিবার সময় হইয়াছে। ভগবতীচরণের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন—"বউ, তুই করছিস কি এ? বিপিন ওর বাপ হারিয়েছে, তাঁর আয়ু ছিল না; কিন্তু তুই জ্যান্ত থাকতেই তোকে হারালে যে আজ। এই যে বাপ-মা হারা হয়ে যাচ্ছে...."

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"ও তেমন কিছু তো বলেনি দিদি, বৌমাকেও তো রেখে যাচ্ছে।"

"কত বড় যে ওর অভিমান সেটা বুঝতে পারিসনি বউ। ওর এখন যে কথায় কথায় অভিমান হবে হাজার শোকেও এটা কি তোর ভোলা চলে? ওর যা বয়েস তাতে শোকটাকেও বাপের ওপর অভিমান করেই দেখবে— বেয়াক্কিলের মতন কচি ছেলের ঘাড়ে এত বড় সংসারটা ফেলে দিয়ে গেল ঠাকুরপো। তুই রইলি বাকি, তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু এদিক-ওদিক্ হলে সেটা যে ও অভিমানের ভাবেই নেবে এটা বুঝতে পারছিস না? তোর মাথার ঠিক নেই বুঝি, তবু ঠাকুরপোর সব জিনিস বজায় রেখে যাবার জন্যে যে জোর করে ঠিক রাখতে হবে মাথা।"

নিস্তারিণী দেবী অশ্রু-দ্রব কণ্ঠে বলিলেন—"অভিমানের আমি তো কিছু বলিনি দিদি, আমার কথাটা বুঝবে না বিপিন? চল্লিশ বছর আগে আমি

পাণ্ডুলে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁধতে ভয় পাইনি ; আজ পাণ্ডুল সহর হয়েও আমার পক্ষে যে জঙ্গলের চেয়েও…”

বড়-জা অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া নিজের অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—“সব ভোল বউ, মেয়েদের অদেষ্ট যে কত বড় কঠিন তা কি বলে দিতে হবে? বুক জ্বলে গেলেও আমাদের হাসি টেনে রাখতে হয় মুখে, নইলে—এ-প্রবঞ্চনাটুকু না করলে সৃষ্টি নষ্ট হয় যে। মনে যাই থাকুক তুই এখন যা! যদি সাঁতরায় চলে আসাই ঠিক মনে হয় তো কাছে থেকে আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে বিপিনকে, ও নিজেও বুঝবে। জবরদস্তি করতে গিয়ে হাতের কাজটুকু খুইয়ে যদি আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে….বরং সেও ভালো! কিন্তু বাপের সঙ্গে মা-ও ঠেললে—এই ভাব যদি বসে যায় ওর মনে তো সর্বনাশের আর ওষুধ খুঁজে পাবিনি বউ এ জন্মে।”

তাহার পর কয়েক বৎসর গড়াইয়া গেছে, কিন্তু যতই দিন গেঃছ নিস্তারিণী দেবী উত্তরোত্তর নিজে আরও ভালো করিয়াই নিজের ভুলটা উপলব্ধি করিয়াছেন। পাণ্ডুলের সে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই নাই, তবু পাণ্ডুল বজায় ছিল বলিয়াই সেই অবস্থা থেকে নিজেকে অল্পে অল্পে টানিয়া তুলিয়া পুত্র দুইটি-ভগিনীর বিবাহ দিল, ছোট ভাইকে এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অল্প করিয়া একটু ভবিষ্যতের পথও করিয়া লইতেছে। বিপিনবিহারী বলেন—“মা, কথাটা তাহলে বলি, জানি না রাগ করবে কি না! সাঁতরায় বাবা ছেলেবেলায় অতি দুঃখে পায়ের ধূলো ঝেড়ে এসেছিলেন, আর পাণ্ডুলে আছে বাবার আশীর্বাদ।….কি জানি, আমি বোধ হয় পাণ্ডুলকে ভালোবাসি বলেই বলছি কথাটা, কিন্তু এখানে আমার মনে হয়, বাবা যেন কুঠি থেকে বাড়ি পর্যন্ত সব জায়গায়, আর উদয়াস্ত প্রত্যেকটি কাজে আমায় ঘিরে রয়েছেন।”

বিপিনবিহারীর ওটা অনুমান, কিন্তু নিস্তারিণী দেবী যেন সেটা প্রত্যক্ষ করেন, প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসটা গিয়া ওঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। তবু হাসিয়া বলেন—“তুই যেখানেই থাকিস, তাঁর আশীর্বাদ সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; তবে হ্যাঁ, নিজের হাতে-গড়া জায়গায় মানুষটারও মাহাত্ম্য জড়িয়ে থাকে বৈকি—একটা সামান্য পুতুল গড়লে তাতে কারিগরের মনের ছাপ লেগে থাকে যখন….”

কিন্তু এগুলা হইল বিচারের কথা। একটা জায়গা থেকে মন উঠিয়া গেলে বিচার আসিয়া সে-মনকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। বিপিনবিহারী সেটা বুঝিতেন। মা পাণ্ডুল ছাড়িতে চাহিলে তিনি সে তর্কের জোরে বা

অভিমানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন না এটা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। নিস্তারিণী দেবী যেমন ওদিকে বুঝিয়াছেন পাণ্ডুলে আসাটা ভালো হইয়াছিল সে-সময়, এদিকে তেমনি বিপিনবিহারীও উপলব্ধি করিবার অবসর পাইয়াছেন যে মায়ের পক্ষে পাণ্ডুলে আসা, পাণ্ডুলে থাকার মধ্যে কী সুগভীর বেদনা,—পুত্রের অভিমান-ভরা মুখ দেখিয়া কী পরিপূর্ণ ভাবেই না নিজেকে ভুলিয়াছিলেন মা।

বিপিনবিহারী যতটা সাধ্য চেষ্টা করেন মায়ের মনটা ভুলাইয়া রাখিতে। সংসারের যে-সমস্যাগুলিতে শুধু নিরুপায় চিন্তাই আছে, যে-গুলা সমাধানের সম্ভাবনা নাই, স্বামী-স্ত্রীর কেহই সেগুলা মায়ের গোচরে আনেন না; যতটা পারেন মা তাঁহার পূজা লইয়া থাকুন। এমন কি যতটা সাধ্য তাহারও অতিরিক্ত করিয়া মাসের মধ্যে এক-আধ বার বাবার সময়ের এক-আধটা দিন ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন: যে-ভোজটা ছিল প্রাত্যহিক, এক একদিন তাহার অনুষ্ঠান হয়; আহ্নিক তাড়াতাড়ি সারিয়া নিস্তারিণী দেবী লুচি ভাজতে বসেন; গিরিবালা, ছোট বৌ প্রভাবতী, কন্যা অভয়া কেহ চাকি-বেলন, কেহ বঁটি লইয়া বসেন, দাওয়ার নিচে কামারটুলি থেকে বোধ হয় পড়াউয়ের বৌ, কি শনিচরার মা আসিয়া বসে, নানা রকমের গল্প হয়।···বিপিনবিহারী আসিয়া অভয়াকে উপলক্ষ করিয়া বলেন—"তোরা মাকে কেন টানতে গেলি?—নিজে সামলাতে পারলি না একটু?"

নিস্তারিণী দেবী বলেন—"তা হোক্, পাঁচটা ব্রাহ্মণের মুখে যাবে, চুপটি করে মালা নিয়ে বসে থাকতে কি লাগে ভালো বাবা?"

"ভালো লাগলেও বসে থাকতে দোব না; কিন্তু আগে আশীর্বাদ করো মা, কাজগুলা যেন তোমার যুগ্যি ক'রে করতে পারি।—বাবার আমলে যেমন হোত।"

স্মৃতির আলোড়নে একটু বেদনার সুর ওঠে বুকে, তবুও কিন্তু বেশ লাগে,— পুরানো একটা দিনের সৌরভ ভাসিয়া আসে। ভাবের পূর্ণতায় যদি মুখ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে না-ও পারেন নিস্তারিণী দেবী তো সে আশীর্বাদ অন্তরে আরও ভাব-ঘন হইয়া ওঠে।

বিপিনবিহারী যতটুকু করেন তাহার উপর সময় খানিকটা জোগান্ দিয়া অনুকূলতা করে। আগেকার সেই প্রয়োজনের বেশি চাকর-দাসী, লোক-লস্করের অভাব পূরণ করিয়া তুলিতেছে আপন জনে। নাতিরা বাড়ি ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হোক ছোট, হোক সংখ্যায় কম, কিন্তু মন থেকে

আরম্ভ করিয়া বাড়ি-ঘর-দুয়ার পূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অশেষ—এক দিক্ দিয়া চারিটিতেই চল্লিশের সমকক্ষ। তাহার পর যখন বড় মেয়েদের কেহ আসে, সব মিলাইয়া ঘর-দুয়ারে আর জায়গা থাকে না ; পূজা হইতেও সময় কাটিয়া সবাইকে বণ্টন করিতে হয়।....নিস্তারিণী দেবী অভাব ভোলেন ; শুধু এইটুকু মনে করিয়া প্রাণটা হয়তো গুমরাইয়া ওঠে যে, আরও এক জন যাহার এই সব, সেই রহিল কোন্ সুদূর অজ্ঞাত পথের শেষে।

সাতটা বৎসর গেল, তাহার পর নিস্তারিণী দেবীর মনে পাণ্ডুলের প্রতি গোড়ার দিকের সেই নিস্পৃহতা হঠাৎ একদিন ভীতির আকারে দেখা দিল।—

মাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য বিপিনবিহারী যে যে পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহার মধ্যে একটা ছিল মাঝে মাঝে তাঁহাকে সাঁতরা ঘুরাইয়া আনা। বছরে প্রায় একবার করিয়া হইতই ; কখনও নিজে গেলেন, কখনও কৈলাসচন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া সঙ্গে করিয়া দিলেন, কখনও বা চণ্ডীচরণ গেলেন। দেখা-শোনা কাছে-পিঠের তীর্থ, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি সারিয়া কিছু দিন কাটাইয়া নিস্তারিণী দেবী ফিরিয়া আসেন। কোন সময় যদি দূর তীর্থের যাত্রী পাওয়া গেল, ফিরিতে বিলম্ব হয়। বেশ খানিকটা বৈরাগ্য ও মুক্তির মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া অনভ্যাসকাতর বিহঙ্গীর মতো শান্ত-মনে নিজের পিঞ্জরে আসিয়া বসেন।

এবার পূজার পর সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরে একটা ব্যাপার ঘটিল। এখানে কার্তিকী পূর্ণিমায় স্নানের খুব একটা ঘটা হয়। বেশির ভাগই কমলা নদীতে যায়, তবে আজ-কাল গাড়ির সুবিধা হওয়ায় গঙ্গাস্নানার্থীর সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গেছে, দিনকতক আগে থেকেই বেশ সাড়া পড়িয়া যায়।

নিস্তারিণী দেবী আসিবার পর বামনপাড়া, ছুতোরপাড়া, কামারপাড়ার বর্ষীয়সীরা দেখা করিতে আসিল। একদিন আসিল দুলারমনের মা, সঙ্গে দুলারমন। এই পরিবারটির সহিত হৃদ্যতা, কিন্তু দুলারমনের দুর্ভাগ্যের পর হইতে সমস্ত পরিবারটি কেমন যেন মনমরা হইয়া গেছে। এই রকম একটা বিশেষ উপলক্ষ না হইলে বাড়ির বাহির হয় না বড় একটা। বউটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হইবে। কন্যা দুলারমনের মতোই স্বভাবটা একটু হাস্যচপল, এখন অবশ্য তাহার উপর একটা বিষাদের আবরণ পড়িয়াছে। আসিল একটু সন্ধ্যা ঘেঁসিয়া ; নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"এসো, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম সবাইকে —দুলারমনের মা এখনও এল না কেন।"

গিরিবালা একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া দুলারমনকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন ; সে আজকাল আরও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

গল্প আরম্ভ হইল ; শাশুড়ি ভালই আছে, আরও খিট্‌খিটে হইয়া পড়িয়াছে। না, জামাইয়ের কোন তল্লাস পাওয়া গেল না এ পর্যন্ত ; মেয়েটার কপাল চিরতরেই পুড়িয়াছে, আর তো চাওয়া যায় না ওটার দিকে। শাস্ত্রের বিধান মতো বারো বৎসর পরে, কপালে ঐ যে সিঁদুরটুকু আছে ওটাও ঘুচিয়া যাইবে। দুলারমনের মা চোখ দুইটি মুছিয়া বলিল—"মা হয়ে কথাটা মুখে আনতে বাধে, দুলহীন, কিন্তু মনে হয় সতীরাণী মা-জানকী যেন তার আগেই ওকে সরিয়ে নেন, দুলারীকে আমার যেন শাদা কাপড়ে না দেখতে হয়।"

খানিকটা অশ্রুমোচন করিয়া বুকটা হালকা হইল। নিস্তারিণী দেবী সান্ত্বনা দিলেন, অমঙ্গলের কথা ভাবিতে বারণ করিলেন, তবে বেশ জোরের সঙ্গে নয়, এমন কি শুষ্ক চোখেও নয়। বুক বেশ খানিকটা হালকা হইলে কথা অন্য দিকে ঘুরিল। দুলারমনের মা একবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"এবার বেশ পূজোর সময়ই দেশে গেলে, আসতেও দেরিও হোল, কার্তিকী পূর্ণিমার গঙ্গাস্নানটা সেরে এলে না কেন দুলহীন ? আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম।"

এবার দল পাইয়া নিস্তারিণী দেবী সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন ; তাহার পর শরীরটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত সাঁতরায় আর থাকিতে ভালো লাগিল না। এ কথাটা বলিলেন না, বলিলেন—'মা-গঙ্গা না মনে করলে হয় না দুলারির মা, পাপের শরীর তো ?"

দুলারমনের মা কৃত্রিম রোষের সহিত বলিল—"অমনি আরম্ভ হোল দুলহীনের পাপের শরীর—পাপের শরীর !...সাধ করে কি আসতে চাই না ?"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল—"আমি জানি গঙ্গা-মাঈ কেন আটকে রাখেননি তোমায় দেশে।"

চটুল দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি এবারে বুড়িকে রাজি করেছি, দুলারির বাপকেও করেছি রাজি দুলহীন, গঙ্গাস্নানে যাব।"

নিস্তারিণী দেবীর উপর সংবাদটার প্রতিক্রিয়ার জন্য সামান্য একটু বিরতি দিয়াই দুলারমনের মা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—"অনেক দিনের সাধ দুলহীন, এবার যাবই আমি। তুমিও চলো....না, ও-রকম ফাঁকির হাসি চলবে না, যেতেই হবে ; ঠিক এই জন্যেই গঙ্গা-মাঈ তোমায় দেশে আটকে রাখেননি, নৈলে পূর্ণিমার স্নান ছেড়ে না কি তুমি চলে আসবার মেয়ে ? চণ্ডীকে ছুটি নেওয়াও ; চলো দুলহীন, আমার মাথার কিরা—চমৎকার হবে। তুমি যাবেই ;

এত দিন পরে গঙ্গা-মাঈ আমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন যখন; ভালো করেই চেয়েছেন; তোমায় সঙ্গী করে দেবেনই....”

হঠাৎ স্বরটা নামাইয়া দিয়া, দৃষ্টি আরও চটুল করিয়া বলিল—“আমি গঙ্গা পর্যন্ত গিয়েই ছেড়ে দোব ভেবেছ নাকি? গঙ্গাজির নাম করে বেরুচ্ছি শুধু...”

নিস্তারিণী দেবীর বড় কৌতূহল হইল, প্রশ্ন করিলেন—“তবে?—জামাইয়ের মতন পালাবে না কি?”

দুলারমনের মা হাত নাড়িয়া বলিল—“আরে দুৎ, দুলহীন কিছু বোঝেন না।”

আরও গলা নামাইয়া বলিল—“আমি যাব গঙ্গা-সাগর, মনে মনে এঁচে বসে আছি। একবার তো গঙ্গাজির নাম করে বেরুই....তাই তো না আট দশ দিন আগে বেরুব।”

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—“তোমার পেটে পেটে কম মতলব নয় তো দুলারির মা! কিন্তু দুলারির বাপ তো সঙ্গে যাবে, রাজি হবে কেন?”

দুলারমনের মা ঠোঁট চাপিয়া নিস্তারিণী দেবীর পানে আড়চোখে চাহিয়া এমন একটা হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরাইয়া লইল যে-হাসি শুধু মেয়েছেলেতেই বোঝে; একটু ব্যঙ্গের টানে বলিল—“ঈস্ হবে না রাজি! চিরজন্মটা....”

আর বলিবার দরকার হয় না; হাসিটাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া শেষ করিয়া ফেলিল, তাহার পর আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সাগর-সঙ্গমে সে যাবেই; সে না কি বড় অপরূপ স্থান—মা-গঙ্গার কূল-কিনারা নাই একেবারে, আর সামনে সমুদ্র—যত দূর দৃষ্টি যায় খালি নীল জলের বড় বড় ঢেউ—হাজার হাজার যাত্রীরা স্নান করিতেছে, বড় অপূর্ব জায়গা না কি—দুলারমনের মা যে যাইবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই, রাত্রে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিয়াছে কতবার, মা'র দয়া হইবে বলিয়াই তো, নৈলে মিছে লোভ দেখাইবার দরকার কি মায়ের?.... নিস্তারিণী দেবীকেও যাইতে হইবে। বিপিনবাবুকে বলা নয়, তাহার পর বাহিরে গিয়া চণ্ডীচরণকে মানাইয়া লইলেই হইবে....

নিস্তারিণী দেবীর কৌতুকের অবধি থাকে না, প্রশ্ন করেন—“কিন্তু তোমায় এ-সব মতলব দিলে কে দুলারমনের মা? গঙ্গাসাগরের ও রকম বর্ণনাই বা পেলে তুমি কোথা থেকে?”

দুলারমনের মা'র মুখটা হাসির আভাসে আবার উজ্জ্বল হইয়া ওঠে; এবার

গলাটা আরও খাটো করিয়া বলে—"তবে বলব সব কথা? কিন্তু কাউকে বলো না তুলহীন, মাথার কিরা।....ওই শাশুড়ি বুড়ি,—এত দিন চেপে রেখে সেদিন আপিনের ঝোঁকে সব বড়্-বড়্ করে বলে ফেললে—আজকাল শরীরটা একটু বেশি খারাপ, আপিনের মাত্রাটা বাড়িয়েছে কি না।....তখন বয়স অনেক কম, বুড়ো-বুড়িতে যুক্তি করে এই রকম গঙ্গাস্নানের আর বৈদ্যনাথ দর্শনের নাম করে একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত....

আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তাহারই মধ্যে দুলিয়া-দুলিয়া বলিতে লাগিল—"দুলহীন মনে করছেন দুলারির মার এটা নূতন মতলব....এ বংশের যে ধারাই এই তা...."

তিন দিন পরে বামনপাড়ায় হঠাৎ কান্নার রোল উঠিল। হাতের কাজ ফেলিয়া নিস্তারিণী দেবী আর গিরিবালা উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কাহাদের বাড়ি কি হইল? এখানে রোগ-লুকানো আবার মস্তবড় একটা ব্যায়রাম সকলের। খজনীর মাকে পাঠাইতেছিলেন, এমন সময় খজনী আসিয়া খবর দিল—দুলারমনের মা মারা গিয়াছে। ডাইনে পাইয়াছিল, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে, কাল সমস্ত দিন ভুল বকে, আজ সমস্তক্ষণ অজ্ঞান ছিল; ঝাঁড়-ফুঁকে কিছুই ফল হইল না।

সকাল দশটা-এগারটার সময় মারা গেল দুলারমনের মা। নিস্তারিণী দেবী সমস্ত দিন গুম হইয়া রহিলেন। আহারে বসিলেন মাত্র। এত বড় দুর্ঘটনাটা লইয়া সবাই আলোচনা করিল, উনি অন্যমনস্ক হইয়া শুধু—'হুঁ—না' বলিয়া দু'-এক বার সায় দিলেন।

পরদিন বিপিনবিহারী সকালে আফিস যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, নিস্তারিণী দেবী আসিয়া দুয়ারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিনবিহারী বলিলেন—"মা তুমি কাল রাত্তিরেও খাওনি শুনলাম; শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"না, শরীর ঠিকই আছে। বলছিলাম—আমায় সাঁতরায় পাঠিয়ে দে বিপিন, আর মোটেই দেরি করিসনি; আজ ছুটি নিয়ে আসিস আফিস থেকে।"

বিপিনবিহারী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাকাইলেন।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"না বাবা, আর একটুও অমত করিস নি। তা যদি বললি—জীবনে আমি কখনও ছেলেমেয়েদের—যাকে হুকুম বলে তা করিনি, আজ তোকে এই প্রথম করছি। তুই বড়-ছেলে, কথাটা কাটিসনি। আটটা বছর কাটাতে আমার তেমন কষ্ট হয়নি, আর কিন্তু একটা দিনও আমার অসহ্যি হয়ে উঠেছে এখানে।...আমি ভিটে আর গঙ্গা ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারছি না বিপিন।"

বুঝিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কিছুই আশ্চর্য নয়। জীবনে যে সব চেয়ে প্রিয় সে যখন ছাড়িয়া যায় তখন মানুষ আর সবই ভাবিতে পারে, শুধু নিজের মৃত্যুর কথাটুকুই ভাবিতে পারে না। নিরুপায় ক্ষোভে, অভিমানে শুধু এইটুকুই মনে হয়—ও বেশ গেল, অন্যায় করিয়া, ফাঁকি দিয়া; আমাকেই দীর্ঘ জীবনের পূর্ণ মেয়াদটা খাটিয়া শেষ করিতে হইবে, একা অসহায় ভাবেই; ওর ছাড়িয়া-যাওয়া বোঝা পর্যন্ত মাথায় বহিয়া। অবশ্য বোঝা বওয়ার আর গা থাকে না, মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই সে জীবনের গুণ টানিয়া চলে; কিন্তু মৃত্যুর আকস্মিকতার কথাটা ভাবিতে পারে না। অন্তর্নিরুদ্ধ অভিমানে আর এই নিরানন্দ আশায় মনে হয় এই ভাবেই চলিতে হইবে—দূর—দূর—বহু দূর, অভিশপ্ত এই দীর্ঘায়ুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মৃত্যু যাহার আশীর্বাদ সে কি মাঝপথে হঠাৎ সাক্ষাৎ পায় তাহার কখনও?

সাত বৎসর পরে দুলারমনের মার জীবনে মৃত্যুর আকস্মিকতা দেখিয়া নিস্তারিণী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন। মৃত্যু যদি যে-কোন মুহূর্তেই এমনি করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে তো তাঁহাকেও যে দুলারমনের মায়ের মতোই হা-গঙ্গা হা-গঙ্গা করিয়াই মরিতে হইবে। গঙ্গার তীরের মেয়ে তিনি, গঙ্গার তীরের বধূ—মায়ের উপর কন্যার অধিকারের মতোই তাঁহার একটা সাহস ছিল; একটা সহজ বিশ্বাস ছিল—মধুসূদনকে তিনি ডাকিয়া লইয়াছেন, নিস্তারিণী দেবীকেও ভুলিবেন না। দীর্ঘ অবসাদের পর সময় আসিবে, মধুসূদনের দায় কাঁধ থেকে নামাইয়া নিস্তারিণী দেবী শেষ শান্তির জন্য মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইবেন। শত দুঃখের মধ্যেও নিশ্চিন্ততাটুকু ছিলই।

দুলারমুনের মায়ের মৃত্যু সব ধারণা দিল উল্টাইয়া।

দেখিলেন যে-মৃত্যু তাঁহার আশীর্বাদ, সে হঠাৎ যে-কোন মুহূর্তেই অভিশাপ হইয়া দেখা দিতে পারে—তাঁহার এত বড় অধিকার থেকে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া!

৩

ছুটি লইতে, আয়োজন করিতে সপ্তাহ খানেকের আগে হইয়া উঠিল না, একটা ভালো দিনও দেখিতে হয়। একটা প্রতিক্রিয়াও ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। পাণ্ডুলেরও তো একটা মায়া আছে?—এত দিনের দীর্ঘ-প্রবাস। শুধু প্রবাসই নয়,—জীবনের সব চেয়ে সুখের দিনগুলা কাটিল এখানে, হৃদয়ের তন্তুগুলা যেখানে যেখানে গিয়া জড়াইয়াছিল টানা পড়ার ব্যথায় জাগিয়া উঠিল, এবং সেই তন্তুদল যে ছিঁড়িয়া যাইতে হইবে এই চিন্তায় মনটা ক্রমেই বিষণ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সাঁতরা নিস্তারিণী দেবীর পরকাল,—গঙ্গা আছেন, তীর্থের সুযোগ, স্বামীর চিতাভস্মও এইখানেই—এদিক্ দিয়া পরকালের সঙ্গে যোগটা আরও যেন নিগূঢ়; কিন্তু ইহকাল বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই তো পাণ্ডুল; এত সহজে কি তাহাকে জীবন থেকে ঝাড়িয়া ফেলা যায়?

টান পড়িতে বেদনার মধ্যে দিয়া আরও একটা জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিল,—ভাঁড়ার ছাড়িয়া, দিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে মুক্ত হইয়া গেলেই সংসার থেকে মুক্ত হওয়া চলে না। ইচ্ছা ছিল ও-সময়টা ভগবানের চরণে অর্পণ করা। তাহার আড়ম্বর ছিলই; কিন্তু এখন দেখা গেল চারিটি নাতিতে একে একে আসিয়া কখন নিঃসাড়ে সেই উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। থাকার কালে যে-চুরিটা ধরা পড়ে নাই, যাওয়ায় সময় সেটা আত্মপ্রকাশ করিল। বরং আরও শঙ্কার কথা—পূজায় বসিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন নিস্তারিণী দেবী, তাহাতে বেশ টের পাইলেন ওরা চার জন ভগবানের প্রাপ্য নিয়মিত সময়টুকুতেও অধিকার জমাইয়াছে।

রাত্রে গল্প শুনিবার জন্য জুটিয়াছে সবাই। জায়গা লইয়া কাড়া-কাড়ি হইতেছে, গিরিবালা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ধমক দিয়া বলিলেন—

"হ্যাঁ, যা দুটো দিন আছেন, তোরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খা। আরও তাড়াতাড়ি পালান মা।"

নিস্তারিণী দেবী সবচেয়ে দুষ্টুটির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তুমি ওই বলছ বৌমা, আর আমি কি ভাবছি জানো? ভাবছি থাকব কি করে সাঁতরায় গিয়ে। মুখে আনতে বাধে বটে, কিন্তু সত্যিই এক একবার মনে হচ্ছে, যাচ্ছি বটে মা-গঙ্গার লোভে, কিন্তু এদের এই উপদ্রবের লোভটাই বড় হয়ে উঠে আমায় না আবার টেনে আনে।"

গিরিবালার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন—"ওমা, ওই ভুতেদের দিয়ে যদি অন্তত সে-উপকারটুকুও হয় তাহ'লে যে আমি বাঁচি; বল না মা, ওদের আমি আরও লেলিয়ে দিচ্ছি।"

নিস্তারিণী দেবীও হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"অমনিতেই যা অবস্থা করেছে তার ওপর আবার...."

একটু চুপ করিয়া গেলেন; সামনে একটু চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। গিরিবালা ঘরের কাজটুকু সারিয়া ফিরিতেছিলেন, নিস্তারিণী দেবী একটু ধরা-গলায় বলিলেন—"মনের কথা লুকিয়ে রাখা পাপ, বলে এক জনকেও অন্তত শুনিয়ে রাখা ভালো: আমি বড্ড দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি বৌমা, কি করে থাকব এই সব ছেড়ে? আমার কি মনে হয় জান বৌমা?—আমার সংসারের সাধ মেটাবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। মেটেনি, আমার সাধ মেটেনি বৌমা, আমি এ-মন কি ক'রে মা-গঙ্গার পায়ে দোব? উনি আমায় নানা দিক্ দিয়ে বঞ্চিত করে গেলেন বৌমা।"

নূতন বিচ্ছেদের মুখে স্বামীর শোক নূতন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গিরিবালাও সারা দিন চোখ মুছিয়া মুছিয়া বেড়াইতেছিলেনই, শশাঙ্কদের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে শাশুড়ি-বৌ উভয়েই চোখে অঞ্চল চাপিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ব্যবস্থাটা কি মধুসূদনই করিলেন? যেমন ভাবে যোগাযোগটা ঘটিল তাহাতে সেই-রকমই একটা সন্দেহ হয় বটে। নাতিরা বড় হইলে নিস্তারিণী দেবী গল্প প্রসঙ্গে বলিতেন—"যেমন করে দিলাম খোঁটা তোদের ঠাকুর-দাদাকে, ব্যবস্থা করতে পথ পেলেন না তিনি। একেবারে পাত্তুল ছেড়ে

যাওয়া সেই প্রথম, তোরা দুটো না থাকলে, গঙ্গা ছেড়ে পালাবার লজ্জা ঢাকতে বোধ হয় আমায় গঙ্গায় ডুবে মরতে হোত।"

ব্যাপারটা এইরূপ—

যাইবার দুই দিন আগে বিপিনবিহারী বেশ একটু সকাল সকাল আফিস থেকে বাহির হইলেন। মা যাইতেছেন বলিয়া দুপুরবেলা বিরাজমোহিনী আসিয়াছেন। বৈকালে রৈয়াম হইতে চণ্ডীচরণ আসিবেন; এর মধ্যে অনেকগুলা গোছগাছও করিবার আছে।....ছুতারটুলির সামনে আসিয়া একটা দৃশ্য দেখিয়া রাগে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে বিপিনবিহারীর সমস্ত শরীরটা যেন জর্জরিত হইয়া উঠিল। বড় রাস্তা থেকে বাহির হইয়া একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুইদিকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে ছুতার-কামারদের বাড়ি। খানিকটা দূরে—রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি দশ-বারো জন অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার নিজের তিনটি পুত্র! একটা মস্ত বড় হুল্লোর চলিয়াছে, মিশ্র কলরবের সঙ্গে একটা ছড়ার অংশ উদ্ধার করা যায়—"পড়াউ লড়াউ বকড়ি চড়াউ, ধিয়াপুতাকে বেচ্ বেচ্ খাউ।"....পড়াউ নামে একটা বৃদ্ধ কালা ছুতারমিস্ত্রি আছে, তাহারই খ্যাপান; অর্থটা হইতেছে পড়াউ ছাগল চড়ায় এবং ছেলেপুলেদের বেচিয়া বেচিয়া প্রাণধারণ করে। মাতনটাকে যথেষ্ট উগ্র করিয়া তুলিবার জন্য ধূলা ছোঁড়াছুঁড়ি চলিতেছে, তাহাতে সবার চেহারার এমন অবস্থা হইয়াছে যে চিনিয়া ওঠা দায়। শশাঙ্ক একটু দূরে 'বড় মতরা' (ব্রহ্মোত্তর) নামক জায়গায় গুরুজির পাঠশালায় যায়, পলাইয়া আসিয়া এই কাণ্ড করিতেছে। ছেলেটাকে শান্ত বলিয়াই জানে সবাই, হয়তো গুরুজি ক্ষেত তদারকে গিয়া থাকিবে, ফাঁকতালে খানিকটা মুক্তির আনন্দ লুঠিয়া লইতে আসিয়াছে ছাত্র!

দুপুরের দৈনন্দিন ইতিহাসটা তাহা হইলে এই? ছোটটা একটু দুরন্ত আর ছোটলোক-ঘেঁসা হইয়াছে, এ সংবাদটা মাঝে-মাঝে আসে বিপিনবিহারীর কাছে। বেত আরম্ভ করিতে হইয়াছে, একটু একটু ফলও পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বড়টা যে ইতিমধ্যে এত-দূর আগাইয়া গেছে, বিপিনবিহারী কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই কখনও। চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া একবার যে চোখ পড়িয়া গেল, সেইটুকুই; তাহার পর লজ্জায় অপমানে বিপিনবিহারী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না সেখানে। ডাকিলেনও না পুত্রদের, চিন্তিতভাবে মাথাটা নিচু করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

মনের যা অবস্থা তাহাতে তিনটাকে ধরিয়া আনাইয়া উত্তম-মধ্যম দেওয়াই হইত স্বাভাবিক, কিন্তু বিপিনবিহারী এবারে সে-ধরণের কিছুই করিলেন না। তাঁহার মনটা ও-রাস্তাই লইল না, পরন্তু এই উপলক্ষ করিয়া মায়ের উপর অভিমানে ভরিয়া উঠিল, যদিও নিস্তারিণী দেবী যাওয়ার কথাটা তোলা পর্যন্ত প্রসন্ন ভাবেই তিনি সব আয়োজন করিয়া যাইতেছিলেন। বাড়ীতে আসিতে, অতিরিক্ত বিষণ্ণতা দেখিয়া মা যখন একটু চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিপিনবিহারী একটু চুপ করিয়া রহিলেন। মনের ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মনের দুঃখ না কি খুবই বেশি, পারিলেন না; একটু হাসিয়া বলিলেন—"মা, বাবা আমার ঘাড়ে দুটো বোন চাপিয়ে বেশ গেলেন চলে; তোমাদের দুজনের আশীর্বাদে বেশ উঠলামও সামলে-সুমলে কোন রকম করে, এখন তুমি কি ঘাড়ে চাপিয়ে সাঁতরায় যাচ্ছ, দেখো।"

অবসন্ন কণ্ঠে চাকরটাকে কামারপাড়া থেকে ছেলে তিনটেকে ধরিয়া আনিতে হুকুম করিলেন, যেমন আছে ঠিক সেই অবস্থাতেই।

চাকরের পিছনে পিছনে তিনটিতে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপিনবিহারী মায়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি এখন পেটের সংস্থান করি কি এদিকে সামলাই বলো?…যাক্, আর ভাবতে পারি না, বাবা ছিলেন পাণ্ডুল-কুঠির সর্বেসর্বা, আমি হয়েছি কেরানি, ওরা কুলিগিরি ভিন্ন আর কি করবে? নিজের নিজের অদৃষ্ট।"

জামা-জুতা ছাড়িবার জন্য ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শৈলেনের বেশ মনে পড়ে দৃশ্যটা: উহারা তিন ভাইয়ে মনরাখ্‌না চাকরের পিছনে পিছনে হেঁটমাথায় প্রবেশ করিয়া একবার চোখ তুলিয়া দেখিল নটুয়ার নাচ দেখার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে লোকে, সেইভাবে সকলে তাহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, অবশ্য ঠাকুরমা, মা, আর বড় পিসিমা ছাড়া। ঠাকুরমার মুখে কি রকম একটা চিন্তান্বিত অপ্রতিভ ভাব, মা আর পিসিমার মুখে ভয়; মা আধা-ঘোমটা টানিয়া দুয়ারের চৌকাঠের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন। বাকি সবাই উৎসুক দর্শনার্থী; কম কয়টি নয়,—পিসিমার মেয়ের দল, ও-বাড়ির বড়দাদা, ছোট দিদি প্রভৃতি অনেকগুলি। বাবার হাতে নাচটা যে সবার কিরূপ উপভোগ্য হইবে, কল্পনা করিতে করিতে তিন জনে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল। পায়ের নখ থেকে মাথার টিকি পর্যন্ত ধূলায় ধূলায় আচ্ছন্ন, হরেন

আবার উৎসাহের মাথায় কামারপাড়ায় খানিকটা কয়লার ছাই হাতের কাছে পাইয়া গিয়াছিল, ঘামে, ধূলায়, ছাইয়ে তাহার রংটা গঙ্গা-যমুনা-গোছের দাঁড়াইয়াছে; তিন জনকে লইয়া চাকরটাও উদ্ব্যস্ত থাকে বলিয়া একটা কণা কাহাকেও দেহ হইতে খসাইতে দেয় নাই। শশাঙ্কর চোখে বালি পড়িয়া জল নামিয়াছিল, মুছিবার অবসর না পাওয়ায় সে-ও একটা অপরূপ জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভিমান ব্যর্থ বুঝিয়া বিপিনবিহারীর রাগটা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, জামাজুতা ছাড়িতে ছাড়িতে ঘর থেকেই হুকুম করিলেন—"মনরাখ্‌না, একঠো ছড়ি লে আও।"

বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন—"এই দেখো মা, তা ভাবনার আমিও কিছু রাখব না, তোমার সামনেই শেষ করে দিচ্ছি তিনটাকে।"

ব্যাপার যে এত গুরুতর ভাবিতে পারে নাই, শৈলেন একবার ঠাকুরমার মুখের পানে চাহিল, কাঠের পুতুলের মধ্যে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে নিশ্চল হইয় দাঁড়াইয়া আছেন. ঠাকুরমার মুখের চেহারা এমন কখনও দেখে নাই শৈলেন।...দর্শকেরা খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে, ভালো জায়গার জন্য একটু-একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেছে।

অবশেষে বিরাজমোহিনী সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"বিরাজ, তুমি সরে যাও, ওদের বাঁচাতে পারবে না!"

বিরাজমোহিনীর কোলে তাঁহার শিশু-কন্যাটি, দাদার বারণ না শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিয়াছেন, মেয়েটি হঠাৎ মুখটা ঘুরাইয়া কাঁধে চাপিয়া ধরিল এবং তিনি অতটা খেয়াল না করিয়া আরও দুই পা অগ্রসর হইতে আর একবার তিন জনের পানে চাহিয়া ভয়ে একবারে আঁৎকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

উৎকট হাসির বেগ চাপিতে সবার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজ-মোহিনীর মেজ মেয়েটি একটু গিন্নিবান্নি গোছের, নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল—"ভয় কি খুকু? আক্কোস নয়, চুড়েল নয়; ওরা দাদা হয়, মামুর ছেলে, কত সন্দেশ দেবে।"

বোধ হয় সত্য সত্যই তিনটাতে আবার সন্দেশ দিতে অগ্রসর হইয়াছে কি না একবার দেখিয়া লইবার জন্য ঘাড়টা ঘুরাইয়াই খুকি আর একটা উৎকটতর চীৎকার করিয়া দিদির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতেই সবার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়াছিল, এবার আর কেহই সেটাকে মুক্তি না দিয়া পারিল না। বধ্যভূমির সমস্ত গাম্ভীর্য এক মুহূর্তে নষ্ট হইয়া গেল,

বিপিনবিহারী হালকা হইবার ভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বিরাজমোহিনী নিজের এবং আর সবাইয়ের আধ-চাপা হাসির মধ্যে ভাইপোদের তাড়াতাড়ি নাহিবার ঘরের দিকে লইয়া গেলেন।

হাসিলেন না শুধু নিস্তারিণী দেবী। ছেলের কথাটা একটু লাগিয়াছে প্রাণে। উহারই মুখ চাহিয়া সাতটা বছর তো কাটাইলেন এখানে, চিরকালটাই কি আগলাইয়া থাকিতে হইবে? তাঁহার পরকাল নাই? আর, ছেলে যদি দুরন্তপনা করে, তিনি স্ত্রীলোক, বাড়ির মধ্যে থাকিয়া করিতেই বা কতটা কি পারেন?···· তা নয়, ছেলে একটা ছুতা, বিপিনবিহারী আসলে চান মা চিরকাল এই সংসারে মুখ গুঁজিয়া থাকুন। প্রসন্ন ভাবে সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে তাঁহার একটা অভিমানের ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সেটা একটু পথ পাইয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ···কথাটা লইয়া যতই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই সেটা শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাদেরই বর্ধমান জটিলতার মধ্যে কোন এক সময় তাঁহার মনেও অভিমান ঘনাইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় যখন চণ্ডীচরণ আসিলেন, মাকে দেখিলেন বড় গম্ভীর। আসন্ন যাত্রার লক্ষণ মনে করিয়া কিছু প্রশ্ন করিলেন না। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন যাওয়ার কথা উঠিল, নিস্তারিণী দেবী মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"যাব বললেই কি যাওয়া হয় বাবা? তোরা মুখভার করলেও যে-দিন থাকার উপায় থাকবে না, সেই দিন যাব একেবারে।"

যতক্ষণ সবাই জাগিয়া রহিলেন, আলোচনা চলিল, ততক্ষণ এই রকম অভিমানের কথাই বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সকলে যখন নিদ্রাগত, রজনী নিস্তব্ধ, বিনিদ্র-শয্যায় শুইয়া শুইয়া সমস্ত ব্যাপারটা শান্ত ভাবে বিচার করিবার সময় পাইলেন নিস্তারিণী দেবী। দুলারমনের মা মরিয়া আ-ঘাটায় মরার যে কী একটা ভয় দেখাইয়া গেল—একটা যেন উভয়-সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে ক্রমে ক্রমে। প্রথম আয়োজনের ঝোঁকে যাওয়াটা তিনি যতটা সহজ ভাবিয়াছিলেন আসলে নয় ততটা। শুধু আজ হঠাৎ-প্রকাশ হইয়া-পড়া ছেলের অভিমান নয়, তিনি কি এ সব ছাড়িয়া সেখানে শুধু গঙ্গা আর তীর্থ লইয়া থাকিতে পারিবেন? সেদিন পুত্রবধূর কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"আমার কি মনে হয় জান বৌমা?—আমার সংসারের সাধ মিটবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।" কথাটা যে কী একান্ত ভাবেই মনের কথা ওঁর সেটা যেন অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিলেন। এর উপর বিপিনের অভিমান,—অভিমান-ভরা মুখে তাকে যেন শিশুর মতোই অসহায়, প্রতিপাল্য বলিয়া মনে হইতে

লাগিল, যাহাকে বুকের উত্তাপ দিয়াই বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। মনে পড়িল বড় জায়ের কথা—"তুই রইলি বাকি; তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু এদিক্ ওদিক্ হলে ও যে সেটা অভিমান ভরেই নেবে।"....তাই যে লইতেছে বিপিন, শিশুর মতোই অবুঝ আর প্রতিপাল্য বলিয়াই তো?

কিন্তু থাকাই কি সহজ? আজ চণ্ডীচরণকে কথাটা বলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখখানা শুকাইয়া গেল বেচারির। বিপিনও শুনিয়াছে নিশ্চয়; আহারের সময় ও-প্রসঙ্গটাই তুলিল না; অথচ ওর তো উৎফুল্ল হইয়া উঠিবারই কথা। এই অভিমানে—হয়তো রাগেরই থাকিয়া-যাওয়ায় ছেলের মনে কিসের অন্তঃশীলা শুরু হইয়াছে কে জানে?....এ কি অসহ্য রকম ভুল বোঝা-বুঝির পালা চলিয়াছে!

আরও একটা কথা;—সত্যই এখানেই বাঁধা পড়িয়া থাকিতে হইবে তাঁহাকে? এখানেই মরিতে হইবে? স্বামী যেখানে গেছেন সেখানকার একটু মাটির জন্য মনটা যে অবাধ্য ভাবেই কাতর হইয়া ওঠে।

নিস্তারিণী দেবী সমস্ত রাত আর চক্ষু বুজিতে পারিলেন না।

পরদিন মাতাপুত্রে যখন দেখা হইল তখন উভয়ের মনই বেশ প্রসন্ন, মনে হয় বিপিনবিহারীও মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। আফিস যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন, নিস্তারিণী দেবী বিরাজমোহিনীর কোলের মেয়েটিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"বেটি তোমার বড় ন্যাওটো হয়ে উঠেছে দেখছি মা।"

নিস্তারিণী দেবী উত্তর করিল—"আমিই ওর ন্যাওটো হয়ে উঠেছি, কাল যা করে ছেলে তিনটেকে তোর হাত থেকে বাঁচালে...."

দু'জনেই হাসিয়া উঠিলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"সত্যি বড্ড রাগ ধরেছিল ...ঠিক কথা, তুমি না কি রাগ করে থেকে গেলে মা?...বাঃ, কেন?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"রাগ করিয়ে চলে যাওয়ার চেয়ে রাগ করে থেকে যাওয়াটাই ভাল হবে না?"

বিপিনবিহারী জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, না, আমি রাগ করব কেন? তুমি যাও।...মা, ভেবে দেখলাম তুমি এখন নিত্য গঙ্গাস্নান করে ওদের আশীর্বাদ করো, তাইতেই ওদের মঙ্গল। তোমায় বঞ্চিত করলে ওদের কি করে ভালো হবে?"

হাসিয়াই বলিলেন নিস্তারিণী দেবী—"এও এক ধরণের রাগের কথাই হোল

বিপিন ; হয়তো সেটা তুই ধরতে না পেরেই বলেছিস্। তা ভিন্ন তুই আমার দিক্‌টা ভালো করে ভেবে দেখিস্‌নি।”

বিপিন জামা পরিতেছিলেন, থামিয়া, কতকটা ভীত ভাবেই বলিলেন—“সে কি মা ?”

“তা বৈ কি ; গঙ্গা না পেলেই বঞ্চিত হব, ওদের না-পাওয়াটা বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে পড়ে না ?···ওসব নয়, আমি কাল ভেবে ভেবে ঠিক করেছি, আমি কোনও দিক্ থেকে বঞ্চিত হব না,—শশাঙ্ক আর শৈলেনকে আমার সঙ্গে দে, চণ্ডী যেমন সাঁতরায় পড়াশোনা করছিল, এরাও সেই রকম করুক ; সত্যি, এখানে থাকলে বিগড়ে যাওয়ারই কথা এদের। চণ্ডীর যতটা সুবিধে ছিল, আমি রইলাম, তার চেয়ে এদের বেশি সুবিধেই হবে। পড়াশোনার তেমন বুঝি না, কিন্তু আমার মনে হয় এরা এমনই অনেকটা পেছিয়ে গেছে ; সেই কবে হাতে-খড়ি হয়েছে, কী-ই বা করেছে এর মধ্যে ? বড়ঠাকুর নেই, তেমনি খেতন রয়েছে, স্কুল, পাঠশালা—যেমন সুবিধে হয় ভর্তি করে দেওয়া যাবে—নিয়মের টানে পড়াশোনা আপনি হয়ে যেতে থাকবে।”

ছেলেকে দ্বিধা-সঙ্কোচের কোন অবসর না দিবার জন্যই নিস্তারিণী দেবী যেন এক নিঃশ্বাসে তাঁহার প্রস্তাবের স্বপক্ষে যা' যা' আছে সব বলিয়া গেলেন, তাহার পর একটু থামিয়াই বলিলেন—আরও একটা কথা এই সঙ্গে বলেই দিই—আমিও তাহলে টেঁকতে পারব বাবা। একটু স্বার্থপরের মতন শোনাচ্ছে বোধ হয়, কিন্তু তুই এক বার চারি দিক্ ভেবে দেখ।”

বিপিনবিহারী জামার একটা বোতাম দিতে দিতে থামিয়া গেছেন, মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, মস্ত বড় একটা সমস্যা মিটিয়া যাওয়ায় একটা মৃদু হাস্যের সঙ্গে মুখটি যেন আলোয় ছাইয়া গেছে, বলিলেন—“মা····”

তাহার পর মনটাকে গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—“আমার মাথাতেও কথাটা কেন যে আসেনি তাই ভাবছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও যে হচ্ছে মা—তোমার ঘাড়ে আবার এই বোঝা চাপিয়ে দোব ?—কোথায় একটু হাল্কা হয়ে যাবে, না····”

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—“বোঝাটা তোরও নয় আমারও নয় বিপিন ; যাঁর বোঝা তিনিই আড়ালে থেকে ব্যবস্থা করছেন। সত্যি সামান্য কথাই, কাল সমস্ত রাত জেগে জেগে শেষ কালে যখন হঠাৎ মনে হোল, মনে হোল খুব খানিকটা ভাবিয়ে ভাবিয়ে তিনি এক কথাতেই সমস্যাটা যেন পূরণ করে দিয়ে গেলেন।····তুই আর অমত করিস্‌নি বিপিন।”

৪

সম্পূর্ণ নিজে হইতেই যে সংসার চালাইবার বয়স হয় নাই গিরিবালার এমন নয়, অভিজ্ঞতাও হইয়াছিল যথেষ্টই, কেন না, নিস্তারিণী দেবী তাঁহার হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এদিকে, তবু একটা মস্ত বড় ভরসা ছিল যে শাশুড়ি মালা-হাতেই হোন বা নাতি-কোলেই হোন, নিকটেই আছেন।....বেশ খানিকটাই দিশেহারা হইয়া পড়িলেন।

আবার এই সময়টিতেই আসিল পুত্রের নিকট হইতে প্রথম বিচ্ছেদ : একটা অদ্ভুত অনুভূতি,—সবই আছে তাহার মধ্যে এরা দুই জন না থাকিয়া মনটাকে যেন অষ্টপ্রহর অধিকার করিয়া রহিল—নিজেরাই একটা শূন্যতা সৃষ্টি করিয়া নিজেদের জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। এ-সময়ের কথাটা উত্তরকালে গিরিবালা প্রায়ই শশাঙ্ক-শৈলেনের কাছে বলিতেন—"সে কী যে অসহ্য অবস্থা মনে পড়লে আমার এখন পর্যন্ত যেন মনটা কি রকম হয়ে যায়। মা-ও গেলেন চলে, কিন্তু হঠাৎ হোলেও আমি কতকটা তোয়ের ছিলাম। তোরা যেতে আমি যেন কি করব ভেবে উঠতে পারলাম না। আরও মনটা আইঢাই করতে লাগল; এই জন্যে যে আমি শেষ পর্যন্ত যদি কান্নাকাটি করতে থাকতাম তো বোধ হয় হোত না যাওয়া—বাহাদুরী দেখিয়ে রাজি হলাম বলেই ওঁর সুবিধা হয়ে গেল। মা-ই তুলেছিলেন কথাটা, কিন্তু আমার মনের অবস্থা দেখে প্রথমটা দোমনা হয়ে পড়লেন, তারপর আমি নিজে গিয়ে যখন রাজি হয়ে বললাম মাকে...."

গিরিবালা থামিয়া, ছেলেদের বিস্মিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া হাসিয়া ওঠেন, বলেন—হ্যাঁ রে, আমিই গিয়ে নিয়ে যেতে বললাম মাকে—আর জ্বালার কথা বলিস্ কেন? তবে এ-ও বলি, সে কি আমি বললাম? বলালেন আমার মুখ দিয়ে উনি। আমার তো তখন এক রকম মাথার ঠিক নেই; মা চলে যাচ্ছেন, তার ওপর তোদের যাওয়ার কথা শুনে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছি; একবার ঠাকুরঝিকে ধরছি—একবার ও-বাড়ির দিদিকে গিয়ে ধরছি, একবার ছোট ঠাকুরঝিকে ধরছি—বলো তোমরা বুঝিয়ে—একে মা যাচ্ছেন, তার ওপর এ-দুটো গেলে আমি বাঁচব না—ওরা ফিরে এসে আমায় দেখতে পাবে না।.... মাকে বলতে পারছি না; তিনিই তুলেছেন কথাটা, একলা থাকতে কষ্ট হবে এ-ও বলেছেন, এর ওপর নিজের মুখে গিয়ে বললে ভাববেন ছেলের ওপর জোর খাটাচ্ছে,—মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলব, রাগ করেই বোধ হয় ছেড়ে যাবেন। দিদি, ঠাকুরঝিদেরও মাকে বলতে বারণ করে দিয়েছি—ওঁরা ওঁকে

বলুন, উনি মাকে বলুন; ওঁর ঘাড় দিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে নিতে চাইছি.আর কি।....এমন কি, ঘরের কোণে একবার কাঁদতে দেখে মা জিগ্যেস্ পর্যন্ত করলেন—'বৌমা কাঁদছ—ছেলে দু'টোর জন্যে মন-কেমন করছে?'....তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললাম—'না মা, তুমি চলে যাচ্ছ'—বলেই হাপুস নয়নে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলাম।

সেদিন ওঁর বাইরে কি একটা কাজ ছিল, খুব রাত করে খেতে বসলেন। ঠাকুরপো, ঠাকুরজামাই আগে খেয়ে নিয়েছিলেন। মার একাদশী ছিল, খাবার সময় ওঁর কাছে বসতে পারলেন না। ঠাকুরঝিও মার গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিলেন; আমাকেই বসতে হোল। ভাবলাম মন্দ হোল না, একটু সুবিধে পেলেই তোদের যাওয়ার কথাটা পাড়ব, যাতে বন্ধ করে দেন।

খুব যেন অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিলেন, একবার হঠাৎ মুখটা তুলে বললেন—'মা শশাঙ্ক আর শৈলেনকে নিয়ে যাবেন না বলছেন।'

—মুখটা বেশ রাগ'-রাগ'।

একটু দমে গেলাম, বললাম "কৈ, আমি তো কিছুই বলিনি।"

বললেন—'বলতে হয় না, সমস্ত দিন যেরকম কেঁদে-কেটে বেরিয়েছ তাতেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়েছে। ছেলেগুলো আকাট মুখ্যু হয়ে রইল।"

আমি চুপ করে রইলাম। উনিও চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন, তারপর এক বার মুখ না তুলেই বললেন—'তুমি মাকে আবার বুঝিয়ে বলো, যাতে নিয়ে যান।'

কোন উত্তর না পেয়ে একবার একটু চোখ তুলে আমায় দেখে নিলেন, বোধ হয় মুখের ভাবটা দেখে বুঝলেন গতিক সুবিধের নয়। চুপ করে আবার খেয়ে যেতে লাগলেন।....বোঝ্, কোথায় আমি চেষ্টা করছি ওঁর ওপর দিয়ে বন্ধ করব যাওয়া, উনি মতলব আঁটছেন আমিই গিয়ে মাকে বলে ব্যবস্থা করি!"

গিরিবালা হাসিতে থাকেন। হাসিতে হাসিতেই বলেন—"কিন্তু কি করে জিতলেন শোন্ না, আমি কি পারি এঁটে উঠতে কখনও?....ভাবটা কি বুঝবার জন্যে ঠায়ে মুখের দিকে চেয়ে আছি—উনি ঘাড় হেঁট করে খেয়ে যাচ্ছেন—দেখি, আস্তে আস্তে রাগের ভাবটা গিয়ে মুখটা সহজ হয়ে এল। আলুর দম হয়েছিল, একটা মুখে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে তক্ষুনি আর একটা মুখে ফেলে দিলেন, জিগ্যেস্ করলেন—'এটা কি বিরাজকে দিয়ে রাঁধিয়েছ নাকি?'

গিরিবালা এখানটা একেবারে জোরে হাসিয়া ওঠেন, হাসির ঝোঁকে চোখে জল জমিয়া যায়, মুছিয়া বলেন—"সেদিন মনের ঠিক নেই, আলুর দমটা নুনে

একেবারে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, ঠাকুরজামাই ঠাট্টা করে বললেন পর্যন্ত—যাতে কখনও নেমকহারামি না করতে পারি বৌদি তার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছেন আজ।....সেই আলুর দমের প্রশংসা! মতলবটা আমার ধরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু মেয়েছেলের রান্নার প্রশংসা হলে তো আর তার জ্ঞানগম্যি থাকে না, বললাম—'কেন?—ঠাকুরজামাই বলছিলেন বড্ড নুণ-খোর হয়েছে, মুখে দেবার জো নেই বুঝি?'

উনি সে-কথার উত্তর না দিয়ে আরও দু'টো মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—"ঠাকুরের হাতে খেয়ে খেয়ে তারুর জিব পানসে হয়ে গেছে। আলুর দম তো লাউডালনা নয়,—তাতে নুণ চাই একটু; নুণ আর ঝাল।"

চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন। আমার মন তখন ভিজে গেছে,—একটু পরে জিগ্যেস্ করলাম—'দোব আর দু'টো?'

বললেন—'দাও, তাহলে আর দু'খানা রুটিও এনো।'

ভুলেও কখনও একখানা বেশি রুটি খাবার মানুষ নন, আমি মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গোটা আষ্টেক আলু আর দু'খানা রুটি এনে পাতে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। নুণের চোটে জিভ হেজে গিয়েছিল, সেটা কিন্তু আমায় এক বছর পরে বললেন। তখন এমন ভাবটা করে খেয়ে যেতে লাগলেন, যেন কী অমৃতই না খাচ্ছেন!

আলুর দম খাবার সময় কথাটা তুললে আমি হয় তো মতলবটা ধরে ফেলতে পারি, সেইজন্য এ-কথা-সে-কথা-পেড়ে কখন বেলেতেজপুরের কথা এনে ফেললেন, তার পর একেবারে দুধ খাবার সময় রুটি মাখতে মাখতে বললেন—'বিকাশ দাদার কথা মনে আছে তোমার?'

বললাম—'তাঁকে রোজই মনে পড়ে বোধ হয়।'

বললেন—'মনে পড়বার মতন মানুষই। তোমার তো দাদাই, পড়বেই মনে।'

দু'-এক গাল খেয়ে বললেন—'তুমি একবার বলেছিলে—তাঁর বড় ইচ্ছে তোমার ছেলেরা মানুষের মতন হোক; কেউ উপযুক্ত মা হয়ে উঠছে দেখলে তিনি না কি খুব আনন্দ পান।'

এইটুকু বলেই এক লেকচার—এখনই বলছি লেকচার, তখন কি আর ধরতে পেরেছিলাম?—উপযুক্ত মায়ের কাজ সোজা নয়—ছেলেদের মুখ চেয়ে তাদের অনেক সময় বুক বাঁধতে হয়—আজ যেটা আদর, আজ যেটা মায়া, এক সময় বোধ হয় সেটা ছেলের পক্ষে বিষ হয়ে উঠতে পারে—বিশেষ করে

কচি বয়সে মা-ই সব কিছু ছেলের পক্ষে, আর ছেলেবেলাটা শেখবার সময় বলে ছেলের জীবনে মায়ের দায়িত্বটাই বেশি—বিকাশ দাদা আমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু দেখেছিলেন, তাইতেই তো অমন আশা করে বলেছিলেন আমার ছেলেদের তিনি বড় দেখবেন এক দিন।

এই রকম আস্তে আস্তে বিনিয়ে বিনিয়ে এক-রাশ বলে গেলেন, অত কি মনে থাকতে পারে? শেষকালে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—'এই দেখো আমার ভুল!—হঠাৎ কি করে বিকাশ দাদার কথাটা মনে পড়ে গেল,—তুমি না আবার ভেবে বস তুমি পাঠাতে নারাজ বলে তোমায় পাকে-প্রকারে রাজি করবার চেষ্টা করছি....'

ভালো তরকারির দোহাই দিতে মনটা ভিজেই ছিল, তার পর বিকাশ দাদার কথা এনে আকাশে তুলে দেওয়া—আমি দিলাম ফাঁদে পা বাড়িয়ে, বললাম—'নারাজ হতে যাব কেন? তবে···?'

চুপ করে গেলাম। উনি একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—'তাহলে বলবে মাকে?'

আমি চুপ করে রইলাম দেখে বললেন—'তাহলে আমিই বলব মাকে, কি করব?—তুমি যখন চাও না বলতে তখন তো জবরদস্তি নেই; তবে ফল হবে না। মা বলবেন—ওরা চলে গেলে তুমি কেঁদেকেটে অনর্থ করবে।'

বলে ফেললাম—'কান্নাকাটি কেন করতে যাব?'

বললেন—'নাই কর, কিন্তু মা তো করবে বলেই ধরে নেবেন?'

আবার একটু বোধ হয় চুপ করে গেলাম, তার পর বাহাদুরি দেখিয়ে বললাম—'আমি না হয় বলব'খন। ওদের ভালোটা আগে দেখতে হবে তো?'

উনি আস্তে আস্তে দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন।

গিরিবালা আবার এক চোট হাসিয়া ওঠেন, ছেলেদের জিজ্ঞাসু নয়নের পানে চাহিয়া বলেন—'তার পর আর কি? তার পর আমিই গিয়ে মাকে বললাম; কী বোকাই যে বনেছিলাম সে বার!'

মা বললেন—'বেশ করে ভেবে দেখো বৌমা, পারবে তো থাকতে। না হয় এর পর কেউ গিয়ে ওদের রেখে আসবে'খন।'

বললাম—'না মা, লেখা-পড়ার কথা যখন, তখন আর দেরি করে কাজ নেই, আবার কবে সুবিধে হবে না হবে···'

যেন পাঠাবার জন্যে আমারই জিদ, আর কেউ গা করছে না!—ঐ যে, উপযুক্ত মা হওয়ার কথা হয়েছে, আর রক্ষে আছে?"

একটু হাসিয়াই সে-দিনের অসহ বিচ্ছেদযাতনার স্মৃতিতে যেন অভিভূত হইয়া বলেন—"তার পর তোরা চলে যেতে যে কী অবস্থা আমার—যেন পাগলের মতন হয়ে গেলাম! তোদের কাউকে ছেড়ে কক্ষনও থাকিনি—যে ঘরেই যাই, যে কাজেই হাত দিই—প্রাণ যেন আইঢাই করে ওঠে—কেন মরতে বলতে গেলাম মাকে—আবার উলটে বাহাদুরি করে জিদ করেই পাঠিয়ে দিলাম। বাড়িতে টেঁকতে পারি না; ও-বাড়িতে দিদির কাছে বসি, হাউ হাউ করে কাঁদি। দিদি এক একবার বোঝান, এক একবার ধমক দেন, বলেন—'তোর এই দশাই হবে। দুগ্ধপোষ্য শিশু দু'টো, কী বলে তুই কাছছাড়া করলি? আমরা তুললাম কথাটা মাসিমার কানে; তিনি যদি মত বদলালেন তো উনি গিন্নিপনা করে জিদ ধরে বসলেন—নিয়ে যাও।....এখন কাঁদলে কি হবে?'

দিদির হাতে পায়ে ধরে বলি—'তুমি বড়ঠাকুরকে বলে একটা ব্যবস্থা করো। না হয় তার করে দিন আমি মরণাপন্ন, ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।'...ঠাকুরঝিকে বলি—'আমার দুর্বুদ্ধি হোল তো তোমরা কেন সামলে নিলে না? মা যাচ্ছেন, আমার কি মাথার ঠিক ছিল?'

যখন কাছে ছিলি, কিছুই খেয়াল করতাম না। এখন, কবে কি একটু বলেছি, কবে বোধ হয় রাগের মাথায় একটু গায়ে হাত তুলেছি, কবে কিসের জন্যে মুখটি চুণ করে এসে দাঁড়িয়েছিস্, কাজের মধ্যে বোধ হয় জিগ্যেস্ করাও হয়নি, কখন চলে গেছিস্—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে পড়তে লাগল আর মনটাকে যেন তোলপাড় করতে লাগল। শৈলেন একবার অসুখ-শরীরে বিছানায় শুয়ে কয়েক বার ডেকে ডেকে চুপ করে গিয়েছিল; মার ঘরে আমি কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কাজটা শেষ হতে গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে একটু একটু জল গড়াচ্ছে। তখন অত ভাবিনি, কিন্তু শৈলেনের সেই ঘুমন্ত মুখ মনে পড়ে পড়ে আমায় যেন অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগল। কেবলই অমঙ্গল মনে হতে লাগল,—শৈলেন সেখানে অসুখে পড়ে এই-রকম করে ডাকবে আমায়। আমি শুনতেও পাব না! অত যে বাহাদুরি করে পড়াশোনার জন্যে পাঠানো—তা একব্বারও কি মনে হোল রে যে তোরা খুব পড়া করছিস্, সুখ্যেত হচ্ছে, উপযুক্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস্? তা হলেও তো একটা বল পেতাম মনে। এ শুধু পাণ্ডুলের পুরন কথা সব, আর ও-দিকে সাঁতরার কথা মনে হলেই অমুঙ্গুলে ভাবনা—সে যে কী গেছে ক'টা বচ্ছর!..."

শৈলেনেরও সে সময়ের কথাটা বেশ মনে পড়ে। প্রথম দিক্‌টা মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া যে বিশেষ কোন কষ্ট হইয়াছিল এমন মনে পড়ে না। রেলে চড়িতে পারিবে এই আনন্দের সঙ্গে একটা নূতন জায়গায় নূতন জীবনের রোম্যান্সে মনটা ডুবিয়াছিল। আর সবে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া গেল বলিয়া সেই আনন্দ আর রোম্যান্সটা ছিল এত ঘনীভূত যে অন্য চিন্তা প্রায় আসিবার ফাঁক পায় নাই একেবারে।...নাপতে ডাকাইয়া দুই ভাইয়ের চুল একটু ভদ্র করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইল। বাজার থেকে ভাল ছিট কিনাইয়া আসিল, দরজি আসিয়া মাপ লইয়া গেল, যাওয়ার আগের দিন রাত্রে ভালো করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা হইল, তার মধ্যে বাসমতী ধানের চিড়ার পায়সের স্বাদ যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে এই সব নগদ প্রাপ্তির উন্মাদনায় দুইটা দিন যেন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। নিজের সম্বন্ধে এই, কিন্তু আশ্চর্য হইলেও ওরই পাশে দাদার সম্বন্ধে মনের ভাবটা ছিল অন্য রকম, এও বেশ মনে পড়ে। দাদা একটু নিরীহ গোছের, শরীরেও একটু দুর্বল, এবং সাধারণতঃ শৈলেনের চেয়ে মা-ঘেঁসা। নিজের উল্লাসের মধ্যে শৈলেনের এক একবার দাদার জন্যে মন কেমন করিতেছিল,—বড় ভাই দুর্বল, ভালমানুষ হইলে তাহার প্রতি যেন ছোট ভাইয়েরই ভাবটা আসে—শৈলেনের এক একবার মনে হইতেছিল—আহা দাদার কষ্ট হবে, দাদার এখানে থাকলেই ভালো...

বেশ মনে পড়ে পাণ্ডুলের বাহিরে দাদাকে যেন কল্পনাতেই আনিতে পারিতেছিল না।

যাওয়ার আগে পর্যন্ত দুইটা দিনের এই ইতিহাস; অন্ততঃ এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে। আশ্চর্যও লাগে,—বাড়ি থেকে একটু দূরে গেলেই যে মার কাছে মনটা পড়িয়া থাকিত, সেই মাকে ছাড়িয়া অত দূরে যাওয়ার কথায় কোন বেদনা ছিল না কেন প্রথম প্রথম!

তাহার পর যাত্রার মুহূর্ত থেকে সব যেন উল্‌টাইয়া গেল। নূতন কাপড়-জামা পরিয়া ভরা ঘটির সামনে প্রণাম করিয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিল। মা আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন, দুই ভাইয়ে এক-সঙ্গে প্রণাম করিবার জন্য নত হইতে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দুই ভাইয়েই উঠিয়া অপ্রতিভ ভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া নতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কে আগে আরম্ভ করিল মনে নাই, তবে দুই জনেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মা দুই জনেরই কোঁচার খুঁটে একটা করিয়া সিকি বাঁধিয়া দিয়া কান্নার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলিলেন—চুপ কর বাবা, নৈলে আমার বড্ড কষ্ট হবে; খুব মন দিয়ে পড়বি, খুব বড় হবি....”

অস্পষ্ট স্বরেই বলিতেছিলেন, বেশ মনে পড়ে—“বড় হবি” বলিতেই মা’র গলার স্বরটা স্পষ্ট আর বিকৃত হইয়া উঠিল, তাহার পর মুখে ঘোমটা চাপিয়া কান্না। ঐ কথা দুইটির উপরই ছিল যে যত অভিমান।

ছাড়াছাড়ির মধ্যে শৈলেন মাকে সেই প্রথম নূতন ভাবে খুব স্পষ্ট আরও নিকটে করিয়া পাইল। কোথায় গেল ওর আনন্দের রোম্যান্স, মনটা হঠাৎ যেন অসাড় হইয়া গেল,—মনে হইল মাকে যেন হঠাৎ নূতন করিয়া, বেশি করিয়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই হারাইয়া ফেলিল। সে যে কী কষ্ট—শিশু-হৃদয়ের কী হা-হুতাশ—বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এ-ভাবটা কবে পর্যন্ত যায় মন থেকে তাহা মনে পড়ে না, তবে এটা স্মরণ আছে যে অত সাধের রেলচড়া বিস্বাদ করিয়া দিয়া ক্রমাগতই মায়ের মুখ ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। উত্তর-জীবনে ব্যাপারটাকে মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া, জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে; এই বিচ্ছেদের গোধূলি-আলোয় মাকে নূতন করিয়া—অত অদ্ভুত ধরণের আপন জানিয়া পাওয়া, নিজের আত্মারই যেন একটা নূতন উন্মেষ, একেবারেই এক নূতন-লোকের আলোকের সম্মুখীন হওয়া,—মনটি একটি পুণ্য-বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দিনটি মায়ের কাছেও, শৈলেনের কাছেও খুব স্মরণীয়।

৫

সন্তান লইয়া কি এক রকম বিড়ম্বনা?

দিন-দশেক পরে বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিলেন। বোধ হয় মনের কোনখানে একপাই আন্দাজ আশা ছিল যে তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া কৈলাশচন্দ্র ছেলেদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য তার করিয়া দিবেন, কিম্বা কোন প্রকারে কিছু ঘটিবে, যাহার জন্য বিপিনবিহারীকে ছেলেদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—অহেতুক আশা গভীর দুঃখের যে চিরসাথী। স্বামীকে একলা ফিরিতে দেখিয়া গিরিবালার শোক আবার এক-চোট উথলিয়া উঠিল। খানিকটা অভিমানও হইল। কতকটা কতকটা দুই কারণেই অনেকক্ষণ স্বামীর সম্মুখীন হইলেন না; রান্নাঘরে, ভাঁড়ার-ঘরে একটা-না-একটা ছুতা করিয়া

কাটাইয়া দিলেন। বিরাজমোহিনী, অভয়া গিয়া দাদার সহিত কথাবার্তা কহিলেন, পান-তামাক যাহা দরকার পড়িল জোগাইয়া দিলেন, তাহার পর রেলের কাপড়েই একবার হাজরিটা দিয়া আসিবার জন্য বিপিনবিহারী তাড়াতাড়ি আফিসে চলিয়া গেলেন, একটা দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

খানিকটা সময়ও গেল, তাহা ভিন্ন বোধ হয় এও একটু মনে হইয়া থাকিবে যে, স্বামী ক্ষুণ্ণ হইয়াই ধূলাপায়ে আপিসে চলিয়া গিয়াছেন; ফিরিয়া যখন জামাজুতা খুলিতেছেন, গিরিবালা গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতেই একটু আড়চোখে দেখিয়া লইয়াছেন—না, স্বামীর মুখে রাগের কোন লক্ষণ নাই। প্রসন্ন ভাবেই গল্প করিয়া গেলেন—সাঁতরার কি খবর—মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা কোন্ ঘরে হইল—মনোমোহিনী দেবী গিরিবালাকে একবার দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—খেতন বলে সবাইকেই দেশে রাখিয়া তুমি একলা পাণ্ডুলে থাকো, পুরুষানুক্রমে কি পাণ্ডুলেই পড়িয়া থাকিতে হইবে? ....ছেলেদের নাম লেখানো হইল—শশাঙ্ককে সিদ্ধেশ্বরী মাইনার স্কুলে, শৈলেনকে মহাদেব মাষ্টারের পাঠশালায়—গিরিবালার বোধ হয় মনে পড়িতে পারে—গঙ্গার ঘাটে যাইতে ঠিক মোড়ের উপর পাঠশালাটা পড়ে একটা বাদাম গাছের তলায়....

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"খুব কান্নাকাটি করতে লাগল দুই ভাইয়ে তুমি চলে আসবার সময়?"

বিপিনবিহারী চকিতে একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া লইলেন, তাহার পর নিতান্ত অবহেলার স্বরে বলিলেন—"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না; কান্না? —তারা খুব ফুর্তিতে আছে—একটা ভালো জায়গা, আর মনোদিদির যা আদর। একবারও কি বুঝবার জো রেখেছেন যে পাণ্ডুল ছেড়ে রয়েছে? আসবার সময় একবার মনের ভাবটা বোঝবার জন্য বরং জিগ্যেসও করলাম—যাবি তোরা পাণ্ডুল? শৈলেনটা তো মনোদিদির কোল আঁকড়ে এরকম করে বসল যেন সত্যি আমি তাকে জবরদস্তি নিয়ে আসছি!.... কান্না?—বয়ে গেছে তাদের কাঁদতে ...."

মাথা নিচু করিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই বলিতেছিলেন, শেষ করিয়া উঠিতেই গিরিবালার মুখে দৃষ্টি পড়িতে দেখেন, তাঁহার মুখটা যেন কি-রকম হইয়া গেছে।....এ যে উল্টা ফল হইল। কিন্তু কথাটা ভাবিয়া দেখিবার পূর্বেই ও-বাড়ি থেকে বৌদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গিরিবালা চলিয়া গেলেন।

বিচ্ছেদের ব্যথা অবশ্য মায়ের মন থেকে মেটে না, তবু খুব বড় একটা আঘাত লাগিল গিরিবালার বুকে।—সন্তানেরা এতই শীঘ্র ভোলে?—কি করিয়া সম্ভব হয় ওদের দিক্ থেকে? তাঁহার নিজের মুখে তো দুই দিন একেবারেই অন্ন ওঠে নাই, ও-বাড়ির দিদি টের পাইয়া তৃতীয় দিন হইতে ডাকিয়া নিজের সঙ্গে খাওয়াইতেছেন।....শৈলেন না হয় ছোট, অবুঝ, শশাঙ্ক তো বড় হইয়াছে, মা-অন্ত প্রাণ ছিল,—আসিতেই চাহিল না?—পিসিমার যত্নে মা পর হইয়া গেল?....অভিমানের পাশেই ক্ষমা আসিয়া দাঁড়ায়, গিরিবালা নিজের মনকে বোঝান—আহা, এই রকমই হয় বোধ হয়, বেটাছেলেরা যে আবার বেশি বারমুখো। ওরা ভালো থাক্—হে মা-শীতলা, ওরা তোমার কাছে গেছে, ওদের ভালো রেখো, মাকে ভোলা তো কোন অপরাধ নয়, যদি ভুলেই থাকে ভালো তো, তাই থাক্। যদি এতে কিছুও অপরাধ হয় তো ওরা সু ভালয় ভালয় ফিরে এলে আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পূজো দোব—যদিই কোন দোষ হয়—একটুও—সামান্যও তো আমি সে নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছি....

কেমন করিয়া মনে পড়িয়া যায় কবে কোথায় কোন্ ছেলে মা'র মনে পীড়া দিয়াছে—নানা ভাবেই—কেহ কটু বলিয়া—সে-দিন কামারপাড়ায় লোটনা স্ত্রীকে লইয়া বুড়ি মা হইতে আলাদা হইয়া গেল, কত কান্নাকাটি করিল বুড়ি।....এই যে অহি—চিররুগ্ন হইয়া মায়ের গর্ভে আসিয়াছে, চিরকাল দিবে বেদনা।....শ্বশুরের কথাও মনে পড়িয়া গেল—দরিদ্র জননী, দুইটি ছেলে মাত্র সম্বল, একটি একদিন অদৃশ্য হইল। শ্বশুরের নিজের মুখেই শোনা—কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের একটি চোখ চিরতরেই নষ্ট হইয়া যায়।....না, ওদের ওপর অভিমান করিতে নাই, অমঙ্গল হয় সন্তানের,—মা নাড়ীর রক্তে পুষ্ট করুক, সমস্ত শরীর নিংড়াইয়া বক্ষের ক্ষীর উজাড় করিয়া মুখে দিক, চক্ষু দিক, কিন্তু সব দেওয়ার সঙ্গে যেন অভিমান এতটুকু সন্তানের উপর না পড়ে,—অমঙ্গল হইবে।...."হে মা-শীতলা, তারা যেন ভাল থাকে, যেমনটি নিয়েছ, ফিরিয়ে দিও; তোমায় বুকের রক্ত দিয়ে পূজো দোব।"

কি করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া যায়—সন্তানরূপিণী গিরিবালার দিকে। মনে পড়ে জেঠামশাই, জেঠাইমা, বাবা, মা,—একসঙ্গে সবাইকে। উঃ, কত দিন দেখেন নাই, চিঠি আসিয়াছিল জেঠামশাইয়ের অসুখ; বেশ তো ভুলিয়া আছেন সবাইকে!....হইবে না? সন্তান যে!....

খজনী বলিল—"তুলহীন্, খোঁথা, বড়কা-খোঁথা—ই সব...."

বিশেষ কিছু প্রশ্ন নয়; এই সে-দিন গেল, কীই বা প্রশ্ন আছে এমন? খজনীর প্রশ্নটা যেন অনির্দিষ্টভাবে মাঝপথে এলাইয়া গেল।

অন্যমনস্ক ভাবেই গিরিবালা যেখানটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সে দিক্‌টা কলতলা। দাওয়ার ওপর দাঁড়াইয়া আছেন; খজনী বোধ হয় অহিকে দুধ খাওয়াইবার জন্য একটা বাটি আনিয়া মাজিতে বসিয়াছে।

গিরিবালা নিজেকে খুব সামলাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর একেবারেই ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন—"খোঁথা সব হমরা ভুল গেলেই গে খেজনী!...."

অত করিয়া সন্তানের পক্ষ লইবার চেষ্টা বিফল হইল। হাতে আঁচলের একটা তাল পাকাইয়া মুখে চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিরাজমোহিনী চলিয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার পর দিন ও-বাড়িতে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। দুপুরবেলা এঁরা আফিসে চলিয়া গেলে ননদ-ভাজে মিলিয়া চার জনে আহার করিতে বসিয়াছেন, কৌনির পায়স লইয়া শশাঙ্কর কথা উঠিল। জিনিষটা চালের খুদের মতো এক রকম শস্য, এর পায়স শশাঙ্কর বড় প্রিয় ছিল। অভয়া দেবী বলিলেন—"আহা, দেশে আবার এসব জিনিষ পাওয়া যায় না, শশাঙ্কটা বড্ড ভালোবাসতো গো!"

বড় জা মুখটা ভার করিয়া রাগিয়া উঠিলেন—"না বাপু, মনে করি কিছু বলব না, কিন্তু না বলেও পারি না;—নিজে জিদ করে ছেলে দু'টোকে পাঠিয়ে দিলে গা!—ধন্যি বলি মায়ের প্রাণ! কাল ঠাকুরপো যখন বলছিলেন এমন রাগ ধরছিল তোর উপর বৌ! বলেন—কখনও ওদের গর্ভধারিণীর কাছ-ছাড়া হয়নি। থাকতে কি চায় বৌদিদি? যে কটা দিন ছিলাম, সঙ্গে নিয়ে আসব বলে ভুলিয়ে রেখেছিলাম, তা যখনই দেখা হয়—'কবে যাবে বাবা? কখন যাব মার কাছে?'....শৈলেনটা ছোট, আরও হেদিয়ে পড়েছে।—আসবার দিন কাটা ছাগলের মতন দু'টোতে উঠোনে গড়াগড়ি দিতে লাগল...."

গিরিবালা হাত বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—"দিদি!"

কৌতুকে, বিস্ময়ে এবং তাহার সহিত একটা অদ্ভুত আনন্দের হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

জা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি লো?"

গিরিবালা একটু জোরেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর তোমার দেওর আমায় কি বললেন জানো?—তারা বেশ আছে, দিব্যি আছে, কত করে বললেন তবু আসতে চাইলে না।....কী মানুষ বাপু, এ রকম করে মিথ্যে।...."

আর আমি ভাবছি জোর করে বিদেয় করলাম বলে তারা বুঝি সত্যি আমায় ভুলে....”

প্রায় অলক্ষ্যেই হাসিটা মিলাইয়া গিয়া চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল; কথা বন্ধ হইয়া গেল। বুকের বেদনাটা একটা দীর্ঘশ্বাসে হালকা করিয়া বলিলেন—“একটা দোষ করেছি বলে কি সত্যিই তারা আমায় অমন করে ভুলবে দিদি?”

অদ্ভুত হাসির মধ্য দিয়া কথাটা এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল যে, সকলেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, জা আঁচলে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—“চুপ কর্ বৌ, আমার কথাটা বলাই ভুল হয়ে গেছে। ঠাকুরপো একটা ভেবে তোকে বানিয়ে বলেছিল ও-রকম করে; ভুল হয়ে গেছে আমার, জানতাম না তো। চুপ কর্, খেতে বসে চোখের জল ফেলতে নেই, অকল্যাণ হয়...”

তাহার পর আহারটা নীরবেই হইল। পায়সের বেলায় গিরিবালা বলিলেন—“আর কিছু খেতে পারব না দিদি, পেট ভরে গেছে।”

কেহ জিদ করিল না, অবশ্য নিজেও কেহ স্পর্শ করিল না।

কিন্তু এ-ও এক জ্বালা, কোন দিকেই বা যায় মা?—ছেলেরা ভুলিয়া বেশ ভালো আছে, নিশ্চিন্ত আছে—এতেও দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান; আবার এখন সব কাজের মধ্যেই মনে হয় দুই ভাইয়ে মায়ের অভাবে মুখ চুণ করিয়া নিরুপায় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উঠানে পড়িয়া কাটা ছাগলের মতো ছটফট করিতেছে।....কত রকম ছুতা করিয়া ক্রমাগতই চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিতে হয়।

তবুও সংসার সংসারই, ছেলেদের চিন্তা চাপা দিয়া দায়িত্বের বোঝা আনিয়া ঘাড়ে ফেলিল।

কার্তিকের মাঝামাঝি নিস্তারিণী দেবী গেলেন, অগ্রহায়ণ থেকে খামারে ধানের বোঝা পড়িতে আরম্ভ করিল। মাড়াই হইয়া বোরাবন্দী হইতে কিছু দিন গেল, তাহার পর গিরিবালার অধীনে আসিয়া পড়িল। এ একটা অত্যধিক কর্মচঞ্চল জীবন। উঠানে প্রত্যহ শুকাইয়া প্রত্যহ জড়ো করিবার ব্যবস্থা করা, বেশিভাগ সিদ্ধ করানো, মরাইয়ে তুলিবার ব্যবস্থা করা, ধান কোটাইয়া চালের ব্যবস্থা করা, চালের ঘরে বড় বড় মাটির কুটিতে তুলিয়া রাখানো—প্রায় দুই মাস ধরিয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার যো থাকে না। অবশ্য বাহির হইতে খানিকটা সাহায্য হয়, তবু প্রায় সমস্তটাই মেয়ে-মজুর লইয়া এবং বাড়ির মধ্যেকার ব্যাপার

বলিয়া গিরিবালারই এলাকায় পড়ে। ছুতার কামারপাড়া হইতে অনেক মেয়েছেলে আসিয়া পড়ে, না দেখিলে ফাঁকি দেওয়ায় সুদক্ষ। তা ভিন্ন বিলক্ষণ হাতটান আছে, অষ্টপ্রহর চারি দিকে চোখ রাখিয়া না চলিলে উপায় নাই। অন্য বার শাশুড়ি থাকিতেন, অনেকটা সাহায্য হইত। গিরিবালা অবশ্য বলিতেন—"মা তুমি ব'স, পূজোর ব্যাঘাত হবে," কিন্তু নিস্তারিণী দেবী নামিয়াই পড়িতেন কর্ম্মক্ষেত্রে। মালাটা হাতেই থাকিত, তবে ঘোরানয় যে বিঘ্ন হইতেছে সেটা অস্বীকার করিতেন না, হাসিয়া বলিতেন—"মা-লক্ষ্মীকে ঘরে তুলছি বৌমা, এও-তো পূজো, বরং আসল পূজো। মানুষের কি দোষ জান বৌমা ? মা সাক্ষাৎ রূপ ধরে এলে তাঁকে চিনতে পারে না;—এই তো এসে দাঁড়িয়েছেন মা !" এবারে শাশুড়ি নাই, কিন্তু তাঁহার কথাগুলো, তাঁহার শ্রদ্ধা মনে গাঁথিয়া আছে গিরি-বালার। সাক্ষাৎ রূপই বটে মায়ের।····মধুসূদনের জমির দিকে ঝোঁক ছিল না, নিশ্চয় অবসরও ছিল না, যখন গেলেন সংসারটিকে একরূপ কপর্দক-শূন্য করিয়াই গেলেন ; এই ধান্যরূপা লক্ষ্মীর জোরেই তো বিপিনবিহারী সেই মহাসঙ্কট কাটাইয়া প্রতিষ্ঠার পথে দাঁড়াইয়াছেন। এ-বাড়ির সবাই চেনে এ-রূপকে। গিরিবালা ছোট জাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, অভয়া দেবী আছেন, তিন ননদ-ভাজে অষ্টপ্রহর লক্ষ্মী তোলায় ব্যস্ত থাকেন, কাঁধে ষোল আনা ভার পড়ায় উৎসাহ আরও যেন বাড়িয়া গেছে।····নিস্তারিণী দেবীর পত্র আসে—আর সব প্রশ্নের মধ্যে ধানের প্রশ্ন আগে—কোন্ ধান কত হইল এবারে—চাল কত উঠিল কুটিতে—নবান্নের অমুক দিন, পাঁচ রকম চাল দিয়া যেন নবান্ন করা হয়—চালের ইতর-বিশেষ করা এবাড়ির নিয়ম নয়····

উত্তর দিতে হয় সবিস্তারে ; ধান তোলা-পাড়া, সিদ্ধ করানো, চাল-ছাঁটা এই সবের মধ্যে তিন জনে বসিয়া খুঁটিয়া-খুঁটিয়া চিঠি পড়িয়া একটি একটি কথার উত্তর তৈয়ারি করেন। অভয়া দেবী বলেন—"বাবাঃ, সেই যে কথায় বলে ঢেঁকি সগ্‌গে গেলেও ধান ভানে, মারও হয়েছে তাই, ওঁর আবার ঘটা করে গঙ্গাস্নান আর তীর্থ করা !"

খুব হাসি পড়িয়া যায়। ছোট বধূ লেখেন, অভয়া দেবী বলেন—"লেখা—তোমার মাঝের কুটি খাঁ খাঁ করেছে—যেটাতে তোমার আদরের বাসমতী চাল থাকত ; একেবারে হয়নি ও-ধান এবারে। দেখো না, মা-গঙ্গা, মা-শেতলাকে ছেড়ে যদি 'হা-বাসমতী, হা-বাসমতী'—বলতে বলতে না ছুটে আসেন তো····"

কর্মের আনন্দের মধ্যে হাসির জন্যই মনটা থাকে উন্মুখ, ধান-কোটার

শব্দ আর মজুরণীদের মুখরতার মধ্যে সুবিধাও অনেক, হাসির মধ্যে আর এতটুকু কুণ্ঠা বা খাদ থাকে না।

ধান-চালের পাট সারিতে শীতের অর্ধেকটা একরকম করিয়া কাটিয়া গেল। ছেলেদের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়, তবে কর্মের খরস্রোতে কোন কিছুরই গোড়া বসিতে পায় না। কোন একটা অলস অবসাদ-মূহূর্তে হয়তো মনটা চঞ্চল হইয়া পড়ে, চক্ষু দুইটি সজল হইয়া ওঠে, তাহার পর—"হে ডুলহীন" বলিয়া কেহ একটা কাজের তাগিদ লইয়া উপস্থিত হয়, চোখের জলের সঙ্গে স্মৃতির আমেজটুকুও মুছিয়া ফেলিয়া কর্মস্রোতে আবার গা ভাসাইয়া দিতে হয়।

ধান-চালের হাঙ্গাম মিটিলে আসিল অবসর, কর্মচঞ্চলতার পর আলস্যে মনটা যেন আরও উদাস করিয়া ফেলে। শীতের অপরাহ্ণটুকু স্বল্পায়ু—সন্ধ্যা আসিলেই নিত্যদিনের কাজ আসিয়া পড়িয়া চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু ঐ একটুখানি সময় কাটানোই প্রতিদিনের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। শুধু ওদের চিন্তা, আর তার সমস্তটাই দুশ্চিন্তা। এক এক দিন গিরিবালা খজনীকে দিয়া দুলারমনকে ডাকিয়া পাঠান; দুলারমনের নিজের একটা ব্যথা রহিয়াছে বলিয়া তাহার সঙ্গটা লাগে ভালো। সে নিজের কথা খামকা তুলিতে চায় না, তবে গিরিবালার বেদনা-আশঙ্কার ইতিহাস চুপ করিয়া শোনে, ভিজা মন বলিয়া চোখে শীঘ্র জল জমিয়া আসে।....দুলারমন আর আগেকার দুলারমন নাই, আগে ঠিক যেন এখনকার উল্টা ছিল। ওর মুখের হাসি অবশ্য শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাহার জীবনের কথা আসিয়া পড়ে এই ভয়ে ক্রমাগতই কথার মোড় ফিরাইয়া নিজের সেই পুরান কালের হাস্যমুখরতার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহ রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। মায়ের মৃত্যুর পর ও-চেষ্টাটাই যেন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।....ও যেন নিজের অদৃষ্ট-দেবতার সঙ্গে একচোট প্রাণপণে লড়িল, তাহার পর মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে হারিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তবে আসে বেশি আগেকার চেয়ে; ডাকিলে তো আসেই, নিজে হইতেও আসিয়া পড়ে কখন কখনও। গিরিবালাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, আজ-কাল যেন আরও বাসে। মনটা আজ-কাল বড় তরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভিন্ন লোক কম বলিয়া বোধ হয় সুযোগ বেশি। খামাকা নিজের কথা তোলে না বটে, তবে একবার তুলিলে, পূর্বে যে সব কথা বলিত না, আজকাল মনের কোণকান্ হাতড়াইয়া বাহির করিয়া বলে।...একদিন ছেলেদের কথা একটু

ঘোরালো হইয়া উঠিল ;—চিঠি আসিয়াছে, শশাঙ্কর আমাশয় হইয়াছিল—শৈলেনটা একটু দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, খেলার মাঝে কোন ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। আবেগের মাথায় ভুল করিয়াই গিরিবালার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"হলেও জ্বালা দুলারমন, একরকম ভালো আছ তুমি।"

দুলারমন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমার যে হওয়া না-হওয়া দু'রকমেরই জ্বালা দুলহীন—অতি বড় শত্রুরও যেন এমন না হয়।"

গিরিবালা চমকিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"কৈ, শুনিনি তো !"

দুলারমনের চোখে দুই বিন্দু জল জমিয়া উঠিল, সে দু'টাকে যেন ধরিয়া রাখিবার জন্যই চিবুক একটু তুলিয়া বলিল—"কেহই জানে না, মাস তিনেকের হয়ে নষ্ট হয়ে গেল। তোমাদের পাহুন (কুটুম) ওরকম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে ওরা বড্ড কষ্ট দি'য়ছিল আমায়, দুলহীন ; তাঁর জিনিষ আমি রাখতে পারলাম না। সেটাও যদি বেঁচে থাকত তবু এত কষ্টের মধ্যে কোন রকম করে....

—বিন্দু দুইটি চিবুক বাহিয়াই নিচে গড়াইয়া পড়িল।

খজনী আসিয়া উপস্থিত হইল ; কোথা নিদ্রা দিতেছিল, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া যাইবার জড়তা লাগিয়া আছে, কোলে অহি ; বলিল—"কোন মতে থাকছে না।"

গিরিবালা বলিলেন—"বসিয়ে দে না এখানে।"

তাহার পর দুলারমনকে অন্যমনস্ক করিবার জন্যই হুকুম করিলেন—"নিয়ে আয় তো কতকগুলো স্থপুরি, দুলারমনকে দিয়ে কুঁচিয়ে নিই—যখন পেয়েছি।"

খজনী ঘর থেকে এক আঁজলা স্থপুরি আর দুইটা জাঁতি আনিয়া চৌকির নিচেটায় বসিল।

স্থপারি কুঁচাইতে কুঁচাইতে গিরিবালা দুলারমনের মনটা একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার জন্য বলিলেন—"তা যদি বললে তো সব চেয়ে খজনীই ভালো আছে।"

খজনী নিচের ঠোঁট দিয়া ওপরের ঠোঁট ঈষৎ ঠেলিয়া ধরিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"কী ভালো আছে গো দুলহীন? আমি জানি খজনীর কথাই হচ্ছিল। খোঁথাকে পাঠিয়ে দিয়ে—'খজনী খুব ভালো আছে'।....ই—স !"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"তাই তো খোকার জন্যে বেচারির ঘুম হয় না।"

দুলারমনও তাহার সদ্য-মর্দিত, নিদ্রালস চক্ষুর পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া আবার সুপারি কুঁচাইতে লাগিল।

খজনী চোখ দুইটা নাচাইয়া নাচাইয়া বলিল—"হ্যাঁগো, করো ঠাট্টা, যার পেটের ছেলে তারই যখন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, সেই যখন নিজে জিদ করে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়...."

দুলারমন একটু বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ধমক দিল—"চুপ কর, পোড়ারমুখী!"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"বলতে দাও না দুলারমন।... ... বেশ তো, প্রাণে লেগেছে তো ভালোই হয়েছে, এবার তুই নিশ্চিন্দি হয়ে ঘর করগে যা, তোর বর তো নিতেও এসেছে শুনলাম।"

খজনী আবার তাচ্ছিল্যের সহিত উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—"ই—স, আমায় নিয়ে যাবে! আমিই এখন ক'ঘাটের জল তাকে খাওয়াই দেখো।"

বিষাদের হাওয়াটা একেবারে কাটিয়া গেছে, গিরিবালা বলিলেন—"দু-একটা ঘাটের নাম কর্ না খজনী, শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।"

খজনী চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর তাগাদা খাইয়া বলিল—"হ্যাঁ, বলতে যাই তোমাদের। ফিরে আসি, তার পর আপনিই টের পাবে।"

সত্যিই একটা কিছু রহস্য আছে টের পাইয়া, সুপারি-কাটা বন্ধ করিয়া দু'জনেই চাপিয়া ধরিলেন।

খজনী মুখ গুঁজিয়া কয়েক বার—"না-না" করিয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি খোঁখাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না—আমি তার কাছে পালাব—সে ছাড়া—মরে যাব আমি—আমি মরে যাচ্ছি—আমি খোঁখার জন্যে নিজে সব ছেড়েছি। তবু আমায় একবার কেউ জিগ্যেস্ পর্যন্ত করলে না—খোঁখাও বেইমান, যাবার সময় আমি সাম্পেনির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, একটা কথাও কইলে না,·· রে খোঁখা, রে খোঁখা, রে বেইমান!...."

হাতের আঁজলায় মুখ ঢাকিয়া খজনী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তখনও দুই জনের মনে বরকে সাত ঘাটের জল খাওয়ানোর হাসিটা জাগিয়া আছে, তাহার ভিতরে যে এত ব্যথা কে জানিত? দুই জনেই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। গিরিবালা বলিলেন—"চুপ কর খজনী, চিঠি এসেছে—তারা শীগ্‌গির আসবে; চুপ কর, কাঁদিস্‌নি।"

৬

এই ভাবে একটা বৎসর কাটিয়া গেল। পাণ্ডুলের জীবন সেই একই রকম—তুলারমন—খঞ্জনী—ও-বাড়ি ;—হরেন গুরুজির পাঠশালায় যায়, দৌরাত্ম্য করে—খেত থেকে কোন নূতন ফসল উঠিল—মাঝে মাঝে এক আধটা ভোজ, ও-বাড়িতে বা এ-বাড়িতে—কোন অতিথি সমাগম হইল হয়তো কোন দিন, মধুসূদনের যশের জের ; মাঝে একবার মোতিবালা দেশ থেকে আসিলেন, মাস দুয়েক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন।

বাপের বাড়ির জীবনে কিন্তু মস্ত বড় পরিবর্তন হইয়াছে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া থেকে ঃ জেঠামশাই অন্নদাচরণ মারা গেলেন, এবং এই একটি মানুষ যাইতেই বেলেতেজপুরের বাড়ির ভিৎ যেন আল্‌গা হইয়া গেল। সাতকড়ির কিছু দিন আগে শিবপুরে একটা জুটমিলে চাকরি হইয়াছিল, মৃত্যুর কিছুদিন পরে হরিচরণ এবং কিশোরও চলিয়া আসিলেন; চাকরির চেষ্টায়। দেশে রহিলেন শুধু দুই জা এবং রসিকলাল। সে-থাকার মধ্যেও একটা নিস্পৃহতা লাগিয়া রহিল। একটু কারণ ছিল,—ঘোষালমহাশয় পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন, অন্নদাচরণ যাইতে নিকুঞ্জলাল জো পাইয়া বসিলেন। তাঁহার আক্রোশের বহর এবং শক্তির পরিমাণ—দুইটারই আন্দাজ পাওয়া গেল অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধের দিন। কোথা দিয়া যে কি হইল, গ্রামে দুইটা দল হইয়া গেল এবং ভোজের প্রায় অর্ধেকটা অংশ বাগদিপাড়ায় বিতরণ করিয়া দিতে হইল ; রসিকলালের দুর্বল মনটা চিরকালই দাদার কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে এমনই ভাঙিয়া পড়িল, তাহার ওপর নিকুঞ্জলালের স্বরূপ প্রকাশে তাঁহার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, বেলেতেজপুরের মাটি আঁকড়াইয়া থাকা আর চলিবে না ; এমন কি, আঁকড়াইয়া ধরিবার মাটিটুকু পর্যন্ত আর দখলে থাকিবে কি না তাহাও সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জলালের স্ত্রী রায়মণি মারা গিয়াছেন, বোন দামিনী নিজের খুড়শ্বশুরের এক নাতনির সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহ দিবার মতলব আঁটিতেছেন। খুড়শ্বশুর বার দুয়েক সিংহবাহিনী দর্শনের নাম করিয়া এর মধ্যে দেখা দিয়া গিয়াছেন, একবার নাতনিটিকে লইয়া।....নিকুঞ্জলালের ভাবটা ঠিক বোঝা যাইতেছে না,—বাহিরে বাহিরে মালা, মামলা, আর ভগবান গীতায় কবে কি বলিয়াছেন তাহাই লইয়া থাকেন।

সাতকড়ি, হরিচরণ এবং শ্বশুরের হাতের চার-পাঁচখানা চিঠি হইতে সমস্ত খবরটা সংগ্রহ করা বিপিনবিহারীর। হরিচরণের লেখাটা খুব সরস—বিশেষ

করিয়া নিকুঞ্জলালের সম্পর্কে যে খবরগুলা দেন, খুব সরস করিয়াই দেন, যদিও কথাগুলা দুঃখেরই। জেঠামশাই অর্থাৎ অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধে দলাদলির অমন গুরুতর সংবাদটাও বেশ হাসির ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন। চিঠির শেষ পংক্তিটা ছিল—"নিকুঞ্জ-জেঠাকে নেমন্তন্ন করতেই হয়েছিল, কোন উপায় ছিল না তো ? কিন্তু তার দ্বারা আমাদের যে পাপটুকু হয়েছিল জেঠামশাইয়ের পুণ্যির জোরে সেটা সন্থ সন্থই কেটে গেল—নিকুঞ্জ-জেঠার দলের বামনদের জায়গায় পাড়ার বাগদিদের খাইয়ে।"

এতগুলা খবরের মধ্যে মাত্র সাতকড়ির শিবপুরে চাকরি হওয়ার খবরটা গিরিবালা পাইলেন। অন্নদাচরণের মৃত্যুর খবরটা দেওয়ার উপায় ছিল না ; গৃহস্থালী ভাঙনের মূলেও এই মহীরুহপাত, তাই হরিচরণের কথা পর্যন্ত বলিলেও, কিশোরের শিবপুর-প্রবাসের কথা বলা হইল না। বাপের বাড়ির এত-বড় দুর্যোগের যেটুকু ইতিহাস যে ভাবে পাইলেন তাহাতে গিরিবালা কতকটা উৎফুল্ল হইয়াই বলিলেন—"বড় চমৎকার হোল, না ? সাতকড়ির চাকরি হোল, জেঠামশাইয়ের বোঝাটা অনেক হালকা হোল, শেষ বয়সেও যে ভগবান একটু মুখ তুলে চাইলেন, এও তাঁর কত দয়া !"

খবরটা টের পাইলেন মাস-আষ্টেক পরে, তাঁহার পঞ্চম সন্তান পূর্ণেন্দু যখন দুই মাসের। শীত কাল, তাহাকে লইয়া রোদে বসিয়া আছেন, এমন সময় হরেন আসিয়া বলিল—"মা, একটু গোহুমের ময়দা দেবে ?...হ্যাঁ, দাও মা !"

নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেশে বলিয়া কথাগুলায় হিন্দির ছুট খুব বেশি। জিনিষ যা চায় অপরের জন্যই, সব সময় যে চাহিয়া লয় এমনও নয় ; গিরিবালা বলিলেন—"না, ময়দা নেই, যাঃ।"

হরেন আবদার ধরিয়া বসিল—"হ্যাঁ, দাও মা, লেই বানাব, গুড্ডি করব।"

গিরিবালা রাগিয়া বলিলেন—"ঘুড়ি করবি কাগজ কোথায় পেলি শুনি ? ওঁর টেবিল থেকে সরিয়েছিস্ তো ?"

হরেন বলিল—"না রদ্দি কাগৎ, বাবার টেবিলের নিচে পড়েছিল, এই দেখো বরং।"

ও-বাড়ি যাইবার রাস্তায় কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ময়দার লোভে আনিয়া হাজির করিল। আগা-গোড়া লেখা একটা বেশ বড় কাগজ। চিঠির কাগজ নয়, তবে হরেনকে কাছে ডাকিয়া দেখিলেন চিঠিই এবং হরিচরণের হাতের লেখা। কখনও হাতে পড়ে নাই এ চিঠি, একটা কৌতূহল হইল, বলিলেন—"দে তো দেখি।"

হরেন পিছাইয়া গেল, বলিল—"না, এ রদ্দি কাগৎ, আমার গুড্ডি হবে।"

ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং ময়দার লোভ দেখাইয়া গিরিবালা চিঠিটা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। অদ্ভুত চিঠি আর অদ্ভুত তার সব খবর!… 'মেয়ে সেদিন এসেছিল তার ঠাকুরদার সঙ্গে, চণ্ডীদিদির মেয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, দেখলুম…শুনছি নিকুঞ্জ-জেঠার পছন্দ হয়েচে…কিশোরের পড়া ছাড়াতে হোল…শ্রাদ্ধের ব্যাপার থেকে বাবা ভয় পেয়ে গেছেন…'

গিরিবালা দারুণ বিস্ময়ের সহিত পড়িয়া যাইতেছিলেন, শ্রাদ্ধের কথায় বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। আরও উৎকণ্ঠিত ভাবে পড়িয়া চলিলেন, পূর্বের ও পরের অনেক পত্রের মাঝখানে এই একখানা চিঠি, সংবাদের ল্যাজা-মুড়া, কোনটার বা মাঝের অংশটাই বাদ পড়িয়া যাইতেছে—কি এক গোলমেলে ব্যাপার। হরিচরণেরই লেখা, তবে ঐ বেলেতেজপুরেরই খবর না কি?—কোন্ দামিনী পিসিমা কোন্ নিকুঞ্জ-জেঠার জন্য ঘটকালি করিতেছেন? বাবার একলার সামলাইবার কথা কোথা থেকে আসিল?…হাত কাঁপিতেছে, মনটা যেন পাগলের মতো অক্ষরগুলার ওপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; হঠাৎ শেষের দিকে একটা লাইনের উপর আসিয়া আটকাইয়া গেল—'জেঠামশাইয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় নিকুঞ্জ-জেঠা যে কি করবে আবার! আর তো মোটে মাস কয়েক আছে…'

গিরিবালা যেন একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই, চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হরেন!"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া হরেন অনেকক্ষণই সরিয়া পড়িয়াছে! বিপিন-বিহারী অসময়ে এবং একটু ব্যস্ত হইয়াই প্রবেশ করিলেন, সোজা ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, গিরিবালার হাতে চিঠিটা দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একটু রাগিয়াই বলিলেন—"তুমি চিঠিটা কি করে পেলে? আমি ছুটে আসছি—ভুলে বোধ হয় বাইরে ফেলে গেছি ভেবে…" সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"সবটা পড়ে ফেলেছ না কি?"

গিরিবালা খুব বেশি কাঁদিতে পারিলেন না,—এমন অদ্ভুত ভাবে পাওয়া সংবাদটা আর প্রায় এক বৎসরের পুরান হইয়া এমন একটা অদ্ভুত আকার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তদুপরি চারিদিকে অদ্ভুত পরিবর্তনে এমন একটা জটিলতার মাঝখানে পড়িয়া গেছে যে মনটা হঠাৎ যেন অসাড় মারিয়া গেল। ঠিক যেন একটা নূতন জগতের সামনে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন—মনের উপর প্রভাব হইবে কি করিয়া?—বিশ্বাস করিয়া সংবাদটা মনে গ্রহণ করা শক্ত।

যে জলটা একটা পথ ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে পায় না, সেটা ধীরে ধীরে অনেকখানি মাটিকে ভিজাইয়া তোলে ; ভালো করিয়া কাঁদিবার সুযোগ হইল না বলিয়া জেঠামশাইয়ের জন্য শোকটা জীবনকে যেন খুব ব্যাপক ভাবে ছাইয়া রহিল।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একটা শুভ খবর আসিল, সাতকড়ির বিবাহ। কত দিন যাওয়া হয় নাই দেশে, আর কত দরকার যে যাওয়া একবার! কিন্তু কোলের শিশুটি মাত্র চার মাসের। গিরিবালার মনে পড়িল—বিরাজ-মোহিনীর সঙ্গে একবার ঠাট্টার তর্ক করিতে করিতে নিস্তারিণী দেবী তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, রাখবই তো বেঁধে—সোনার শেকল দিয়ে—একটি একটি করে শেকলের পাব্ আমার হাতে আসবে।"....গিরিবালা অভিমান করিয়া বলেন—"বাবা-জেঠাইমারাও আমায় ঠেলে দিয়েছেন, সব জেনে-শুনেও এই সময় বিয়ের ব্যবস্থা হোল,—আর দিন ছিল না ?....'গিরিকে নিশ্চয় নিয়ে আসবে।'—ব্যস্ চিঠিতে দু'অক্ষর লেখা হয়ে গেল, আর কি ? দায়ে খালাস হয়ে গেলেন।"

বলিলেন বটে কথাটা, কিন্তু যাইতে পারিলেন না বলিয়া মন যে খুব খারাপ হইয়া রহিল এমন নয়। একটু অভিমান হইল, স্মৃতি একটু সচেতন হইয়া উঠিল কিছুক্ষণের জন্য, তাহার পর আবার কাজের মধ্যে সব তলাইয়া গেল ;....মেয়েছেলের শ্বশুরবাড়ি তাহার বাপের বাড়িকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

সদ্য সদ্য অত ভাবিলেন না, কিন্তু পরে এক দিন কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর হইল। ছোট জা প্রভাবতী দেবী রৈয়াম থেকে আসিলেন ; যেদিন আসিলেন তাহার পরদিনই দেশ থেকে কিশোরের পত্র আসিল ; নূতন বৌদিদি পাইয়াছে, খুব আহ্লাদ করিয়া বিবাহের, বৌভাতের, কুটুমবাড়ির, নূতন বৌদির বর্ণনা দিয়া খুব দীর্ঘ একখানা পত্র দিয়াছে। তিন জনে বসিয়া বসিয়া পড়িলেন, প্রভাবতী দেবী বলিলেন—"তুমি গেলে না কেন দিদি ? প'ড়ে আমারই মন উলসে উঠছে—মনে হচ্ছে থাকতে পারলে দিব্যি হোত। আর তোমার তো বাপের বাড়িই।"

বিবাহের পত্র পাইয়া যতটা হোক না হোক, এখন বর্ণনা পড়িয়া সত্যই গিরিবালার মনটা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত জিনিষটা চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়াছে। জিনিষটা আশার আকারে, সম্ভাবনার আকারে যখন আসিয়াছিল, এরকম ছিল না, এখন অনুতাপের আকারে আসিয়া মনটা যেন মথিত করিয়া তুলিল ; অনুভব হইল—প্রথম ভাইয়ের বিবাহ—

বাড়িতে প্রথম বধূ আসার উৎসব, ঠিক এ-জিনিষটা আর আসিবে না বাড়িতে কখনও, তাঁহার জীবনে চিরতরেই বাদ পড়িয়া গেল। আরও একটা কথা মনে হইল এর আগে যা' কিছু ভাবিয়াছিলেন তা নিজের দিক্ দিয়াই, আজ হঠাৎ মনে হইল—আর এক জনের কথাও ভাবিবার আছে এর মধ্যে, সে সাতকড়ি—তাহার অভিমান জীবনে মিটিবে না।

জায়ের কথার উত্তর দিলেন—"যাওয়া কি সহজ বোন? একটা চার মাসের শিশু রয়েছে।"

"খুব শক্ত! চার মাসের শিশু গাড়িতে চাপাচুপি দিয়ে আর নিয়ে যাচ্ছে না যেন লোকে! না হয় আমিই এসে দেখতাম, ও তো আর মা চিনতে পারেনি এখনও, দুধ আছে এমন একটা মাগিকে বামনপাড়া বা কামারপাড়া থেকে ধরে আনলেই হোত—কিছু পয়সা দিয়ে।"

গিরিবালা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা হোত বটে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।" অবশ্য প্রভাবতী দেবীর জন্য আর অন্য কোন উত্তর ছিল না, তিনি এখনও সন্তানের মা হন নাই, তাঁর বলা চলে ও-কথা। যাওয়া চলিত, খোকাকে লইয়াই, কামারপাড়ার কোন মাগির দুধের ভরসায় ছাড়িয়া দিয়া নয়। তবু গেলেন না কেন?....

সেদিন রাত্রে ও-বাড়িতে খাওয়া ছিল। দুই বাড়ি লইয়া ছোট ভোজ। রান্নাঘরে বসিয়া সকলে আয়োজনে লাগিয়া ছিলেন, গল্প হইতেছিল, এমন সময় এ-বাড়িতে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

বড় জা বলিলেন—"বৌয়ের ছেলে উঠেছে।"

অভয়া বলিলেন—"খজনী আছে, ঠুকে-ঠাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে'খন।"

বাপের বাড়ির কথা লইয়া আজ গিরিবালার মনটা যেন অতিরিক্ত ছল-ছল করিতেছে, সব জিনিষের উপর মায়াটা বাড়িয়া গেছে; উঠিতেই যাইতেছিলেন, অভয়া দেবীর কথায় বসিয়া গেলেন; মনে স্নেহটা আজ বেশি তরল বলিয়া প্রকাশ করিতে যেন কুণ্ঠা বোধ হইতেছে। খোকার কান্নাটাও ওদিকে থামিয়া গেল।

মনটা কিন্তু ঐদিকে পড়িয়া রহিল। একটু পরেই আবার কান্না উঠিল—"নাঃ, দিলে বসতে তো?"—বলিয়া ময়দার হাত ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। একবার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় খজনী গাঢ়তর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, খোকার কান্নার সঙ্গে সমান তালে নাক ডাকিয়া যাইতেছে।

খোকা ভিতরে বাগ মানিল না বলিয়া গিরিবালা তাহাকে লইয়া বাহিরে

আনিয়া দাওয়ায় বসিলেন। স্তন্যপান করিয়া খোকা একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষ ; রাত বেশি হয় নাই, বোধ হয় আটটা হইতে ন'টার মধ্যে, কিন্তু কানের কাছেই এক গাঢ় নিদ্রার শব্দ ছাড়া কিছুই নাই বলিয়া মনে হইতেছে, যেন নিষুপ্ত হইয়া গেছে। চৈত্র মাস, নূতন গ্রীষ্মের একটা একটানা হাওয়া বহিয়া চলিয়াছে, চারি দিকে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মাথায় অসংখ্য নক্ষত্র—ছোট, বড়, পুঞ্জীভূত, একক—হাজারে হাজারে ঝিকমিক করিতেছে, অথচ অন্ধকার এতটুকুও কমে না। এই অনাহত অন্ধকার, ঐ আলোকপুঞ্জ, নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়া গিরিবালার বড় আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল, ঘুমন্ত শিশু-কোলে চুপ করিয়া সামনে বসিয়া রহিলেন অনেকক্ষণ।....ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেছে, ও বাড়িতে অভয়া বলিলেন—"বৌদি আসেন না যে, ডাকতে পাঠাব?" প্রভাবতী বলিলেন—"থাক্, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, ভাইয়ের চিঠি পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে আজ।"....এই আলোচনাই চলিল একটু একটু।

এমন একটা রাত্রির নিকষে এমনই উদাস দৃষ্টির সামনে কোথা থেকে পুরান স্মৃতির দাগ পড়ে। আজ সমস্ত দিনে সব চেয়ে যা বড় প্রশ্ন সেইটি লইয়া মনে তোলপাড় করিতে ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করিয়া এক একটি ঘটনা গিরিবালার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক এমনি আর কখনও হয় নাই—নিজেকে যেন আগাগোড়া দেখিতে পাইলেন একবার।....ও-প্রান্তে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে পুতুল-সন্তান লইয়া ব্যস্ত, আর আজ এ-প্রান্তে শিশুক্রোড়ে পাঁচটি সন্তানের জননী—মাঝখানে তারই কত বিচিত্র রূপ! গিরিবালা কিন্তু অনুভব করিলেন দুই-ই এক হইলেও পূর্বাপর যোগ নাই—সমস্ত শৈশবটা যেন আলাদা হইয়া গেছে জীবন থেকে—ঠিক কোন্ জায়গাটিতে ছেদ পড়িয়া, কোথায় কবে কেমন করিয়া, ধরা যায় না, তবে আজকের গিরিবালার সঙ্গে ছেলে-বেলার গিরিবালার যোগ নাই ; বেলেতেজপুর আর পাণ্ডুলের জীবন—দুইটা আলাদা হইয়া গেছে। মনে পড়িল প্রথম-প্রথম আসিয়া বেলেতেজপুরের জন্য সে কী অসহ্য ব্যাকুলতা! গ্রীষ্মের দুপুরে সবাই যখন ঘুমাইয়া, জানলার সামনে একটু ছিদ্র দিয়া বাহিরের উত্তপ্ত রোদের দিকে চাহিয়া আছেন—আজ যেমন অন্ধকারের গায়ে, সেদিন তেমনি ঝলমলে রোদের গায়ে বেলেতেজপুর ভাসিয়া উঠিয়াছে—বাপ, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা—মনে হয় ডানা থাকে তো উড়িয়া পলাই!....কোথায় গেল সে ব্যাকুলতা? কবে থেকে গেল? কত দিন পরে,

আজ এই প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের মাথায় বেলেতেজপুর এমন সবিস্তারে মনে পড়িয়াছে! সব মেয়েরই এই জীবনকাহিনী না কি? তাই নিশ্চয়, মা বাপের বাড়ি যাইতে না পারিলে প্রায়ই বলিতেন—"মেয়েদের বাপেরবাড়ি কুটুমবাড়ি মা,—কুটুমবাড়িরও বাড়া!"....আরও মনে পড়ে বাবার মুখে শোনা– পণ্ডিত-মশাই না কি বলিয়াছিলেন – "গৌরী চাইলে কি বাপেরবাড়ি ঘন-ঘন আসতে পারে না রসিক? চায় না তাই আসে না, বছরে বছরে একবার করে তেরাত্তির কাটাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে—একটা ঠাট বজায় রাখা কোন রকম করে।".... ঠিকই-তো, সব মেয়েই দুর্গার হাতে গড়া, ইচ্ছা করিয়াই ভোলে বাপের বাড়িকে।....সাতুর বিবাহ হইল—সাতুর—বাড়ির প্রথম ছেলের!—দিদি বলিতে অজ্ঞান হইত; গিরিবালা গেলেন না!

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল, চিন্তা একটু অন্য পথ ধরিল।—কেন হয় এমনটা? কে ভুলাইয়া দেয়?—ছোট জা তো বেশ আছে....

প্রশ্নটা আপনা আপনিই যেন উত্তর পাইয়া গেল। গিরিবালা একটু ঝুঁকিয়া ঘুমন্ত শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন,—এরাই—এরাই; এক একটি করিয়া আসে আর ওদিকে খানিকটা খানিকটা করিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করে; এদের লইয়া অনবরত চিন্তা করিতে করিতে আর কিছু মনে থাকে না—সুখের চিন্তাও আছে, আবার দুঃখের চিন্তাও আছে।....অদ্ভুত এরা,—এক সময়ের যে আদরের মেয়ে তাহাকে একবার মা করিয়া লইয়া একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লয়, কী যাদুই যে জানে!

এদের কেহ নাই বলিয়াই তো খজনী বাপেরবাড়ি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, জা প্রভাবতী বলিতে পারিল—"একটা ব্যবস্থা করে চলে গেলে না কেন?....গিরিবালা বুঝিলেন তাঁহারও না যাওয়ার মধ্যে কোথায় একটু লুকান আশঙ্কা ছিল—খোকার কষ্ট হইবে, অহি বড় দুর্বল—তাই হয়তো জন্মিয়া ওঁরা যে বাপেরবাড়ির সম্বন্ধটাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে সে-সম্বন্ধ লইয়া অত টান হয় নাই। জা প্রভাবতী এ রহস্য কি করিয়া বুঝিবে?

গিরিবালার বুকের কোথায় কি একটা হয়—আনন্দ কি বেদনা ঠাহর করিতে পারেন না। খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরেন; মনে মনে বলেন—এরা এমনি করে অনেক জিনিষই নেবে,—তা নিক্—নিক....

৭

পাণ্ডুলের কুঠির ইতিহাস এক জায়গায় খানিকটা দেওয়া হইয়াছে; আবার একটু দেওয়া প্রয়োজন, কেন না, ইতিহাসের ধারাটা আগের তুলনায় খানিকটা বদলাইয়া গেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে পাণ্ডুলের কুঠির শাসন ছিল একটু নরম সুরে বাঁধা—অবশ্য অন্য কুঠির তুলনায়। মধুসূদনের পর কৈলাসচন্দ্রের হাতে ভার পড়িলে, এই সুরটি যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য তিনিও খুব সচেষ্টই রহিলেন। ওদিকে সাহেব-মহলেও একটু পরিবর্তন হইয়াছে। মনিবরা নাই, এখন ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজারের হাতে কুঠি। সুনাম আর দুর্নাম একটা বিষয়েই দুই দিক্। রায়তের কাছে পাণ্ডুলের কুঠির যেটা ছিল সুনাম, কুঠিয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইটাই ছিল দুর্নামের কারণ। 'নেটিভ'দের কি প্রাপ্য, তাহাদের কি করিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে হয় সে-সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ছিল। একটা কথাই চলিয়া গিয়াছিল—'আগে লাৎ পিছে বাৎ'। পাণ্ডুল, এবং পাণ্ডুলের মতো আরও দু'-একটা কুঠি যাহারা 'নেটিভ'দের মানুষের সমশ্রেণী করিয়া লইয়া বাজার নষ্ট করিতেছে, ক্লাবে, পার্টিতে তাহাদের প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বিদ্রূপ শুনিতে হইত। মনিবেরা চলিয়া গেলে যখন ম্যানেজারদের শাসন আরম্ভ হইল, তখন বিদ্রূপটা বোধ হয় একটু বাড়িলই। সূর্যের অতটা তাত না থাক, তা বলিয়া বালিরও দাহিকা-শক্তি থাকিবে না—এ কেমন কথা!

কিন্তু একটা ট্র্যাডিশান চট করিয়া ভাঙা যায় না। পুরাতন পদ্ধতি ধরিয়া নূতন বাবুর আমলেও বেশ চলিয়া যাইতেছে, তাহা ভিন্ন সময়ও বদলাইয়াছে—সম-ব্যবসায়ীদের কথা বড়সাহেব গায়ে মাখিত না।

কিন্তু ছোটসাহেব অন্য প্রকৃতির। তাহার রক্ত উষ্ণতর, সে কুঠির শাসনের সুবর্ণ যুগটি ফিরাইয়া আনিতে চায়। তাহার নিজের সব থিয়োরি আছে—বাংলায় কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি কেন গেল, বিহারেই বা কেন যাইতে বসিয়াছে;—এর প্রতিবিধান সম্বন্ধেও তাহার থিয়োরি অনুরূপ, বড়কর্তার গা-এলানো ভাবটা তাহার পছন্দ হয় না। ছোকরা একটু মিন্‌মিনে গোছের; বড়সাহেবকে সোজাসুজি কিছু বলিতে পারে না, বা বলে না; কৈলাসচন্দ্রের উপর প্রতিপত্তি জমাইবার চেষ্টা করে। সুবিধা হয় না। কেন না এ-বালখিল্যকে আমল দিবার পাত্র তিনি নহেন। ভিতরে ভিতরে খিটিমিটি হয়, এবং একটু ঘোরালো হইলেই কথাটা বড়সাহেবের কানে পৌছায়। তিন-চারবার এই-রকম হইয়া গেল; বড়সাহেব একটু একান্তে ডাকিয়া

বলিল—"Leave it to the Babu Mr.…." (বাবুর হাতেই এসব ছেড়ে দাও)

তিন-চারবারই কথাটা এই ভাবে বড়সাহেবের কাছে গিয়া চাপা পড়িতে কৈলাসচন্দ্র বুঝিলেন, তাঁহারই জিৎ চলিতেছে; কিন্তু তবু ব্যাপারটা তাঁহার খুব প্রীতিপ্রদ হইল না। এক দিন বিপিনবিহারীকে বলিলেন—"গতিক তেমন সুবিধের নয় বিপিন, অবশ্য মনে হচ্ছে বড়সাহেব ছোটসাহেবকে নেহাৎ যদি দাবড়ানি না দিয়েও থাকে তো উৎসাহও দেয়নি—যেমন করে মুখটি চূণ করে থাকে; কিন্তু Blood is thicker than water,—আজ স্বার্থ আছে, আমার কথাই বজায় রেখেছে, কান ভাঙাতে ভাঙাতে এ-ভাবটা কত দিন স্থায়ী হবে বলতে পারি না। তা ভিন্ন এ-ব্যাটাই যে একদিন ঐ চেয়ারে বসবে না কে জানে?—চান্স তো তারই বেশি। তাই বলছিলাম সাবধান হওয়াই ভালো, অর্থাৎ বাইরেও একটু নজর রাখতে হবে এবার থেকে।"

বছর দু'য়েক গেল, তাহার মধ্যে বড়সাহেব আরও বার-দুয়েক ঐ Leave it to the Babu বলিয়াই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহার পর কৈলাসচন্দ্রের কথা ফলিল:

বামনটুলির পিছনে বিঘা-তিনেকের একটা চাকলা ছিল। জমিটা একটানা নয়, খানিকটা আঁকাবাঁকা; সে অংশটা গ্রামের ভিতরের পানে চলিয়া গেছে; বাকিটা—প্রায় বিঘা-খানিক হইবে—সামনের দিকে পড়ে এবং সেটা কুঠির জিরাত অর্থাৎ খাস-আবাদির পাশেই বলিয়া বহু দিন হইতে তাহাতে নীল চাষ হইয়া আসিতেছিল। একটি ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্পত্তি; পূর্বে নীলের যখন দর ছিল তখন কুঠি যাহা দিত তাহাতে ধানের মতো লাভ না থাক্, বিশেষ লোকসান ছিল না,—চলিয়া যাইতেছিল।

চলিয়া যাওয়ার মধ্যেও একটা ব্যাপার ছিল; মধুসূদনের সময়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের আমলেও বিধবা স্ত্রীলোকটি কয়েক বার বাড়িতে আসিয়া কর্ত্রীদের ধরে—ওটুকু জমি কুঠি হইতে ছাড়াইয়া তাহাকে ইচ্ছামতো ধান বা অন্য রকম ফসল তুলিতে দেওয়া হয় তো তাহার বিশেষ উপকার হয়। উপকার যে হয় এটা সবারই জানা; কিন্তু একটু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যে অংশটা গ্রামের ভিতরে চলিয়া গেছে সেটাও যে এই চাকলার সামিল সাহেবের এটা খেয়াল ছিল না। ঐ সামনের জমিটুক লইয়া কথা উঠাইতে গেলেই বাকি অংশটা—যেটা এত দিন আত্মগোপন করিয়া আছে সেটার কথাও উঠিবে নিশ্চয়। যেখানে কুঠির স্বার্থ সুপ্রকট, সেখানে সুবিচার সুনিশ্চিত নয়।

হয়তো সাহেব ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে এও সম্ভব যে, যদি আলোচনা প্রসঙ্গে বাকি অংশটুকুর সন্ধান পায় তো সেটাও গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। ঐটাই বড় অংশ—দুই বিঘা; সুতরাং এ-বিষয়ে আপাততঃ যেমন আছে সেইরূপ ব্যবস্থাই থাকিতে দেওয়া সমীচীন—এইরূপ পরামর্শ দিয়া মামা-ভাগনে উভয়েই স্ত্রীলোকটিকে নিরস্ত করিতেন; বুঝাইয়া দিতেন কুঠির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে এ-ও একটা সুবিধা,—আত্মীয়-স্বজনের উৎপীড়ন থেকে বাঁচিয়া আছে। স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাইত, আবার আত্মীয়-স্বজনেরাই পরামর্শ দিত, মাইজিদের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িত। এই করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

স্ত্রীলোকটির একটি পুত্র ছিল। মধুবাণী স্কুল হইতে এনট্রান্স দিয়া মোক্তারি পড়িতেছিল, বছর-দুয়েক হইল পাস করিয়া প্র্যাকটিস্ করিতেছে। সে এক দিন জমিটার জন্য কৈলাসচন্দ্রকে আসিয়া ধরিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান, নিজে হইতেই স্বীকার করিল যে, ইহারা দুই জনেই বুদ্ধি করিয়া এবং দয়াপরবশ হইয়া জমির বেশি ভাগই কুঠির কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও কথা তুলিতে গেলে আগে যে বিপদের ভয় ছিল সেটা আসিয়া পড়িতে পারে। তবে পূর্বের তুলনায় আইন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত—জেলায় দেওয়ানি কোর্ট আসিয়া গেছে, এমন কি মহকুমা মধুবাণীতে পর্যন্ত একজন মুন্সেফের চৌকি পড়িয়াছে। সাহেব যদি গা-জুরি করিতে চায়, সে আদালতের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে; মধুবাণীর কয়েক জন উকিল তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।....বেশ খোলাখুলি অথচ ধীরভাবে আলোচনা করিল যুবক।

ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের সহানুভূতি ছিলই বিধবাটির দিকে; এখন তাহার পুত্র উপযুক্ত, সে যদি ঝক্কিটা লইতে রাজি থাকে তো কৈলাসচন্দ্রের আর আপত্তি কি? বাড়িতে বুড়ি আসিয়া কান্নাকাটি করে, অন্ততঃ সেটুকু থেকে নিষ্কৃতি পান। বলিলেন, তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন, একটা দরখাস্ত দেওয়া হোক।

সাহেবের কাছে যখন দরখাস্তটা পেশ করিলেন, সেখানে ছোট-সাহেব ছিল। সব শুনিয়া একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বড়সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল—"Why must we reverse an arrangement that has been standing so long?—Just because her son has become a mukhtear? We cannot afford to be coward!" (বাঃ এত দিন যে

ব্যবস্থাটা চলছিল সেটা রদ করে দিতে হবে? কেন, ওর ছেলে মোক্তার হয়ে এসেছে বলে? আমাদের কাপুরুষ হলে চলবে না তো!)

বিপিনবিহারীও কি একটা কাজ হাতে করিয়া পূর্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখটা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু দুই সাহেবেরই পিছনে থাকায় তাহারা দেখিতে পাইল না।

সহকারীর কথায় বড়সাহেব কৈলাসচন্দ্রের পানে চাহিলেন। কৈলাসচন্দ্রেরও মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, খুব কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রথমে বিপিনবিহারীকে একটা কাজের ছুতা করিয়া সরাইয়া দিলেন, তাহার পর যুক্তির স্বরেই বলিলেন—"The factory has a prestige of its own. It won't be quite elegant if it were dragged to the court of justice" (কুঠির একটা সম্ভ্রম আছে, যদি তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যায় তো সেটা তার পক্ষে বেশ শোভন হবে না।)

ছোটসাহেব এবার কৈলাসচন্দ্রের দিকেই ফিরিয়া চাহিল, বলিল—"Personally I fail to see Babu how it affects our prestige so long as we fight for our rights, that's what a law court stands for." (ব্যক্তিগত ভাবে আমি তো বুঝতে পারি না যে যতক্ষণ ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছি ততক্ষণ মর্যাদাহানি কি করে হয়। কোর্টের তো কাজই এই।)

বড়সাহেব একটু যেন সমস্যায় পড়িয়া গেছে। মুখটা নিচু করিয়া একটা কলম দিয়া ব্লটিংকাগজ আঁচড়াইতে লাগিল। কৈলাসচন্দ্র একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ছোটসাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—" If you knew the history of the factory, you would not speak in this vein Mr.....Till recently she combined in herself the authority of a law-court also" (তুমি কুঠির ইতিহাস জানলে আর এ কথাটা বলতে না; সে দিন পর্যন্ত কুঠি আদালতের কাজ করে এসেছে।)

বুদ্ধির জয় হইল; কৈলাসচন্দ্র এমন জায়গাটিতে ঘা দিলেন যে, ছোটসাহেব তো চুপ করিয়া রহিলই, বড়সাহেবের মনটাও খানিকটা গর্বে, খানিকটা দুঃখে ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু মনটা কৈলাসচন্দ্রের কথায় সায় দিলেও ছোটসাহেবকেও বাঁচাইতে হইল; প্রশ্ন করিলেন—"But are you sure we have no case Babu?—Supposing we have to resort to law or are dragged into it?" (তুমি কি নিশ্চয় জানো, আমাদের

জেত্বার আশা নেই—ধরো যদি আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়, অথবা বাধ্য হয়েই যেতে হয় সেখানে।)

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—"I am absolutely sure sir." (আমি খুবই ঠিক জানি)

বড়সাহেব ব্লটিঙে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া আবার খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—"Best thing—let Mr.···· enquire and report." (সব চেয়ে ভাল হবে মিষ্টার···অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট দিন)

কৈলাসচন্দ্রের মুখটা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কি একটা বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বড়সাহেব হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"Well Babu, so much for the present; I would go and inspect the Jirat." (আপাততঃ এই পর্যন্তই থাক্, আমি একবার গিয়ে জিরাত পরিদর্শন করব।)

বাহির হইয়া গেলেন।

বিপিনবিহারী নিজেদের আফিস-ঘরের দুয়ারের কাছেই। কৈলাসচন্দ্র সাহেবের কামরা থেকে বাহির হইতে প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল, প্রশ্ন করিলেন—"সব শুনেছ বোধ হয়?"

"হ্যাঁ দাদা, ছোটসাহেবকে এনকোয়ারী করতে দিলে।"

"আমি তোমায় এক দিন বলেছিলাম—বাইরে নজর রাখতে হবে—এখানে আর বেশি দিন নয়। বুঝলে অন্যায় করছে, শুধু শাদা চামড়ার প্রেষ্টিজ রাখবার জন্যে এই হুকুমটা দিলে। দ্বারভাঙ্গার বাড়িটা ওরা বিক্রি করবে বলছিলে না? তুমি তো বলছিলেও নিয়ে নিতে। সামনের রবিবারে একবার চলে যাও, দরদস্তুর করো। মামার মর্যাদা যত দিন রাখতে পারব ততদিনই তাঁর চেয়ারে বসব; পাণ্ডুলের নীলকুঠির প্রেস্‌টিজ যে আসলে কার প্রেস্‌টিজ ওদের বুঝিয়ে দোব এক দিন।"

দ্বারভাঙ্গা-বাসের সেই গোড়াপত্তন হইল, পাণ্ডুলের শিকড় আলগা হইল।

কৈলাসচন্দ্রের দুই পুত্র দ্বারভাঙ্গায় একটি বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন। খবর পাওয়া গিয়াছিল বাড়ির মালিক বাড়িটি বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। বিপিনবিহারীর ইচ্ছা ছিল দাদা লন বাড়িটা, কিন্তু কৈলাসচন্দ্র

দোমনা হইয়াছিলেন এত দিন, এই ঘটনার পর মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়িটা কেনা হইয়া গেল।

এ দিকে বিপিনবিহারী নিজেও যে কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিত পারিতেছিলেন না। সাঁতরায় ছেলেদের রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার যে পরীক্ষাটা করিতেছিলেন সেটা চারি দিক্ দিয়াই বিফল হইবার মতো হইয়া আসিতেছিল। বড় ছেলের স্বাস্থ্য টিকিতেছে না, মেজটির ওপর একটু কড়া নজর রাখা দরকার, এখান থেকে সেটা অসম্ভব, ওখানে মা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চাকরি যদি এখানে যায়ই তো দেশে যাইয়া চাকরি করা পোষাইবে না, এই দিকেই অন্যত্র কোথাও খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে হইবে, পারতপক্ষে কোন নীল-কুঠিতেই। প্রতিপত্তির কেমন একটা নেশা যেন রক্তের মধ্যে আসিয়া গেছে দুই পুরুষের নীলকুঠি-জীবনে, অন্যত্র চাকরির কথা যেন ভাবাই যায় না! পাণ্ডুলে সম্পত্তিও আছে কিছু, তাহা ভিন্ন পাণ্ডুল যে হাতছাড়া হইবেই তাহারই বা স্থিরতা কি? এ সাহেব গিয়া ভালো সাহেবও তো আসিতে পারে আবার,—এমন তো কয়েক বারই হইল তাঁহার জীবনে। পাণ্ডুলের মাটির উপর একটা মায়াও জন্মিয়া গেছে,—ইচ্ছা করে কাছে-পিঠেই থাকি।

দ্বারভাঙ্গায় একটু সুবিধা হইল। কৈলাসচন্দ্রের বাড়ির পাশেই খানিকটা জায়গা পাওয়া গেল। সুযোগটুকু ছাড়িলেন না, বিপিনবিহারী জায়গাটি কিনিয়া রাখিলেন।

পাণ্ডুলের চাকরি পূর্ববৎই চলিল। বড়সাহেব লোকটা ধূর্ত। কুঠির বেশ সুদিন যাইতেছে না,—এমনই সময় পুরাতন এবং বিচক্ষণ কর্মচারীদের ক্ষুণ্ণ করা সমীচীন হইবে না, এটা তিনি ভালো রকমই জানিতেন। ও-হুকুমটা ছোট-সাহেবের মান রাখিবার জন্য ঐ ভাবে দিলেন বটে, তবে তাঁহারই ইঙ্গিতে ছোটসাহেব অনুসন্ধান করা আর রিপোর্ট দেওয়ায় গড়িমসি করিতে লাগিল। দিন কুড়ি অপেক্ষা করার পর বড়সাহেব অজ্ঞতার ভাণ করিয়া একদিন কৈলাসচন্দ্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোটসাহেব কি ও-বিষয়টা লইয়া অনুসন্ধান সুরু করিয়াছেন—তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?

কৈলাসচন্দ্র জানাইলেন যে, তখন পর্যন্ত করে নাই।

সাহেব যেন একটু বিরক্ত ভাবেই বলিলেন—"O, he will never find time to do it. Put up the file Babu, I will pass orders."

(ওর আর সময় হবে না ; তুমি ফাইলটা নিয়ে এসো বাবু ; আমি হুকুম দিয়ে দিই।)

ফাইলটা হাজির করা হইলে বৃদ্ধার জমিটা ফিরাইয়া দিবার হুকুম দিয়া দিলেন।

এবারেও জিত ; কিন্তু ঐ যে মাঝের অংশটুকু—ছোটসাহেবকে রিপোর্ট দিতে বলা—তাহার গ্লানিটুকু এঁরা ভুলিলেন না ; দুই ভাইয়ে সতর্কই রহিলেন।

৮

শশাঙ্কদের সাঁতরায় যাইবার প্রায় বছর দেড়েক পরের ঘটনা এটি। আরও মাস-ছয়েক গেল এবং ইহার মধ্যে শশাঙ্কর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। পেটের ব্যামো,—এ্যালোপ্যাথি এবং কবিরাজির পুরাতন চিকিৎসায় আর ফল পাওয়া গেল না, রসিকলাল বেলেতেজপুর থেকে একবার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। পেটটা ধরিল, কিন্তু দুর্বলতাটা যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

দুইটা বৎসর কাটিয়া গেছে, মা-বাপের মুখ দেখা নাই। বড় জায়গা, নিজের স্কুল-জীবন তো আছেই, এ ছাড়া পাঁচটা হুজুগও আছে—যাত্রা, অপেরা, কথকতা, গঙ্গায় বাচ-খেলা ; সমাজপতিত্ব লইয়া গোঁসাই লাহিড়ীদের দলাদলি সম্পর্কে আরও পাঁচটা হুজুগ,—অন্য সময় অতটা কষ্ট হয় না। তাহা ভিন্ন আগে যতটা হইত, এখন অভ্যাসের জন্যও ততটা হয় না। কিন্তু অসুখের সময় মা ভিন্ন কাহাকেও মনেই পড়ে না। অন্য সময় মায়ের মুখটা আবছায়া-আবছায়া হঠাৎ কখনও চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু অসুখের সময় সেই মুখ নিজের বেদনার মধ্য দিয়া বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অভিমান হয় ; নিস্তারিণী দেবী গায়ে হাত বুলান, শশাঙ্ক মুখ ফিরাইয়া চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকে, যে-আদর পাইতেছে তাহার মধ্যে তৃপ্তি পায় না। ঠাকুরমায়ের চেয়ে মাকে সাধারণ ভাবে যে বেশি ভালবাসে এমন নয়, তবে পাইবার উপায় নাই বলিয়া মনটা সেইখানে পড়িয়া থাকে।....এক এক সময় মুখ ঘুরাইয়াই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। নিস্তারিণী দেবী ব্যাকুল হইয়া পড়েন ; পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"আসুক, এসে নিয়েই যাক্‌, কি, যা-হয় একটা ব্যবস্থা করুক ; বুড়ো মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে। আমারও যে অদৃষ্টে কি আছে,—নিজে ঘাড় পেতে যে কেন নিতে গেলাম !"

শশাঙ্ক ফোঁপানোর মধ্যেই বলে –"আমি যাব না !"

একে নিরীহ প্রকৃতির, তায় রোগ-দুর্বল, অল্প কথাতেই অভিমান আসিয়া পড়ে।

শৈলেন একটু অন্য ধরণের। তাহারও অভিমান যে না হয় এমন নয়, তবে শরীরটা সুস্থ বলিয়া তাহার অবসরটা কম। তাহা ভিন্ন যখন হয় অবসর অভিমানের, তখন তাহার সঙ্গে এক ধরণের আক্রোশ মিশানো থাকে একটু। ওর মনটা একটু নাটকীয় সুরে বাঁধা বলিয়া কেমন করিয়া একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে উহাদের দুইভাইকে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছে। কাজটা খুবই অন্যায় হইয়াছে, তবে শৈলেনের তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই,—ও নিজের কল্পনা লইয়া বেশ এক রকম থাকে। মনে হয়, দাদার সঙ্গে রামচন্দ্রের বেশ সাদৃশ্য আছে—ঐ রকম ভালো মানুষ, দুর্বল; নিজে যেমন দয়া-পরবশ, তেমনই আবার দয়া জাগানও অপরের মনে;—ভাগ্যিস্ লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্ববান প্রভৃতি ছিল, নহিলে কী অবস্থাটাই যে হইত! দাদাও সেই রকম; ভালোমানুষ বলিয়া আসলে নির্বাসনটা দাদাকেই, শৈলেন যেন লক্ষ্মণ-ভাই হইয়া স্ব-ইচ্ছায় আসিয়াছে। ভাবিতে বেশ লাগে; একটু ভবঘুরে গোছের ধাতটা, পাঠশালার অতিরিক্ত সময়টা এখানে-ওখানে, পুকুরধারে, পোড়ো ভিটায়, আগাছার জঙ্গলে ঘুরিয়া মনের ভাবটিকে পুষ্ট করিয়া ফেরে। পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, এমন কি—গ্রামে হনুমানের যথেষ্ট উপদ্রব থাকায়—কিষ্কিন্ধ্যারও অভাব হয় না। দাদাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য বাবার ওপর যে অভিমানটা হয় তাহাতে এক ধরণের আক্রোশও মিশিয়া থাকে। এইখানে মূল রামায়ণের একটু রকমফের হয়,—শৈলেন এক একবার ভাবে এমন কিছু একটা ঘটিবে—কিছু একটা—যাহা রামায়ণেও কস্মিন্ কালে ঘটে নাই—যাহার জন্য বাবার আর আপশোষের শেষ থাকিবে না। বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশ দুই ভায়ের কাছে রামচন্দ্রের সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজয়ের কথাটা কল্পনার সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণের কাছে দশরথের পরাজয়ে রূপান্তরিত করিয়া বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। যদি কখনও আক্রোশের চেয়ে অভিমানের ভাগটা বেশি থাকে, তখন লক্ষ্মণের মৃত্যুতে দশরথের শাস্তির কথাই ভাবিতে ভালো লাগে। বাবা অনুতপ্ত হইয়া লইতে আসিয়াছেন দুই ভাইকে,—আসিয়া দেখেন শৈলেন নাই, হঠাৎ কি হইয়াছিল, যে দিন পৌঁছিলেন বাবা, তাহার আগের দিনই মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেছে। শৈলেন কল্পনাকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া কোনদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে—মনে একটি কথাই ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—বেশ হয়—বেশ হয়

তা'হলে—বেশ হয়....আসিয়া শৈলেনকে দেখিতে পাইতেছেন না, সবাই বলিতেছে—"দাদাকে বড্ড ভালবাসত বলে অভিমান করে চলে গেছে...."

চাহিয়া চাহিয়া মনটা গুমরিয়া উঠে,—বাবা আসিয়াছেন, শৈলেনকে ডাকিতেছেন—আওয়াজ পর্যন্ত যেন শুনিতে পায় শৈলেন।

মায়ের ওপর অভিমান হয় না, ঠিক যে-কারণে কৌশল্যা বা স্থমিত্রার উপর কোন অভিমান ছিল না লক্ষ্মণের। মায়ের জন্য কষ্টই হয়। মা এদেরই দলে, নিতান্ত অসহায়, এদেরই দুই ভাইয়ের মতো শক্তিমান বাবার অন্যায়ের লক্ষ্য। মনে পড়ে আসিবার সময় মায়ের মুখখানি—চোখে জল, জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শাম্পেনির মধ্যে থেকে শৈলেন দেখিতে লাগিল—অনেক দূর পর্যন্ত, তাহার পর শাম্পেনিটা হঠাৎ মোড় ঘুরিল।

মাহেশের রথের মেলা চলিয়াছে। শশাঙ্কের শরীরটা রসিকলালের ঔষধ খাইয়া এদানি ভালো আছে, কিন্তু তাহার যে এখানে থাকা চলিবে না এটা সবাই বুঝিয়া গেছে, বিপিনবিহারীকেও লেখাও হইয়াছে কয়েক বার। ভালো আছে; কিন্তু পাছে কোথাও যাইয়া কোন রকম অনাচার করে সেই জন্য তাহাকে চোখে চোখে রাখা হইয়াছে, বাড়ির বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় নাই।....রথের মেলায় আর কিছু নয়—পাঁচুর মায়ের পাঁপরভাজা আর ফুলুরি বিশেষ লোভনীয়। প্রথমটা শৈলেন রাজি হয় নাই, তাহারপর দাদার কাতরানির জন্য গোপনে কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়; আজ বিকাল থেকে দাদার পেটের ব্যথাটা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শৈলেন বসিয়াছিল দাদার কাছে ক্ষানিকক্ষণ, তাহার পর ঠাকুরমা আসিতে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ দাদার খাবার চাওয়ার কাতরানি অপেক্ষা দাদার পেটের যন্ত্রণার কাতরানি শোনা বেশি ক্লেশকর, তদুপরি ঠাকুরমা আসিয়া গেছেন, কাতরানির কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিবে। শৈলেনের মনটা খুবই বিষণ্ণ আজ। দাদার কষ্টের বৃদ্ধির জন্য বাবার উপর অভিমান আর আক্রোশটা খুবই বাড়িয়া গেছে। পাঁপড়-বেগুনি জোগাইয়া দিবার কথা ভুলিয়া ঐ দু'টি অনুভূতিকেই পুষ্ট করিয়া লইয়া অলস ভাবে পায়চারি করিতে করিতে, রেলের চরখির পাশে যে নিচু দেওয়ালটা আছে তাহার উপর আসিয়া শৈলেন বসিল। সন্ধ্যা হয়-হয়; আকাশে মেঘ থাকায় ছায়াটা আরও গাঢ় বোধ হইতেছে, মনের সঙ্গে আকাশের সুর তানে-লয়ে একেবারে যেন মিশিয়া গেছে। লক্ষ্মণের মৃত্যুর কথা আজ চক্ষু দুইটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া এমন একটা তৃপ্তি দিতেছে যে, শৈলেন খুব ফেনাইয়া ফেনাইয়া সেই চিন্তাটাকেই মনের কোণ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে।...বেশ হয়

যদি আজই মরিয়া যায় শৈলেন।....একটা গাড়ির সিগ্‌ন্যাল দিয়াছে—দূরে লাইনের বাঁকে ইঞ্জিনের মুখ দেখা গেল—হুস্-হুস্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে—বেশ হয় যদি হঠাৎ এমন কিছু হয় যে গাড়িটা লাইন ছাড়িয়া শৈলেনের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, ব্যস, খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে শৈলেন কোথায় গেল....ও স্বর্গে থেকে শুনিবে বাবা ওর নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছেন।...গাড়িটা আসিয়া পড়িল বলিয়া; শৈলেন দেওয়ালের মাথা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নিরাপদ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল—হুস্ হুস করিয়া গোটা কতক দ্রুত উগ্র শব্দ; হঠাৎ সেটা ভেদ করিয়া একটা টানা শব্দ উঠিল—কে ডাকিল—"শৈলে—ন!"

শৈলেন ইঞ্জিনটা যে দিক্ থেকে আসিতেছিল সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মনে হইল শব্দটা যেন পিছন দিক্ থেকে আসিল। সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"কে?"

যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তাহাকে ডাকিবার মতো কেহ নাই; ঘুরিয়া চারিদিকে দেখিল, কেহই নাই। শৈলেন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আর একবার হাঁকিল—"কে ডাকিলে?—কে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। সামনে চৌধুরীদের অপরিচ্ছন্ন বাগানটা,—লম্বা লম্বা কতকগুলা দেবদারু গাছ, তাহার পিছন দিকে মুকুজ্জেদের পোড়ো বাড়িটা। পোড়ো মানে ভাঙা-চোরা নয়,—একটা কি দোষ আছে, ভাড়াটে হয় না।

একটা হাওয়া উঠিয়া মেঘের উপর আর এক পরদা মেঘ আনিয়া ফেলিয়া সন্ধ্যাটাকে হঠাৎ আরও মলিন করিয়া ফেলিল। রাস্তায় লোক নাই বলিলেই হয়, খুব দূরে এক-আধ জন আসন্ন বর্ষার ভয়ে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে; শৈলেন যে কি করিবে যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। আকাশ-বাতাস, সেই অকারণ শব্দ, নির্জনতা, পোড়ো বাড়ি—সব মিলিয়া অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল যে মনে হইল, যে-মৃত্যুকে শৈলেন খুঁজিতেছিল সে যেন হঠাৎ বিকৃত মূর্তিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যায় না কিন্তু কি এক রকম অদ্ভুত ভাবে অনুভব করা যায়।...শরীরটা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। জোর হাওয়ায় বাগানটা আর পোড়ো বাড়িটা হঠাৎ শব্দমুখর হইয়া উঠিল—শৈলেনের আহত চৈতন্যে যেন মনে হইল—সামনে, পিছনে, চারিদিকেই চাপা হিস্-হিস্ শব্দ হইতেছে—শৈলেন!—শৈলেন! শৈলেন!—শৈলেন!!——শৈলেন!!....

বাড়ির দিকে পা বাড়ানো অসম্ভব—পোড়ো বাড়ি আর বাগানটা টানা ঐদিকেই চলিয়া গেছে। এদিকে হাত-পা ক্রমে অবশও হইয়া আসিতেছে। কি হইত বলা যায় না, তবে এই সময় দাশুর-মা'কে আকাশকে গাল পাড়িতে

পাড়িতে শৈলেনদের বাড়ির দিক্ থেকেই হন্-হন্ করিয়া আসিতে দেখা গেল। সে বাড়ি-বাড়ি গঙ্গাজল জোগায়, কাঁখে একটা ঘড়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"শৈল ঠাকুর যে গো,—অসময়ে এখানে?"

শৈলেন বলিল—"এই একটু ছিদামের দোকানে যাব, বাতাসা কিনতে।"

"তা এ দুর্জ্জোগে যাবে কেন? আমায় পয়সা দ্যাও, বাড়িতে দিয়ে এসব খ'নি।"

বিপদে শৈলেনের বুদ্ধি জোগাইয়া গিয়াছিল,—ছিদামের দোকানটা গঙ্গার ধারেই; সঙ্গে যাওয়া হইবে আবার সঙ্গেই ফিরিয়া আসা হইবে। দাশুর মায়ের প্রস্তাবে একটু থতমত খাইয়া গিয়া বলিল—"না, হরির-লুটের বাতাসা কি না, আমায়ই নিয়ে আসতে বলেছেন, একটু গঙ্গাজলের ছিটে মাথায়—দিয়ে।"

"তা চলো তবে।"—বলিয়া দাশুর-মা অগ্রসর হইল। দুই পা গিয়া বলিল—"ভট্‌চাযি্য বামুনের বাড়ি, তোমাদের সবই একটু বাড়াবাড়ি বাপু তা হক্ কথা বলব। আমি নে এসলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো!"

লোক পাইয়া শৈলেনের একটু ভূতের চর্চা করিবার ইচ্ছা হইল; কথাবার্তাও হইতে থাকে, তাহা ভিন্ন ভয়ের সম্ভাবনা না থাকায় ভয়ের কথা কহিতে লাগেও ভালো। শৈলেন প্রশ্ন করিল—" 'এখানে অসময়ে'—তুমি অমন কেন বললে দাশুর-মা?—অসময়টা কিসে হলো? ও-বাড়িটায় বুঝি রাত্তিরে যাঁদের নাম করতে নেই তাঁরা থাকেন?—আর সন্ধ্যে হলেই···"

"ওমা থাকেন না? সাঁতরায় একথা কে না জানে গো?"—বলিয়া দাশুর-মা কাহারা কবে ও বাড়িতে ভাড়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের কি অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার একটা দীর্ঘ ইতিহাস দিয়া গেল।

শৈলেন দাশুর-মার গায়ের কাছে খুব ঘেঁসিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিতেছিল, ওদিকে পাড়ার মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে, সব শুনিয়া বলিল—"একটা কথা বলব দাশুর-মা—দোষ হবে না তো?"

"কি কথা? গঙ্গাতীরে আবার দোষ কি?"

"আমায় কে যেন ডাকলে এখানটায়, ঐ বাড়ি থেকে।"

দাশুর-মা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল—"সব্বরক্ষে! উত্তুর দ্যাওনি তো?"

"হুঁঃ, আমি উত্তুর দেবার ছেলে কি না! জানি না নাকি যে তিন বার না ডাকলে উত্তর দিতে নেই?"

"ভাগ্যিস্ !—দিলে আর দেখতে হোতনি।"

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল বাবা আসিয়াছেন। শশাঙ্কর শয্যার পাশে বসিয়া ঠাকুরমা, মনোমোহিনী পিসিমা, খেতন দাদা প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করিতেছেন, দাদাও অনেকটা সুস্থ, বোধ হয় বাবাকে পাইয়াই। বিপিনবিহারী শৈলেনকে কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"পেয়েছিলি শুনতে?—তোকে চরখির কাছে যে ডাকলাম গাড়ি থেকে।"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—পাইয়াছিল; তাহার পর কত পুরানো কথার সঙ্গে সদ্য অর্জিত অভিজ্ঞতা মিশিয়া তাহার বুকটা আলোড়িত করিয়া দিল,—"মার কাছে যাব আমি"—বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবা যে-কটা দিন রহিলেন কী আনন্দেই যে কাটিল বলিয়া শেষ করা যায় না। দুই বৎসরের যত অপূর্ণ সাধ প্রাণ ভরিয়া মিটাইল—খাওয়া-পরা সব দিক্ দিয়াই; বরং এমন অনেক কিছু হাতে আসিল যাহার সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। শুধু একটা সাধ মিটানো হইয়া উঠিল না। চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহার আলোচনাটা বহু দিন ধরিয়া পরিবারে চালু ছিল বলিয়া এখনও মনে আছে শৈলেনের :

স্টেশনে যাইবার দুইটা পথ ছিল; একটা পথ দুই দিকে গোঁসাইদের বাড়ি রাখিয়া গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের অলস অভিযানে যখন শৈলেনের স্টেশনে যাইবার ইচ্ছা হইত, এই পথ দিয়াই যাইত। জমিদার গোঁসাইদের বড় বড় অট্টালিকাগুলার মধ্যে অসীম বিস্ময় ছিল, বিশেষ করিয়া দুপুরে সেগুলা যখন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত। বাঁ দিকে বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইত গঙ্গা,—জাহাজে, নৌকায়, ওপারের লাট-সাহেবের বাগানে, আর জোয়ার-ভাঁটার হ্রাস-বৃদ্ধিতে নিত্য নূতন; এই পথটাই ভালো লাগিত। কিন্তু এই পথে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সম্পূর্ণ এক অন্য জিনিষ। রাস্তাটা যেখানে ঘুরিয়া খালের উঁচু পুলটা পার হইয়াছে সেইখানে একটু ভিতরে গিয়া ডান দিকে একটা দোকান। খোলার চালের নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন দোকান ধুঁয়ায় ভিতরকার চাল, দেওয়াল সব অন্ধকার; সেই অন্ধকারে মাঝখানটিতে অয়েলক্লথ-বিছানো টেবিলের উপর কতকগুলি আর আর দ্রব্যের মধ্যে একটি এনামেলের থালায় থাকিত আস্ত ডিমের কি এক অদ্ভুত "মেওয়া"। টক্‌টকে লঙ্কার টুকরার সঙ্গে খুব গাঢ় উবড়া-থাবড়া কি এক রকম মসলা লাগানো।

এদের। নধর কান্তি আর সোনার রঙে সমস্ত দোকানটা যেন আলো করিয়া আছে। কি যে ছিল ওগুলার মধ্যে—এত জিনিষের মধ্যে কোনটাই শৈলেনের কল্পনাকে অমন করিয়া উদ্রিক্ত করিতে পারিত না। বিধবার বাড়ি, ডিম আসিত না বলিয়া ডিমটাই একটা অমূল্য সম্পদ্ ছিল, তাহার উপর আবার ঐ রূপ; অনাচারের ভয়ে দুই ভাইয়ের কাহারও হাতেই পয়সা দিতেন না ঠাকুরমা! যদি-বা কোন রকমে দু'-একটা পয়সা আসিল তো ও-ধরণের অসম্ভব রকম মূল্যবান্ জিনিষের কাছে ঘেঁসিতে সাহস হইত না। আরও না ঘেঁসিবার কারণ ছিল,—দোকানদারের চেহারা এবং তাহার খদ্দেরের চেহারা। কেমন যেন অদ্ভুত গোছের। ছিদাম ময়রা বা সহদেব মুদির দোকানের সামনে যেমন স্বচ্ছন্দে গিয়ে দাঁড়ানো যায় এ যেন সে রকম নয়,—লোভের পাশে পাশে গা'টাও ছমছম করে। কিন্তু সে অসম্ভব লোভ,—এদিক্ দিয়া যাইলেই পুলের রেলিঙে ঠেস দিয়া শৈলেন সতৃষ্ণ নয়নে সেই হলদে-হলদে ডিমের স্তূপের পানে চাহিয়া থাকিত।···কী অপরূপই না স্বাদ হইবে! ভাঙিলে ভিতর থেকে যে সোনার গুঁড়ার মতো বাহির হয়, এ-ডিম ভাঙিলে কি সেই রকমই বাহির হইবে, না, অপূর্ব আরও কিছু? রীডারে যে—'গুজ্ অ্যাণ্ড দি গোল্ডেন এগ্'-এর কাহিনী পড়িয়াছে, সে কি এই ধরণের কিছু একটা, না, আরও অদ্ভুত? তাই যদি হয় তো কল্পনা সেখানে পৌঁছুতে পারে না।···· লোকেরা আসে, বসে, কেনে, খায়,—শৈলেনের মনে হয় যেন কল্প-লোকের জীব সবাই। পকেটে পয়সা থাকিলে এক একবার লুব্ধ আবেগে মুঠাইয়া ধরে, পা বাড়াইতে ইচ্ছা হয়, তাহার পর সাহস ভাঙিয়া পড়ে। কম বয়সের ছেলেও যে একটা নাই,—যেমন ছিদামের দোকানে থাকে।····কত রকম কি ভাবিয়া, কত বার পা উঠাইয়া এক সময় খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়···· প্রায় দুই বৎসর এই করিয়া চলিতেছে।

আসিয়া অবধি বিপিনবিহারীর আদরটা যেন শৈলেনকে ঘিরিয়াই বেশি; শশাঙ্কর উপরও আছে, তবে শৈলেনকে জিজ্ঞাসাবাদ বেশি; সে যাহা চাহিতেছে তাহার এক-আধটা শশাঙ্কর জন্য আসিতেছে, এক একটি জিনিষের বোধ হয় বাদ পড়িয়াও যাইতেছে শশাঙ্কর ভাগ্যে। খাওয়ার জিনিষের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই,····শশাঙ্কর পেটই খারাপ। দাদার উপর একটু দয়া হইতেছিল, তবে লাগিতেছিল মন্দ নয়—যাই হোক, স্নেহেরও তো একটা বিজয়দর্প আছে,····আমায়ই বাবা বেশি ভালবাসেন!

পরে কারণটা জানিয়াছিল ; শৈলেনকে অবশ্য বলিয়াছিলেন দুইজনেই যাইবে পাণ্ডুল, কিন্তু লইতে আসিয়াছেন শুধু শশাঙ্ককে।

চার-পাঁচ দিন পরে বলিলেন—"কেমন শৈলেন, সব তো হোল, ছবির বই, জামা, জুতো, মার্বেল, লাট্টু,—আর কিছু চাই না কি ? এই বেলা বলো।"

পাণ্ডুলে বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারি, এত সাধিয়া প্রশ্ন করা তো অসম্ভবই তাঁহার পক্ষে, আবদার করিয়া উত্তর দেওয়াও শৈলেনের সাহসে কুলাইত না। এখানে বহু দিন পরে ছেলেদের দেখিয়া বাবাও অন্য রকম হইয়া গেছেন, শৈলেনেরও বিদেশে কেমন একটা মুক্ত ভাব—যে-কথাগুলা মায়ের মধ্যস্থতা ভিন্ন হইতে পারিত না, এখন বেশ বাবাকে অনায়াসে বলা যাইতেছে।....মায়ের অভাবে বোধ হয় ছেলেরা বাপের মধ্যে মা আর বাপ উভয়কেই পায়।

শৈলেন বলিল—"একটা জিনিষ খাবো বাবা।"

মনোমোহিনী দেবী আর নিস্তারিণী দেবী কাছেই ছিলেন, দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"ও পেট-সর্বস্ব দামোদর,—ওর আবার জামা, বই !..."

বিপিনবিহারী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"জিনিষটা কি শুনি ?"

সে-সময় আর কোন মতেই বলিতে পারিল না শৈলেন। লজ্জিত হইয়া প্রথম সুযোগেই কোথায় গা ঢাকা দিল।

বিকাল বেলা বিপিনবিহারী একা শৈলেনকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছিদামের দোকানের কাছাকাছি গিয়া, পিঠে হাত দিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি খেতে চাইছিলি রে শৈলেন ? বল্, লজ্জা কি ? —খাওয়ায় লজ্জা মেয়েছেলেরা করে, বেটাছেলে খুব খাবে, খুব হজম করবে, খুব হুটোপাটি করবে—তবে তো। তোদের বয়সে আমি খুব খেতুম, তাই তো আর একটু যখন বড় হয়েছি, গঙ্গা পেরিয়ে গেছি, না বিশ্বাস হয় ছিদাম ময়রাকে জিগ্যেস্ করবি চল্। একবার জাহাজের মুখে পড়ে কি রকম বেঁচে গিয়েছিলাম—সে গল্প বলব আজ তোকে। খাবি, তার আবার লজ্জা !....ছিদামের দোকানের কিছু ?"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

"তবে ?"

"গোঁসাইপাড়ার রাস্তায়।"

বাপবেটায় গোঁসাইপাড়ার রাস্তা দিয়া চলিলেন। পাড়ায় ঢুকিতেই একটা

বেশ বড় দোকান, বিপিনবিহারী কাছে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, শৈলেন আস্তে আস্তে বলিল—"এ দোকানে নয় বাবা।"

এই দোকান হইতেই গোঁসাই-জমিদারদের দেউড়িতে খাবারটাবার যাইত বলিয়া মনে পড়ে বিপিনবিহারীর। তাহা হইলে আরও ভালো দোকান হইয়াছে না কি ইদানীং ?

প্রশ্ন করিলেন—"এ দোকানে নেই সে জিনিষ ?"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

কৌতূহল হইল,—ছেলের উঁচু-নজর দেখিয়া মনে মনে প্রীতও হইলেন। রাস্তার মোড় ফিরিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে পুলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নিচু করিল। বিপিনবিহারী একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"এখানে দাঁড়ালি যে ?"

শৈলেন দোকানের পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা যেখান থেকে খালের পাশে-পাশে নামিয়া গিয়াছে সেইখানে গিয়া আবার মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাস্তার ওপারে গঙ্গার ধারে সুরকির কল, এদিকে খালের ধারে নোংরা বস্তির মতো খানিকটা,—এমন তো কোন দোকানই চোখে পড়ে না যাহার জন্য সাঁতরা থেকে এই মাইল খানেকের ওপর পথ হাঁটিয়া আসা চলে। বিপিনবিহারী বলিলেন—"কৈ শৈলেন, এখানে তো কোন ময়রার দোকানই···"

চোখের সামনে ডিমের গুষ্টী অত বাহার করিয়া থাকিতেও যখন বাবার নজরে পড়িতেছে না, তখন কিছু একটা গলদ আছে বলিয়া সন্দেহ হইল শৈলেনের, চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একেবারে থার্ড ক্লাস পল্লী, বিপিনবিহারীর গা ঘিন-ঘিন করিতেছিল, একটু বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি যেন একটু আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ঐ ডিমের কথা বলছ না তো শৈলেন ?"

শৈলেনের মধ্যে তখন আর শৈলেন নাই, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

বিপিনবিহারী শুধু বলিলেন—"বাড়ি চলো, ছিঃ !"

রাস্তায় একটি কথাও হইল না ; শৈলেন যেন একটা কলের পুতুল, কে দম দিয়া দিয়াছে—খট্-খট্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়াছে।

পরে কথাটা যত পুরানো হইতেছিল সেটা লইয়া ততই হাসি হইত। বিপিনবিহারীই শাখাপ্রশাখা-যোগে বর্ণনা করিতেন,—টের পাইয়াছিলেন ওটা আর কিছুই নয় ; শিশুর নির্দোষ রসনাবিকার মাত্র। সেদিন কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থাটা অন্য রকম ছিল। শৈলেন সেটা টের পায় মনোমোহিনী পিসিমার

মুখে। রাত হইয়া গেছে, বাবা, খেতন-দাদা বাহিরে গেছেন, পিসিমা শৈলেনকে ছাদে লইয়া গিয়া গলা নামাইয়া বলিলেন— হ্যাঁ রে শৈল, তুই সুরকির কলের সামনে চাটের দোকানে ঐ সব খেতে যাস না কি? ছি-ছি; —ওসব দোকানে কলের মজুররা নেশা করে যা'-তা' খায়। ওদের সঙ্গে মিশিস না তো তুই? আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর দিকিনি....দাদাকে নিয়ে সেইখানে টেনে তুলেছে গা! কী হবে, কী ঘেন্নার কথা।....

বাবার সঙ্গে এক দিন দুই ভাইয়ে বেলেতেজপুর বেড়াইয়া আসিল। এক দিন গেল শিবপুরে। আদরের যেন একটা মরশুম পড়িয়া গেছে। কয় দিন ধরিয়া বাবার আদর নানা দ্রব্যসম্ভারে যেন মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। মামার বাড়ির আদরটা পাওয়া গেল আবার দুই জায়গায় ভাগ করিয়া। এর পরে সামনে রহিয়াছে পাণ্ডুল। এত পাওয়ার মধ্য দিয়া দিনগুলা হইয়া পড়িয়াছে যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের দিন; এমন অদ্ভুত সব ব্যাপারও ঘটে জীবনে—এত অল্প দিনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া।

এই আনন্দ-বিস্ময়ের মাঝখানেই আসিয়া পড়িল মোহভঙ্গ—একেবারে যেন ঝুপ করিয়া। বৈকালে গাড়ি, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শৈলেন জানিতে পারিল তাহার যাওয়া হইবে না। বাবা অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, তাহারও যাওয়ার কথা ছিল, তবে মহাদেব মাষ্টার জোর করিয়া বলিলেন এ ক'টা দিন থাকিয়া যাইতে, পরীক্ষার পর একেবারে নূতন ক্লাসে উঠিয়া যাইবে। আর কুল্যে দুই মাস, দুই মাস পরেই বিপিনবিহারী নিজে আসিয়া লইয়া যাইবেন। আরও যাহা যাহা ইচ্ছা কিনিবার জন্য দুইটা টাকা দিলেন, যতক্ষণ রহিলেন অনেক বুঝাইলেন। শৈলেন মুখ ভার করিয়া রহিল। যাহা এত সত্য ছিল আশ্রয়-আহ্লাদে, তাহা হঠাৎ এত মিথ্যা কি করিয়া হইয়া গেল তাহার যেন বোধগম্যই হইতেছে না; কি ক্ষতি হইতেছে যেন বুঝিতেই পারিতেছে না। তাহার পর জামা-জুতা পরিয়া বইয়ের পুঁটুলি হাতে শশাঙ্ক যখন সবাইকে প্রণাম করিয়া বাবার পিছনে পিছনে উঠানে নামিল, সে পিসিমার কোল থেকে একেবারে আছাড় খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও মাগো, আমি একলা থাকতে পারব না, দাদাকে রেখে যেতে বলো!...."

৯

দাদা চলিয়া যাইতে সাঁতরা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। দাদা যে নিত্যসঙ্গী ছিল এমন নয়, তাই যত দিন ছিল, তত দিন অত বুঝা যায় নাই। যখন পাণ্ডুলে চলিয়া গেল তখন অভাবটা বুঝা গেল। শৈলেনের এমনই বাড়িতে মন বসিত না, আরও যেন কোন আকর্ষণ রহিল না। দাদার চলিয়া যাওয়া, তাহার না যাওয়া, বাবার এই ব্যবহার—এই চিন্তা লইয়াই সারা দুপুর টং-টং করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার হইয়া উঠিল বিলাস। পাঠশালা কামাই হইতে লাগিল, গুরুমশাইয়ের নিকট মার খাইতে লাগিল,—জীবনটা হইয়া উঠিল যেন ছন্নছাড়া।

অভিমানে পিতার উপর মনটা বিদ্রোহ হইয়া উঠিল,....আর কখনও তাঁহার কাছে কিছু চাহিবে না, তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাও স্পর্শ করিবে না,—কেন প্রবঞ্চনা করিয়া তিনি রাখিয়া গেলেন?...আশ্চর্য, এই মনের ভাবটা গিয়া এক দিন দাদার উপরও পড়িল,—যখন কয়েক দিন পরে দাদার বিচ্ছেদটা সহনীয় হইয়া আসিল। এটা বোধ হয় এক ধরণের ঈর্ষাই ; কিন্তু শৈলেন মনকে বুঝাইল দাদাও এই চক্রান্তের মধ্যে ছিল, নিজে সব জানিত অথচ শৈলেনকে বলে নাই। বলিলে শৈলেন পলাইয়া গাড়ির এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত তো?....ঠাকুরমা, পিসিমা, খেতনদাদা—সবাই এই চক্রান্তের মধ্যে, শৈলেন সব থেকেই যেন আলাদা হইয়া দাঁড়াইল, সবাইকেই চিনিয়াছে সে!

ক্রমে একে একে আর সবাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়া সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল শুধু মায়ের মুখখানি। যেমন দীপ্ত তেমনি বিষণ্ণ সে মুখ, সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া মাত্র ঐ একটি মুখে শৈলেন নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। সংসারের যত অন্যায় মায়ের উপর, আর শৈলেনের মতোই তিনি অসহায় ভাবে সহিয়া যাইতেছেন। বাবা ছেলেদের লইয়া আসিলেন—হয়তো মাকে এই রকম মিথ্যা দিয়া ভুলাইয়াই—মা শুধু বদ্ধ ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন—চোখ দুইটি এখনও যেন দেখা যায়—এ শক্তি নাই যে দুই পা বাহিরে আসিয়া নিজের ছেলেদের ফিরাইয়া লইয়া যান।....বাবা ফিরিয়া গেছেন, মা জিজ্ঞাসা করিবেন শৈলেনের কথা—দুই ভাই যে একসঙ্গে আসিয়াছিল,—বাবা এই রকমই একটা মিথ্যা বলিয়া আবার তাঁহাকে ভুলাইয়া দিবেন। মা আবার তেমনি অসহায় ভাবে কোন একটি জানালার গরাদ ধরিয়া সজল চক্ষে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিবেন। কোন সময় হয়তো ভাবিলেন শৈলেন নাই বলিয়াই

আনা হইল না, নহিলে এক ভাই আসিল, এক ভাইয়ের আবার কি হইল?—সেই তো ছোট, তাহারই তো মায়ের জন্য বেশি মন-কেমন করিবার কথা—আগে আসিবার কথা।

কোন একটা দিকে চাহিয়া চাহিয়া শৈলেনের মনটা ভরিয়া ওঠে—মায়ের দুঃখে কি নিজের দুঃখে বুঝিতে পারে না। মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া ওঠে, কিছু একটা করিতে, কিছু একটা হইতে ইচ্ছা করে। কী সে করিতে চায় ভাবে শৈলেন: ধরো, একটা তার করিয়া দেওয়া হইল—শৈলেন মৃত্যুশয্যায়। কিম্বা খেতন-দাদার হাতে-পায়ে ধরিয়া লইয়া যাইতে বলিলে কেমন হয়?....চিন্তাটা খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কল্পনাতেই নানা রকম ভাঙ্গা-গড়া করিয়া মনটা চঞ্চলও হইয়া ওঠে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন একটা মীমাংসাই হইয়া ওঠে না।

এক দিন হঠাৎ মনে হইল, ঠাকুরদাদা তো সতের বৎসর বয়সে পাণ্ডুলে পলাইয়া গিয়াছিলেন—এই বাড়ি হইতেই। সতের বৎসরের বয়সটা ঠিক কি প্রকারের জিনিষ অতটা ভাবিয়া দেখিতে পারে না, দরকারও হয় না দেখিতে,—তাহার কৈশোরের শিরা-উপশিরায় পিতামহের রক্তের উচ্ছ্বাস জাগে। আর সতের বৎসর বয়সটা যেমন বড়, তেমনি ঠাকুরদাদা গিয়াছিলেন পায়ে হাঁটিয়া; শৈলেন যেমন ছোট তেমনি রেলের সুবিধা আজ-কাল,—একই কথা দাঁড়ায় না?—শুভঙ্করী আসিয়া যেন শৈলেনের হাত ধরেন।

দু'-চার দিনের মধ্যেই বাধা-বিঘ্নের ভয় সব কাটিয়া গিয়া সঙ্কল্পটা দৃঢ় হইয়া গেল। পাণ্ডুলে পলাইতে হইবে; ঠাকুরদাদা এক দিন যে-কাজ করিয়াছিলেন, নাতির চোখে সেটা অন্যায়ও ঠেকিল না, অসম্ভবও ঠেকিল না।

এক দিন দুপুরে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন, খেতন-দাদা অফিসে, শৈলেন বাবার দেওয়া নূতন জামা আর জুতা-জোড়াটা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। টাকা দু'টো তখনও নিজের কাছেই ছিল, পকেটে ফেলিয়া লইল। ওঁরা যেদিন যান, সেদিন কান্না বন্ধ করিবার জন্য ঠাকুরমা আর মনোমোহিনী পিসিমার কাছে একটা করিয়া চার-আনি পাইয়াছিল, সে দু'টাও রহিল। প্রথমটা একটু পায়ের জড়তা বোধ হইল, তাহার পর সদর রাস্তায় উঠিতে সেটা বেশ কাটিয়া গেল। পথের কথাটা আর চিন্তার মধ্যেই আসিল না;—পরশু এ-সময় সে যে পাণ্ডুলে এরই বিস্ময়ের আনন্দটা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল;—সাঁতরা বাড়ি থেকে দূরত্বটা যতই বাড়িয়া যায় ততই যেন সে নিশ্চিন্ত হয়। স্টেশনের দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ি যাইতেছিল, শৈলেন তাহার পিছনের

তক্তাটাতে গিয়া বসিয়া পড়িল। এ-ব্যাপারটাতে সে বেশ অভ্যস্ত,—তক্তাটায় বুক চাপিয়া পা ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া যায়, কোচম্যানকে যদি কেহ জানাইয়া দেয়, গাড়ির ছাদের উপর শপাৎ করিয়া ছিপটির দড়ি আসিয়া পড়ে, কখনও কাঁধে-মাথায় আসিয়া লাগে, কখনও কোচম্যান লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়, শৈলেন টুপ করিয়া নামিয়া পড়ে। আজ কেমন একটু গুছাইয়া বসিতে ইচ্ছা হইল ; নূতন জামা, নূতন জুতা পরিয়াছে, তক্তার উপর উঠিয়া গাড়ির দেওয়ালে পিঠ দিয়া রাস্তার দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া বসিল শৈলেন। যখন বেশ অন্যমনস্ক হইয়া গেছে, শপাৎ করিয়া কোচম্যানের ছিপটি হাতের উপর আসিয়া পড়িল। শৈলেন সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া পড়িল এবং উল্টা লাফানোর জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। যখন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোচম্যানটা চলতি গাড়ির উপর দুলিয়া-দুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে আবার আসিয়া বসিতে আহ্বান করিতেছে।

চোট লাগিয়াছে। ডান হাতের কনুই এবং ডান কানের উপরটা ছড়িয়া গেছে, বাঁ হাতে ছিপটির রাঙা দাগ। রাস্তার এক দিকে রেল-লাইন, এক দিকে নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের খোলার বাড়ি। কোনখানে হাসি উঠিল, কেহ সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করিল—আঘাত লাগিয়াছে কি না। শৈলেন অপ্রতিভ ভাবটা চাপিয়া অগ্রসর হইল ; কেমন যেন একটা কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে।

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া তাহার যেন দিশাহারা লাগিয়া গেল। ...বেশ বড় স্টেশন, গলি-ঘুঁচি অনেক। কোথায় টিকিট পাওয়া যায়? ছোটোদের কিনিতে দেয় কি? কয় টাকা লাগিবে টিকিটে? দুইটাকাই যদি লাগে তাহা হইলে খাইবে কি? আর যদি দুই টাকায় না কুলায়? আর একটা কথাও এতক্ষণে মনে পড়িল,—একটা ছোট ছেলে টিকিট কিনিতেছে দেখিয়া কেহ যদি সন্দেহ করে—পলাইতেছে!

স্টেশনের যেখান দিয়া ঘোড়ার গাড়িগুলা প্রবেশ করে, সেইখানটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একটা লোক স্টেশনের দিক্ থেকে তাহার দিকে আসিল। কাঁচা-পাকা মোটা গোঁফ উপর দিকে ঠেলা, চোখ দুইটা একটু রক্তাভ, বেশ সণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা, গায়ে একটা নীল রঙের জামা। শৈলেনকে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চাঁহি তোমার খোঁখাবাবু?"

ওর উগ্রতায় সম্মোহিত হইয়া গিয়া শৈলেন মুখের পানে চাহিয়া রহিল। লোকটা আবার বলিল—"কি চাঁহি বোলো না, ডর কি আছে?"

শৈলেন বলিল—"পাণ্ডুলে যাবো।"

"পণ্ডৌল ?—সে তো দরভঙ্গা জিলা ; আমার অপ্পন জিলা আছে। কার জড়ে যাবে ?"

উগ্র-দর্শন লোকের সঙ্গে সম্বন্ধের বা আবাস-স্থানের নৈকট্য আবিষ্কার করিলে মনে এক ধরণের ভরসা আসে, বোধ হয় ভীরুতার উল্টা দিক্ ; শৈলেন গোপনীয় কথাটা বলিয়া ফেলিল—"একলা যাবো।"

"অকেলা !"—বলিয়া লোকটা একটু বিস্মিত ভাবে চাহিল ; তাহার পর তাহার মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিল, তাহার পর চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"টিকিস্ কাটিয়েছ ?"

"না, কোথায় কাটাতে হয় জানি না।"

"হুঁ....টাকা আছে ?....কো টাকা ?,'

"দু'টো টাকা আছে।"

আবার একটু চিন্তা।

"হুঁ...এদিকে আসো তুমি।"

শৈলেনকে লইয়া ঘেরা প্রাঙ্গনটার একটা নির্জন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"দু টাকায় হোবে না, পাঁ—চটি টাকা লাগবে।"

শৈলেন একটু নিরাশ হইয়া বলিল—"আর তো নেই আমার কাছে। কি মনে হইল, আর চার-আনি দুইটার কথা বলিল না।

লোকটা আর একবার চারি দিকে নজর বুলাইয়া লইল, তাহার পর শৈলেনের পিঠে দুই-তিনটা লঘু চাপড় দিয়া বলিল—"হুঁ....আচ্ছা তুমি দুঃখু মৎ করো ; হামি বাকি টাকা আপনা পাশসে দিয়ে দোব। মুলুক'কা আদমি আছে। পাণ্ডুলের বাঙ্গালী বাবুদের ছেইলা, না ? হু....বাবুদের হামি চিনে।"

শৈলেনের মনে হইল যেন কত বড় এক আত্মীয় পাইয়াছে ; যেন এখনই মত বদলাইয়া ফেলিতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি টাকা দুইটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া দিল।

"তুমি এইখানে খাড়া থাকো ; খোবোরদার কেউ ডাকলে যাইও না, কিছু বোলো ভি না, বোড়ো বদমাসের জগহ আছে। হামি দু' মিনিটমে টিকিস কিনে আসছি।"

দু' মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, বোধ হয়, দু' ঘণ্টাও কাটিয়া গেল; খান-চারেক ট্রেণ দুই দিক্ হইতে আসিয়া দুই দিকে চলিয়া গেল,—কাহারও দেখা নাই। চোখ দিয়া কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে, কাহাকেও বলিতে কিন্তু সাহস হইতেছে না। ভয়ে নৈরাশ্যে কেমন যেন জড়ভরত করিয়া দিয়াছে, কেবলই নিজেকে লোকচক্ষু হইতে গোপন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আরও খানিকটা সময় কাটিয়া গেল; টিকিট বা টাকা পাইবার আশায় নয়, পরন্তু পা উঠিতেছিল না বলিয়াই শৈলেন দাঁড়াইয়া রহিল। ভয় হইতে লাগিল এখনই জানাজানি হইয়া যাইবে, তাহার পর যে কি হইবে সেটা মনের সে-অবস্থায় কল্পনাতেও আসিল না।

এক সময় একটা গাড়ি আসিয়া যখন নূতন লোকের ভিড় নামিল, শৈলেন নিতান্ত চোরের মতো দলে মিশিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রেলের এ-দিক্‌টা সহর, ও-দিক্‌টা জঙ্গল, ঝোঁপ, ডোবা; এখানে-ওখানে ছড়ানো ছ্যাঁচা বেড়ার বাড়ি কয়খানা। শৈলেন লাইনের ফটক পার হইয়া হন্-হন্ করিয়া খানিকটা চলিয়া গেল, কান্না আর আটকাইয়া রাখা যায় না, কেবলই মায়ের মুখ মনে পড়িতেছে। খানিকটা গিয়া বেশ গভীর গোছের একটা ডোবা, আশে-পাশে বাড়ি নাই; শৈলেন নারিকেল-গুঁড়ির সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি খানিকটা নামিয়া গেল, তাহার পর বসিয়া পড়িয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; মুখ দিয়া শুধু বাহির হইতে লাগিল—"মাগো—মাগো—ওগো মা!"

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মনটা কতক হাল্‌কা হইল; জলতেষ্টা পাইয়াছে, পুকুর থেকেই কয়েক আঁচলা জল পান করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল; এবার চিন্তা আসিল ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে।

বিকাল হইয়া গেছে। এই সময় তাহার পাঠশালায় থাকিবার কথা, খোঁজ পড়িয়া গেছে নিশ্চয়; খোঁজ পড়িয়া যাওয়ার কথায় তাহার মনটা হঠাৎ আতঙ্কে ভরিয়া গেল, এবং চিন্তার স্রোতটা ভিন্ন-মুখে ছুটিল,—বাবার ক্রুদ্ধ মুখ—ঠাকুরমা, পিসিমা, খেতন-দাদা, রাগিয়া সবাই কাঁই হইয়া রহিয়াছেন—পাড়ার সবাই জড়ো হইয়াছে—আজ রাতটা পোহাইলেই কাল গুরুমশাই, এত উগ্র-মূর্তি যে কল্পনা যেন থৈ পায় না।....টাকার কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর ধরা পড়িবেই প্রবঞ্চিত হওয়ার এই অদ্ভুত ইতিহাস! উগ্র ভয়ের মধ্যে ফেরার

পথটা বন্ধ হইয়া গেল শৈলেনের কাছে; কয়েকটা মুহূর্ত ধরিয়া অবস্থাটা দাঁড়াইল ত্রিশঙ্কুর মতো—না ফেরার উপায় আছে, না আগে যাওয়ার সম্বল। তাহার পর আগে যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিল।

হ্যাঁ, হাঁটিয়াই যাইবে পাণ্ডুল। সঙ্কল্পটা উদ্ভব হইল অবশ্য ভয় থেকেই, কিন্তু একবার স্থির করিয়া ফেলার পর মনটা যাওয়ার আনন্দেই ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ বোধ হয় পিছনকার ভয় থেকে মুক্তি; কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোড়ার ভাবটাই আবার ফিরিয়া আসিল,—সেই মায়ের জন্যই পাণ্ডুলে যাওয়ার সঙ্কল্প। মাঝখানে পথের চিন্তাটা আর খুব স্পষ্ট রহিল না,—আবছায়া ভাবে খানিকটা ছকিয়া লইল—ঠাকুরদাদার মতো হাঁটিয়াই যাইব—কেহ না কেহ দয়া করিয়া খাইতে দিবেই পথে—ঠাকুরদাদার চেয়ে ছেলেমানুষই তো?....ঠাকুরদাদা একদিন রাত্রে তো ছুরি দিয়া কাঁচা লাউ কাটিয়া খাইয়াছিলেন, না হয় সে-ও খাইবে। তাহা ভিন্ন সঙ্গে আট আনা পয়সা আছে তাহার; দুই বেলা দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইলে ষোল দিন। ঠাকুরদাদা গিয়াছিলেন পনের দিনে, তাহার না হয় কুড়িটা দিনই লাগুক—না হয় এক মাস—সব দিনই কি কিনিয়া খাইতে হইবে?....একটু শঙ্কা বোধ হয় আছে মনের কোথাও লাগিয়া, কিন্তু ভবঘুরেপনার অভ্যাস—একটা অ্যাডভেনচারের আনন্দই ধীরে ধীরে মনটাকে পাইয়া বসিল। আর মায়ের মুখটা ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—হাসি-হাসি মুখটা যেন দেখা যায় সামনেই।

রেলের এদিক্‌কার রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল শৈলেন; গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, একটু ঘুরিয়া একেবারে পরের স্টেশনের ওদিকে চলিয়া গেছে। নির্জন রাস্তা, এইটাই নিরাপদ, এর পরের স্টেশনের একটু ওদিকে একটা অন্য পথে নামিয়া একেবারে লাইনের উপরে গিয়া উঠিবে, তাহার পর লাইন ধরিয়া বরাবর—বরাবর একেবারে মোকামঘাট পর্যন্ত—তাহার পর গঙ্গা পার হওয়া—কিছু একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই; তাহার পর আবার লাইন ধরিয়া একেবারে পাণ্ডুল!....অতটা কষ্টের পর মনটা একটা সমাধান আর অবলম্বন পাইয়া যেন হালকা হইয়া গেছে, গতি হইয়া উঠিয়াছে বেশ ক্ষিপ্র। রেল-লাইনে পৌঁছাইতে বিকালের আলো ম্লান হইয়া আসিল। পথ ছাড়িয়া শৈলেন লাইনের পাশে পায়ে হাঁটা পথ ধরিল। দুই দিকে প্রচুর ঘর-বাড়ি, বেশ একটা ভরসার উপরই হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। এক একবার দুপুরের টহলে আসিয়াছেও এদিকে, ছুটির দিনে।....নূতন জুতা, খুব বেশি অভ্যাস হয় নাই, পায়ে একটু

যেন ফোস্কা পড়িয়াছে দু-এক জায়গায়।....একটা গাড়ি হুস-হুস করিয়া দিয়া সামনের দিকে চলিয়া গেল। মনটা একটুখানির জন্য দমিয়া গেল।—কেমন হাত গুটাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে সব গাড়িতে! টাকা দুইটা অমন ভাবে না যাইলে সে-ও অমনি ভাবে বসিয়া যাইত তো? বোধ হয় এই গাড়িতেই।... শৈলেন আবার নৈরাশ্য কাটাইয়া ওঠে—বেশ সহজেই এক রকম; মনকে মনে করাইয়া দেয়—ঠাকুরদাদা তো হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে দুই দিকে। আরও পা চালাইয়া দিল শৈলেন। সামনে ওটা মেঘ না কি আকাশে? হ্যাঁ, মেঘই সামান্য একটু। শৈলেন আরও পা চালাইয়া দিল। ফোস্কাগুলায় লাগিতেছে বেশি—ফাটিয়া গেল না কি? জুতাজোড়া খুলিয়া হাতে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।....দুই পাশের বাড়ির সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা জ্বলিয়া শাঁখ বাজিতে আরম্ভ করিল। শৈলেনের মনটা কোন্ এক উঁচু স্তর থেকে হঠাৎ যেন নিচুতে আসিল।...সাঁতরার বাড়িতে আলো জ্বলিল, শাঁক বাজিল,—কে বাজাইতেছে? ঠাকুরমা. না, বৌদিদি?....ঠাকুরমার মুখখানা হঠাৎ শৈলেনের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল,—সন্ধ্যার নূতন আলো ঠাকুরমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, রাগ নাই, বিষণ্ণ আর ভয়াকুল; চোখে জল।...মায়ের মুখ যেন আর তত স্পষ্ট নয়।

বোধ হয় বৃষ্টি হইবে। বাস্তব যেন ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল শৈলেনকে,—আজ রাত্রিটা কাটাইতে হইবে কোন খানে?....ওর যেন এই প্রথম মনে হইল, কুড়ি দিনের সঙ্গে কুড়িটা রাত্রিও আসিবে এমনি করিয়া। একটু যেন কি-রকম মনে হইতে লাগিল, একটু একটু গা-ছমছম করা গোছের।

তবুও কল্পনা একেবারে লুপ্ত হয় নাই,—সামনে স্টেশন, রাতটা সেখানেই কাটাইবে, স্টেশন তো বেশ ভালো জায়গাই। সে স্টেশনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে; স্টেশন-মাষ্টার নিশ্চয় আসিবে সে-দিকে একবার না একবার, নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে আহার হইয়াছে কি না—বাড়ি লইয়া যাইবে, খাওয়াইবে,—শৈলেন ছেলে মানুষ তো?

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া অন্ধকার হইয়াছে, সরু রাস্তার উপর দু'-এক স্থানে পাশের বনের লতা-গুল্ম আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে হাত দশ-বারো দূরে দুই জন লোক গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল—বোধ হয় কোন কলের মজুর—তাহারা হঠাৎ রেলের বাঁধ থেকে নামিয়া ডাইনের দিকে কোথায় চলিয়া গেল। শৈলেনের অস্বস্তিটা আরও একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল; সাহস যেন ডাকিয়া

আনিতে হইতেছে।...দূরে স্টেশনের পাখার লাল-নীল আলো ল্লি-লি করিতেছে।

হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড়-গুড় করিয়া একটা শব্দ হইল। শৈলেন ফিরিয়া দেখিল, পিছনের সমস্তটা ঘিরিয়া ঘন কালো মেঘের রাশি। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—ভয়টা যখন আসিয়া পড়িল, মেঘের মতোই চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া আসিল। এতক্ষণ একটা আবেশের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল, এখন ভয়ের দৃষ্টিতে সব কিছুরই রূপ যেন একসঙ্গে বদলাইয়া গেল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, হাওয়ার দুই-তিনটা হল্‌কা দুই দিক্‌কার বনের উপর দিয়া একটা ঝম্‌ঝম্ শব্দ তুলিয়া বহিয়া গেল; আবার সব নিস্তব্ধ, শুধু সামনে নক্ষত্রপুঞ্জ চাপা দিয়া পিছন থেকে মেঘের স্তূপ বিদ্যুতের মশাল ধরিয়া গড়াইয়া আসিতেছে। কাছে বাড়ি নাই, বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে শুধু গোটা দুই-তিন আলো দেখা যায়—এখানে-ওখানে ছড়ানো—সাহসের বদলে কেমন যেন ভয়েরই সঞ্চার করে। হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যে কি হইয়া গেল,—স্টেশনের পাখার জ্বল-জ্বলে আলোগুলাও যেন মনে হইতেছে কাহাদের রক্ত-চক্ষু।...না; আসলে তাহা তো নয়—রেলের পাখাই তো ওটা,—মনকে জোর করিয়া এটা বুঝাইয়া শৈলেন আরও জোরে পা চালাইয়া দিল, এবং কয়েক পা গিয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

একেবারে মেঘের ডাক আর উগ্রতর হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিল। দৌড়াইবার পথ নাই। সরু পথের উপর লাইনের পাথর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই পথটা পিছল হইয়া পড়িল। শৈলেন একবার পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। হাতে-পায়ে কয়েক জায়গায় জ্বালা করিতেছে; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আবার ছুটিল, যেন কিসের কাছে তাড়া খাইয়াছে, একটুও দাঁড়াইলে চলিবে না। মানুষের শব্দ শোনা যেন আবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে,—শৈলেন "মাগো!" বলিয়া চেঁচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিল।

তবুও ছুটিয়াছে; আর একবার পড়ো-পড়ো হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। মাথা নিচু করিয়া ছুটিতেছিল, সোজা হইতেই দেখিল ডান দিকে একটা চরখি। লাইন ছাড়িয়া দিল এবং চরখি ঠেলিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মাথার উপর দিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িয়া যাইতেছে, শীতে শরীরটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে; কাঁদিতেছে জোরেই, নিজের কান্নাটাই কানে লাগিয়া নিজেকে বড় অসহায় বলিয়া মনে হইতেছে...ক্রমাগতই বাঁকিয়া

ঢুকিয়া চলিতেছে রাস্তাটা, কোথা দিয়া কত দূর যে গেল খেয়াল নাই। অসম্ভব বৃষ্টির ঝাপ্‌টা, চোখ তুলিবার জো নাই। এদিকে একটু একটু থামিয়া মেঘের উগ্র গর্জন!

হঠাৎ একবার মনে হইল যেন ছাদের নল দিয়া ছড়-ছড় করিয়া জল পড়িতেছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিচু মুখেই একবার চোখ তুলিয়া দেখিল রাস্তার ধারে একটা বাড়ি, একটু মাথা তুলিয়া বুঝিল দোতলা। রাস্তার উপর সদর দরজা; "দোর খোল!"—বলিয়া একটু জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটা এমন হঠাৎ খুলিয়া গেল যে প্রায় পড়োপড়ো হইয়া শৈলেন উঠানে যেন ছিটকাইয়া গেল; কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। একটা বিদ্যুৎ-ঝলকে ডান দিকে কাছেই একটা সিঁড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

কয়েকটা মুহূর্ত এই দারুণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা ছাড়া শৈলেনের মনে যেন কিছুই আসিতে পারিল না—মাথার উপর বৃষ্টি নাই, একটা বাড়িতে আসিয়া ছাদের নিচে দাঁড়াইয়াছে।—একটা অপূর্ব নিশ্চন্ততার অনুভূতি।...তাহার পর একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, বাহিরের চেয়ে ঢের বিকট—যেন জমাট বাঁধিয়া গেছে; নিচে, বারান্দায় কোনখানেই চার-পাঁচ হাতের ওদিকে আর কিছুই দেখা যায় না; তেমনই নিস্তব্ধ—এক ঐ বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দ ছাড়া। চোখ দুইটা যথাসম্ভব আয়ত করিয়া মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারিদিকে চাহিল শৈলেন—চক্ষু নিজেই যেন আয়ত হইয়া যাইতেছে—আরও—আরও, তাহার পর সমস্ত শরীরটা উৎকট ভয়ে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল,—সাঁতরায় সেই চরখির সামনে সেদিন যেমন মনে হইয়াছিল তাহার চেয়েও যেন কত গুণ বেশি; শৈলেন বুকের ভিতর থেকে কিসের একটা চাড়েই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে আছ গা এ-বাড়িতে—কে···?"

তাহার পরের খানিকটা স্মৃতি একেবারে অবলুপ্ত। এর পরেই মনে পড়ে সে একটা চৌকির উপর পাতা বিছানায় শুইয়া আছে, মাথার কাছে একটি স্ত্রীলোক বেশ একটু ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল যেন মায়ের মতো মুখটা, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া দেখিবার পূর্বেই মুখটা যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া আবার সব অন্ধকার হইয়া গেল।

আবার যখন চাহিল, সেই স্ত্রীলোকটি কপালে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"কাদের ছেলে তুমি?"

"শৈলেন, নিজের কানে যায় না এই রকম একটু নূতন রকম স্বরে উত্তর করিল—"মার কাছে যাব।"

"যেয়ো ; এই দুধটুকু খেয়ে নাও দিকিন, লক্ষ্মীটি।"

এখন পর্যন্ত গলায় যেন স্বরটুকু লাগিয়া আছে শৈলেনের—দুধও যে এত চমৎকার সে এর পূর্বে জানিত না, যতটা গেল একটা আতপ্ত স্পর্শে সমস্ত অবসাদকে যেন দুই দিকে ঠেলিতে ঠেলিতে গেল।

প্রশ্ন হইল—"কোথায় মা তোমার ?"

"পাণ্ডুলে।"

"কোথায় সে ?"

শৈলেন গুছাইয়া উত্তর দিবার জন্য চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা তুমি শুয়ে থাকো চুপ করে। পাণ্ডুল তো ? আমি জানি, তোমার ভাবতে হবে না।"

আদেশ নয় ক্লান্তিতেই শৈলেন আবার চক্ষু মুদিল। অনুভব করিতেছে মায়ের নরম আঙুলের মতো কয়েকটি আঙুল চুলের গোড়ায় সঞ্চালিত হইতেছে। হঠাৎ বুকে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল, আর কিছু না পাইয়া স্ত্রীলোকটির আঁচলের খানিকটাই দুই হাতে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল, এবং একটু পরেই তাহার মুদ্রিত দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটি অপর হাত দিয়া মুছাইয়া দিল,—বলিল—"কেঁদো না, কি রকম মা তোমার ?"

নিশ্চয় বলার উদ্দেশ্য ছিল—কি রকম মা যে এই দুর্যোগেও ছেলেকে ছাড়িয়া দেয় ; শৈলেনের কিন্তু অস্পষ্ট চৈতন্যকে আশ্রয় আচ্ছন্ন করিয়া একটি মাত্রই অনুভূতি ছিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল—"তোমার মতন।"

আঙুলের সঞ্চালন যেন আরও কোমল হইয়া গেল, আরও মায়ের মতো শুনিতে পাইল—"শুয়ে থাকো, আমি উঠিয়ে খাওয়াব'খন ; কিছু ভয় নেই, আমি এইখানেই বসে আছি।"

সে রাত্রের আর এইটুকুই মনে পড়ে যে একবার উঠিয়া দারুন ঘুমের ঘোরে এক রকম চক্ষু বুজিয়াই কি আহার করিয়াছিল—বোধ হয় ভাত, একটু দুধ, একটু কি মিষ্ট,—মায়ের মতোই কে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিল....

জীবনে একটি যেন মস্ত বড় রহস্য হইয়া আছে—কে ছিল সে—অত মায়ের মতো ?

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া গেল, একটু অন্ধকারই ছিল চারি দিকে লাগিয়া তখনও। রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো মনে পড়িতেছে —একটি স্ত্রীলোক—আদর করিল—খাওয়াইল—মায়ের মতো....কিন্তু কোথায় সে ?

চারি দিকে চুণ-বালি-খসা একটা ঘর, মনে হয় না যে কেহ ব্যবহার করে ; দেয়াল বাহিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছিল—লম্বা লম্বা অনেকগুলা ধারা নিচে পর্যন্ত নামিয়া গেছে।....অবশ্য বিছানাটা রহিয়াছে ঠিকই। শৈলেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। দুয়ার খোলা, বাহিরে আসিল।

ঘরটা দোতলায়, বারিন্দায় দাঁড়াইয়া দেখিল সমস্ত বাড়িটা আগাছার জঙ্গলে ঢাকা এক রকম—সামনে ভাঙাচোরা আরও দুইটা ঘর আর পোড়ো বাড়ির একটা ভ্যাপসা গন্ধ।....আবার সেই কাল রাত্রের মতো সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঝিম-ঝিম করিয়া আসিতেছে। তবু দিন, শৈলেন পাশের সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিল—পা কাঁপিতেছে, কিন্তু কেন যেন কালকের মতো সাড়া লইতে সাহস হইতেছে না। মনকে খুব শক্ত করিয়া খোলা দরজা পার হইয়া শৈলেন রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

কে ছিল স্ত্রীলোকটি ?

ছেলেবেলার সমস্ত অংশটাই, অর্থাৎ জীবনের সমস্ত রূপ-কথার যুগটা ব্যাপিয়া শৈলেনের মনে বিশ্বাস ছিল কেহ মায়ের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছিল। মা-শীতলা সাঁতরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, খুব সম্ভব তিনিই আসিয়াছিলেন, ঠাকুরমা প্রায়ই তো মানৎ করিতেন ওদের দুই ভাইয়ের জন্য। মা-শীতলা যে এই রকম ভাবে ভালো করিয়া বেড়ান,—সাঁতরার কত বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছেন, কত রুগ্নের গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইয়া নীরোগ করিয়া দিয়াছেন, —বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেমেয়েরা না কি তাঁর আরও আদরের পাত্র।

উত্তর-জীবনে আরও মত বদলাইয়াছে,—থিয়োজফিতে বলে যাহাকে প্রাণ-পণে ভাবা যায় তাহার আত্মা না কি জীবিত অবস্থাতেই দেহরূপ ধরিয়া উপস্থিত হয়—আত্মার আকর্ষণে—স্বপ্নাবস্থায় অথবা কখনও মূল দেহকে পরিত্যাগ করিয়াও। কত অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে।...তাহার মানে,

শৈলেনের আকুল আহ্বানে মা-ই আসিয়াছিলেন—পাণ্ডুলে ঘুমাইয়া পড়িয়া। আশ্চর্যের কিছুই নাই, হয়তো পূর্ণেন্দুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন,—শশাঙ্ক শৈলেনকে স্বপ্নে দেখিয়া আসিতেন—একথা তো প্রায়ই বলিতেন মা। আবার যেটা সহজ সম্ভাবনীয় সত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেটাতে সায় দেয়, সেটাও মনে হইয়াছে।—একটা জীর্ণ, পরিত্যক্ত বাড়িতে শুধু নিজের প্রয়োজনের জায়গাটুকু পরিষ্কার রাখিয়া একটিমাত্র স্ত্রীলোক কালাতিপাত করিতেছে – বাংলা দেশে এ-দৃশ্য বিরল নয়; সধবা কি বিধবা, ঠিক বয়স কতটা আন্দাজ, মনের সেরূপ অবস্থায় শৈলেনের নিশ্চয় ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। মায়ের কথাই সমস্ত মন জুড়িয়া ছিল, অবিরাম মায়ের সান্নিধ্যই কামনা করিতেছিল, তাই যাঁহাকে পাইল সেই স্বল্পালোকিত ভাঙা-চোরা ঘরটিতে, সেই ক্ষীণ চৈতন্যের মধ্যে, তাঁহাকেই মা বলিয়া মনে হইয়াছিল, বরং অন্য কেহ বলিয়া মনে হওয়াই অসম্ভব ছিল এক-রকম।....সকালে দেখিতে পায় নাই—সেটা তো কিছুই নয়,—এই সব স্ত্রীলোকেরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করে, হয় তো গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে সেদিন একটা যোগ ছিল; না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না।... আরও কত কি হইবার সম্ভাবনা আছে,—স্ত্রীলোকটি হয়তো স্থায়িভাবে থাকে না, সহরে থাকে—খাজনা-পত্র আদায় করিতে বা ক্ষেতের শস্য বা বাগানের ফল মূল সংগ্রহ করিতে পুরানো, পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটায় আসিয়াছিল, একা মানুষ—নিজেই সব করিতে হয়। হয়তো বা চাকর-বাকর কেহ ছিলও—নিচে, অন্য কোনও ঘরে। কতরকম কি হইতে পারে—নিতান্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই।...কিন্তু ভালো লাগে না সত্যের এত উজ্জ্বল আলোক। ছেলেবেলার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে ছেলেবেলার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে দেখিতেই ভালো লাগে—বেশ কেমন মা সমস্তটির কেন্দ্রগত হইয়াছিলেন। মাকে সন্তান শিশু হইয়া দেখিতে চায়—তা, যত বয়সই হোক না কেন। বাহিরে আর পাঁচ জনের মধ্যে নিশ্চয় বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু নিজের অন্তরে এই লাগে ভালো।

সাঁতরার বাড়িতে আসিয়াই শৈলেন শয্যা গ্রহণ করে। কঠিন অসুখ—জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস, আরও নানা রকম জটিলতা। তৃতীয় দিবস হইতে চৈতন্য হারায়; যখন জ্ঞান হইয়াছে একটু, দাদা বা মায়ের কথা লইয়া প্রলাপ বকিয়াছে। পাঁচ দিন এই ভাবে কাটার পর যখন একটু চিনিবার বুঝিবার

মতো অবস্থা হইল, দেখে চৌকির পাশে বাবা বসিয়া আছেন। আরও দিন সাতেক পরে আরোগ্য লাভ করিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে চলিয়া গেল।

১০

বিপিনবিহারী শৈলেনকে লইয়া পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরের কথা। বিকাল থেকে বৃষ্টি নামিয়াছে। কোন্ ছেলের—হয়তো শশাঙ্কর সাধ হইয়াছিল খিঁচুড়ি খাইবার, তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। এটা-ওটা খাইবার সাধ হয় বেশি করিয়া শশাঙ্করই; সাঁতরায় অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার নাড়ী অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এখানকার জল-হাওয়ায় সুস্থ হইয়া পুষ্টি চায়।

শৈলেনের সে রাত্রিটি বেশ মনে পড়ে; বাহিরে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। একটা জানালা দিয়া বাহিরে একটা কিসের ঝোঁপের জমাট অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি দেখা যায়,—সবাই একসঙ্গে আছে বলিয়া ভরসার সঙ্গে একটা নিরর্থক ভয়ের ভাব মিশিয়া চমৎকার লাগিতেছে। এবারে দেশ থেকে বাবা একটা নূতন ধরণের টেবিল-ল্যাম্প কিনিয়া আনিয়াছেন, সেইটা জ্বালা হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল আলোকে ঘরটা ভরিয়া গিয়াছে। এক দিকে আছেন বাবা, তুই পাশে শশাঙ্ক আর শৈলেন; সামনের দিকে বসিয়াছে হরেন, পূর্ণেন্দু; হরেনের মুখখানা স্বভাবতঃ রক্তাভ, ভোজনের তৃপ্তিতে আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সামনে মা হাতে একটা রেকাবি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; কি সব গল্প হইতেছে।

এখন, যখন দৃশ্যটি স্মরণ-পথে উদয় হয়, শৈলেনের সারা মনটা একটা পূর্ণতার ভাবে ভরিয়া ওঠে। কৈশোরের মন নিশ্চয় স্পষ্টরূপে ভাবগ্রাহী ছিল না, তবু একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে ঐ ধরণের একটা কিছুর আভাস ছিল বলিয়া মনে হয়। একটা কি হাসির কথা হইয়া গেছে, সবার মুখে প্রসন্নতার জেরটা তখনও লাগিয়া আছে; শৈলেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আহা, অহি যদি থাকত বেশ হোত, না মা?"

অহি একেবারে শয্যা-ধরা, উঠিবার সামর্থ নাই।

বেশ মনে পড়ে, মায়ের মুখটা অত আলোর মধ্যেও যেন ম্লান হইয়া গেল। দাদার এই সব বৈশাদৃশ্যের চেতনাটা ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রখর, নিচু মুখেই ঘাড় বাঁকাইয়া নীরব তিরস্কারে শৈলেনের মুখের পানে চাহিল।

মায়ের মুখ আর দাদার দৃষ্টি—এই দুই মিলাইয়া শৈলেন বুঝিল কথাটা ভুল হইয়া গেছে।

বাবা সামলাইয়া লইলেন; অবশ্য নিজেও একটু কি-রকম হইয়া যাইবার পর; প্রশ্ন করিলেন—"একটা মজার কথা শুনেছ গা?"

মা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন—"কি কথা?"

বাবা বলিলেন—"শৈলেন সেদিন দেশে পাগুল খুঁজতে বেরিয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তখন....কি বলেছে তোকে রে শশাঙ্ক?"

শশাঙ্ক বলিল—"হ্যাঁ,বলছিল মা এসে যেন..."

শৈলেন লজ্জিত ভাবে বলিল—"যাঃ।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমায়ও বলছিল, আমার মতন কে যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে,—ওকে খাইয়ে দিলে...."

বাবা বলিলেন—"ও না কি বলেছে তোমার চেয়ে ঢের ভালো।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"তা কি হতে নেই?....কিন্তু তাহলে চলে এল কেন?"

"সে তো আমি নিয়ে এলাম বলে। আবার ভাবছি রেখে আসব,—আরও ভালোই যখন পেয়েছে।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন—"তা তুমি পার। না বাপু, মন্দ মাকেই ঘেরে-ঘুরে থাকুক সব, দু'টো বছর যা করে কেটেছে, ঠাট্টাতেও ভয় হয়।.... শৈল, তোকে আর একটু পায়েস দোব?"

বাবা একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওর দেশের গর্ভধারিণীর ভয়ে যে তুমি সন্থ সন্থ ভালো হয়ে উঠছ ওর কাছে।"

অহির উল্লেখের বেদনাটুকু কাটিয়া গিয়া আবার পূর্ণতার রূপটি প্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় শোবার ঘর থেকে খজনী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিল—"হে দুলহীন, দৌড়্‌!—অহি-বউয়াকে দেখু!"

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের হাওয়া যেন বদলাইয়া গেল। মা ব্যাকুল, অসহায় ভাবে বাবার পানে চাহিলেন, যেন একটা উৎকট সুনিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন হইতে পা উঠিতেছে না। বাবা ক্ষণমাত্র তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"এসো, দেখি।"

দাওয়াতেই একটা বালতি ছিল, প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই একটা কুলকুচি করিয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেলেন। শৈলেনরা চার ভাইও উঠিয়া পড়িল। মা যেন

কত দিনের রুগ্নার মতো নিজেকে টানিয়া টানিয়া ও-ঘরের দাওয়া পর্যন্ত গেলেন কোন রকমে—যে-কোন মুহূর্তেই মোক্ষম কথাটা যেন কানে আসিয়া যাইতে পারে ; তাহার পর দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চাপা-গলায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহারা ছোট তিন ভাইয়ে বিহ্বল ভাবে মাকে ঘিরিয়া বসিল, বড়কে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টিই করেন আলাদা করিয়া একটু—শশাঙ্ক আস্তে আস্তে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বাবার কাছে দাঁড়াইল।

প্রায় মিনিট-পাঁচেক পরে বাবা গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"ভালো আছে, এসে বোস একটু, আমি ওষুধ দিই একটা।" সঙ্গে সঙ্গেই রাগিয়া উঠিলেন একটু—"এ কি অলুক্ষুণে কান্না তোমার! শুধু কেঁদে রাখতে পারবে?"

খজনী ও-বাড়ী থেকে শৈলেনের জেঠাইমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে ; তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ রকম করে যদি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে কথায় কথায়, বৌদি, তো..."

ও-বাড়ি থেকে জেঠামশায়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বাবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"সামলে উঠেছে।"

জেঠামশাই একটু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আজ-কাল একটু ঘন ঘন হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, বুধবার দিন হয়েছিল, পাঁচ দিন হোল।"

"তাহলে?"

"ওষুধ দিচ্ছি!"

"একবার মধুবাণী হাসপাতাল থেকে..."

শৈলেন উৎকট ঔৎসুক্যে প্রতি প্রশ্ন-উত্তরে পারাপারি করিয়া দুই জনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, জেঠামশাইয়ের প্রস্তাবে বাবা এমন একটু হাসিলেন যে তিনি কথাটা আর শেষ করিতে পারিলেন না।

অহির ছিল আজ-কাল ডাক্তারি-ভাষায় যাকে বলে রিকেট্‌স্। জন্ম হইতেই দুর্বল, ওর বয়স হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাড় ছিল না। যত দিন একবারে শিশুটি ছিল তত দিন আশায় আশায় ওকে লইয়া সবাই একটু জুঝিল, তাহার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখা গেল ওর দেহ-মন একেবারেই সাড়া দিতেছে না, তখন নিরাশ হইয়া একেবারে স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। কখনও এটা কখনও সেটা—এই করিয়া একটা চিকিৎসা বরাবরই চলিল বটে, কিন্তু তাহার

অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতায় সবাই যেন একটু উদাসীন হইয়া রহিল, শুধু অনিশ্চিত ক্ষণিকের অভ্যাগত বলিয়া তাহার উপর সবার করুণাটা ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।...আহা! দু'টো পোষাক ও বেশি পরুক; খা'ক্ দু'টো ভালো জিনিষ—ডাক্তারদের মানা অত দেখিতে গেলে চলে না।

ঠাকুরমা, বাবা, কাকা, কাকিমা—সবাই চরম সত্যটিকে মানিয়া লইয়াছেন; শুধু মানিতে পারেন নাই মা। অহি চিরকালটা নিশ্চয় এমন থাকিবে না—শীতটা গেলেই যখন ফাল্গুনের নূতন হাওয়া দিবে, অহি এই বয়সে যেমনটি হওয়া উচিত হু-হু করিয়া তেমনটি হইয়া উঠিবে—কামারটুলির পড়াউয়ের বৌ বলিয়াছে।

বসন্ত গেল, পড়াউয়ের বৌ বলিল—এবারে বসন্তে যে আমের মঞ্জরী হইল না, ফাল্গুনের হাওয়াটায় তেজ নেই কি না; তাই বলিয়া পরের ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না, গরমটা কাটিয়া গিয়া একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই শরীর ঠিক হইয়া যাইবে অহির। পড়াউয়ের বৌয়ের ব্যবস্থায় বড়্ হম্ ঠাকুরের পূজা দেওয়া হইতেছে নিত্য। গরম গেল, বর্ষাও শেষ হইয়া শীতের আমেজ সুরু হইল, ঠিক যে সময় গিরিবালা ভাবিতেছেন অহির শীতের জামা এবার একটু বড় করিয়া করাইতে হইবে, পড়াউয়ের বৌ আসিয়া খবর দিল, হস্তা-নক্ষত্রের দুর্জয় বৃষ্টিতে বড়্ হম্ ঠাকুরের নিজের চালাটি নষ্ট হইয়া গেছে, তিনি নিজেই একটু বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের সবাই চালাটি আবার তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, হয়, ভালোই, নয়তো বোধ হয় এ-শীতটা এদিকে নজর দিতে পারিবেন না ঠাকুর। তবে পূজা খাইয়াছেন, ভয়ের কারণ নাই।...গিরিবালা লুকাইয়া পড়াউয়ের বৌয়ের হাতে দুইটা টাকা গুঁজিয়া দেন, বলেন—"এই দু'টি ছিল আমার কাছে পড়াউয়ের বৌ, দেখ্ যাতে ঠাকুরের ঘরটা শীগ্‌গির ওঠে; কেউ যেন না টের পায় কিন্তু।"

কালচক্র আবর্তিয়া চলে! শুধু তো পড়াউয়ের বৌ-ই নয়, আরও আছে—দুখ্‌নার খুড়ি, শনিচ্‌রার বৌ...। শ্যামার ঠাকুরমা বলে—"হে নয়কী দুলহীন, তোমরা বাঙালীরা যে কী বুঝি না বাপু। দুখ্‌নার খুড়ি জলজ্যান্ত ডাইন, অথচ তাকে নৈলে তোমাদের চলে না, ছেলে ভালো হবে কি?"...গিরিবালার মুখ শুকাইয়া আসে, কিন্তু ডাইন বলিয়াই আরও দুখনার খুড়িকে চটাইতে সাহস হয় না। খোসামোদ করেন—রীতিমতো পূজা—চাল, ডাল, আলু, নুন, যখন যেটার জন্য হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। মাগিটা গরীব, কিন্তু ভালোমানুষ, দুলহীনের দয়ার জন্য যথাসাধ্য গতর খাটাইয়া দিয়া যায় অন্য কাজ না থাকিলে

অহিকেই লইয়া খেলা করে। তেলের সঙ্গে হলুদ আর এক রকম মশলা মিশাইয়া 'উপটন্' তৈয়ার করিয়া ডলিয়া ডলিয়া মাখাইয়া দেয়, বলে—"হে নয়কী তুলহীন! ছেলেটাকে তুমি ও-সব বাজে ওষুধপত্র ছাড়িয়ে আমার হাতে ছেড়ে দাও দিকিন—ডলে-মলে আমি পাথর করে দেব ছেলেকে। আমার তুখ্নাকে দেখেছো তো? ছেলেবেলায় ঠিক এই রকমটি ছিল। ভরোসিয়ার দিদিমা ডাইন ছিল কি না, তারই নজর লেগেছিল।....আমার কাছে ডাইন! এমন 'উপটন্' দিয়ে ডলে-মলে দোব যে মুল্লুক ছেড়ে যেতে পথ পাবে না!...."

ডাইনের মুখের কথা, এক ধরণের সাহসও হয় একটা, তাহারই সঙ্গে আবার ভয়; মায়ের মন, ভালো বা মন্দ—কোন একটা অনুভূতিকে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোন একটা ছুতা করিয়া গিরিবালা ঘরের মধ্যে চলিয়া যান, তাহার পর দুয়ার বা জানালার খুব সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র দিয়া উগ্র ঔৎসুক্যে তুখ্নার খুড়ির দিকে চাহিয়া থাকেন—কি রকম চোখের ভাবটা?—চাটিয়া দিতেছে না তো?—কোন তুক্ করিতেছে না তো?....কেমন যেন সম্মোহিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, কতটা সময় গেল, খেয়াল থাকে না। একাগ্র-চিত্তে খুব করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া তেল মাখাইয়া ছড়া আওড়ায় তুখ্নার খুড়ি—

সোনাকে কটোরামে উপটন্ তেল,
বউয়াকে লাগায় দেলি দশ-বিশ বের—
বাবু, দশ-বিশ বের...

আরও কত কি সব। তাহার পর ডাক দেয়—"কোথায় গো নয়কী তুলহীন! আমি যাই এবার বাপু।" অহিকে সোজা করিয়া বসাইয়া বুকের তেলটা মালিস করিতে করিতে ঝোঁকে ঝোঁকে ঠোঁট মুখ বিকৃত করিয়া বলে—"ঝাঁটা মারি আমি ডাইনের মাথায়—সাত ঝাঁটা মারি—মুড়ো ঝাঁটা!....

কি রকম একটা অদ্ভুত শক্তি আসে গিরিবালার মনে। ডাইনিই তুখনার খুড়ি, সেই জন্য সঙ্গোপনে ওর কার্যকলাপ দেখিয়া মস্ত বড় একটা ভরসা হয়। খোসামোদ করেন—"বড্ড ভালোবাসিস অহিটাকে, না রে তুখ্নার খুড়ি? দে ওকে ভালো করে, এক জোড়া শাড়ি দোব তোকে।...তোকে সর্বদাই যে, আসতে বলছি তা নয়, গরীব মানুষ, নানা জায়গায় গতর খাটিয়ে খাস, সময় কোথা তোর?"

যদি দু'মুঠা ডালের জন্য আসে, দু'টি চালও দিয়া দেন কোঁচড়ে; চালের জন্য আসিলে দু'মুঠা চিড়াও দিয়া দেন; বলেন—"গরীব মানুষ, তোরা দু'টো খেতে

পেলে আমার অহির কল্যাণ। সত্যিই তোর মন বলছে যে ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে?"

দুখ্নার খুড়ি বর্ষীয়সী, গিরিবালার চেয়ে ঢের বড়, কৃত্রিম রাগের সহিত একটু ধমক দেয়, বলে—"অলুক্ষুণে ভাবনাগুলো তুমি ছাড়ো নয়কী দুলহীন। ফাগুন মাসটা দো'রসার সময়, একটু গরমটা ভালো করে পড়ুক, অহি যদি হুড়মুড়িয়ে মাথা-ঝাড়া দিয়ে না ওঠে, তুমি দুখ্নার খুড়িকে ডেকে সাত ঝাঁটা গুণে গুণে মেরো।"

গ্রীষ্ম ভালো করিয়া পড়িতে একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিল। এত দিন পর্যন্ত এক অতিরিক্ত দৌর্বল্য আর বৃদ্ধির অভাব ছাড়া অন্য কোন দোষ ছিল না, বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে মাঝে মাঝে ফিট হইতে লাগিল। মধুবাণী হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখান হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না, ফল হইবে বলিয়া ডাক্তার কোন ভরসাও দিতে পারিলেন না। বৈশাখ মাসে একবার হইল; বিপিনবিহারী শ্বশুরকে লিখিয়া একটা ঔষধ আনাইয়া লইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি একবার হইয়া আষাঢ় ও প্রায়-সমাপ্ত শ্রাবণ মাসটা ভালো রহিল অহি। শ্রাবণের শেষাশেষি হইতে কিন্তু হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন আসিল ভাদ্র মাসের গোড়ায়, তাহার আগে দিন-বারোর মধ্যে দুইবার ফিট হইয়া গেছে অহির, আবার পাঁচ দিনের মাথায় তাহার সামনেই হইল।

গিরিবালার মোহেও ভাঙন ধরিল। মৃত্যুর এমন স্পষ্ট সূচনা দেখিয়া কি যে করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন অবস্থা হইয়াছে যে আক্রমণটা হইলে তিনি আর সামনে যাইতে পারেন না, মাঝ-পথেই তাঁহার যেন পা ভাঙিয়া মুড়িয়া যায়, বসিয়া পড়েন। তাঁহাকে লইয়াই যেন একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

বিপিনবিহারী যখন সাঁতরায় যান তখন অহির এ-রকম ভাবটা ছিল না। নূতন চিকিৎসায় শ্রাবণ মাসটা বরং ভালই ছিল এক হিসাবে, নহিলে তিনি মাকে লইয়া আসিতেন। আসিয়া অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য চণ্ডীচরণকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

আয়োজনের মধ্যে দিয়া মৃত্যু যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল গিরিবালার কাছে। একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে মৃত্যুর সঙ্গে। আতঙ্ক, অথচ প্রতিক্ষণেই তাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে নিকট থেকে আরও নিকটে। তাহার পর ওর ছায়াও যেন স্পষ্ট দেখা যায়।....অহিকে রাখা যাইবে না? কতবার

শুনিয়াছেন মৃত্যুর পথ কেহ অবরোধ করিতে পারে না, দেখিয়াছেনও; কিন্তু আজকের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামনে সে-সবের যেন কোন অর্থই নাই। কী যে মনে হইতেছে ধরা যায় না, কী যে করিতে হইবে বোঝা যায় না। মাঝে-মাঝে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ওঠে মনে—আজ এই বৃহস্পতিবার—আসছে বৃহস্পতিবারে অহি কি আছে বাড়িতে?....যদি না থাকে!

প্রতিদিনই একটু বেশি করিয়া স্বল্পবাক্ হইয়া উঠিতেছেন গিরিবালা।

রৈয়াম থেকে ছোট-জা আসিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"তুই এ-দিক্‌টা দেখ বৌ, আমার বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে কথায় কথায়, অহির কাছে থাকি আমি।....ওকে যাবে না বাঁচানো?—তোর কি মনে হয়?"

"বাঁচবে বৈকি দিদি; ছি, ও কি অলুক্ষুণে কথা?"

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার জায়ের পানে চাহিলেন—সেই প্রবঞ্চনার ভাষা,—আজ কয় বৎসর ধরিয়া দুখ্‌নার খুড়ি, শ্যামার ঠাকুরমা, আরও সবাই যাহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—ও-বাড়ির জা পর্যন্ত, এমন কি স্বামী পর্যন্ত বাদ দেন নাই। গিরিবালা কিন্তু সে লইয়া কিছু বলিলেন না; তুই দেখ এ-দিক্‌টা বোন"—বলিয়া অহির কাছে গিয়া বসিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আর একবার ফিট হইল। গিরিবালা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বেশ জোরেই ডাকিয়া উঠিলেন—"ছোট বউ!"

আসিলে অজ্ঞান অহিকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ্, এই রকম করে দেয়!"

—যেন কোন্ অমোঘ, ক্রূর, অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল অনুযোগ করিতেছেন—'এই রকম করে দেয়।'

শশাঙ্ক ছুটিয়া বাহির হইতে বিপিনবিহারীকে ডাকিয়া আনিল, ও-বাড়ি থেকেও সবাই আসিলেন। ভালো হইয়া গেলে বেটাছেলেরা সব চলিয়া গেল, ছোট-জা প্রশ্ন করিলেন—"একটু হরির মাটি এনে ঠোঁটে দিয়ে দিই দিদি?"

যেন কত দিনের ক্লান্তির জের টানিয়া গিরিবালা বলিলেন—"দিবি দে;....কিছু হয় না।"

শুক্রবারে রাত্রি দুপুরে আর একটা আক্রমণ হইল, তাহার পর শেষ রাত্রি শেষ আক্রমণ।

অহির মৃত্যু ছাপাইয়া শৈলেনের মনে পড়ে মায়ের শোকের মূর্তি। এইটিই

যেন সে-দিনের মুখ্য ঘটনা। সবাইকে কাঁদিতে দেখিল, নিজেও কাঁদিয়াছিল কম নয়; কিন্তু সব চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তাঁকে যিনি মোটেই কাঁদেন নাই। কোল থেকে অহিকে লইয়া গেল, শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন মা—সমস্ত উঠানটায় যতক্ষণ দেখা গেল, চোখ ফিরাইয়া। বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে যাইতে যাইতে ও-বাড়ির জেঠাইমাকে বলিলেন—"ওটাকে আগে কোন রকমে কাঁদাও বৌদি, নয় তো পাগল হয়ে যাবে।"

সবাই ঘিরিয়া বসিল, মা দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, কোন মতেই কাঁদানো গেল না!...আশ্চর্য ব্যবস্থা!—জাতক যখন জন্মাইবে, তাহার নিজের কাঁদা চাই, তাহার যখন মৃত্যু তখন কাঁদা চাই অপর সকলের, নহিলে উভয়ত্রই গোলমাল। জীবন-মৃত্যু যাহার ক্রীড়নক তাহার রসজ্ঞানের বলিহারি দিতে হয় বৈ কি!

বৈকালে নিস্তারিণী দেবী আসিয়া পড়িলেন; নিশ্চয় বধূর অবস্থার কথা শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই একটা আঘাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন—"ও বৌমা, আমার অহিকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে?..."

"মা গো, রাখতে পারলাম না।"—বলিয়া গিরিবালা তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

—কান্না নামিল।

মায়ের আলোচনা হইলেই—বিশেষ ভাবেই হোক বা সাধারণ ভাবেই হোক, প্রথমেই কি করিয়া দুইটি ছবি শৈলেনের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—রুগ্ন অহি কোলে, তুলসীমঞ্চের মাটি খাওয়াইয়া মা এ-দিকে চোখ ফিরাইতেই মুখে অস্তমান সূর্যের রাঙা রশ্মি আসিয়া পড়িল। আর এই দৃশ্য—অহিকে লইয়া গেল, শুষ্ক উদাস দৃষ্টিতে মা চাহিয়া আছেন।

মা যেন আগে বেদনা, তাহার পর আনন্দ।

১১

নিস্তারিণী দেবীকে গঙ্গার তীরে মরিবার আশাটা আপাতত ত্যাগ করিতে হইল; শোকটা গিরিবালার এমন ভাবে লাগিয়াছে যে রীতিমতো চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। শরীর তো ভাঙিয়া গেছেই তাহার অতিরিক্ত নিজের উপর

কেমন একটা অবিশ্বাস আসিয়া গেছে যে, শাশুড়ি চলিয়া গেলে তিনি আর কোন ছেলেকেই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন না। শাশুড়ি দেখিলেন এটা তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার ভান মাত্রই নয়, সত্যই দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটা দেহের চেয়েও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ-ভাবটা না গেলে তাঁহার পাণ্ডুল ছাড়া চলিবে না।

এক হয়, বধূকে যদি বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তিনি সাঁতরায় ফিরিয়া যাইতে পারেন। এমন একটা শোকের পর করা উচিতও ব্যবস্থা, একটু অন্যমনস্ক করিয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার; কিন্তু এদিকে পাণ্ডুলের চাকরি লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, হঠাৎ কিছু যদি একটা হইয়া যায় তো আশ্চর্য নয়, এ-অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকাটা সমীচীন নয়। আরও একটা ব্যাপার হইয়াছে,—বিপিনবিহারী দ্বারভাঙ্গায় কয়েক বৎসর পূর্বে যে একটু জমি কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে ধীরে-সুস্থে দুইখানি ঘর তুলিতেছিলেন, এখন সাঁতরায় ছেলেদের পড়ার বন্দোবস্ত টিকিল না দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার কথা চিন্তা করিতেছেন। কি আকারে বন্দোবস্তটা করিবেন তাহারই খসড়া করিতেছিলেন, এমন সময় অহিভূষণ লইয়া এই বিপদটা আসিয়া পড়িল। সব ওলটপালট হইয়া গেল।

এই রকম অব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে দেখিতে চারিটা মাস কাটিয়া গেল, ক্ষেত্রের ফসল তুলিবার সময় আসিয়া পড়িল। কাজের তাড়া-হুড়ার মধ্যে গিরিবালার যেন একটু পরিবর্তন দেখা দিল, মনে হইল এই ঝোঁকে তিনি শোকটাকে কাটাইয়া উঠিবেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না, শোকটা ভিতরে যেন কোথায় ভাঙন ধরাইয়াছে। নিস্তারিণী দেবী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; মালা হাতে বধূর কাজে অল্প অল্প সাহায্য করিতেছিলেন, এবার তাঁহাকে সরাইয়া নিজকেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

কেমন একটা সময় আসিয়াছে, সব ব্যবস্থাই যেন উল্টাইয়া যাইতেছে বিপিনবিহারীর, সামনেও যেন একসঙ্গে অনেকগুলা বিপদের ছায়াপাত হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে ঠিক এ-ধরণের দুঃসময় আর আসে নাই। বড়ই ব্যাকুল উদ্বেগে দিন কাটিতে লাগিল।

মাসখানেক আরও গেল, তাহার পর হঠাৎ এমন একটা বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িল যাহা ছায়াপাতও করে নাই কিঞ্চিৎমাত্র: চণ্ডীচরণের রৈয়ামের চাকরিটি গেল। চাকরিটা কতকটা অস্থায়ী গোছেরই ছিল, কিন্তু বেশি

আশা ছিল সেটা পাকা হইয়া যাইবারই ; বরং পাণ্ডুলের চাকরির যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিপিনবিহারী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন গেলে ওইখানেই গিয়া উঠিবেন ; ওইখানেই সূত্রপাত হইল বিপদের।

কিন্তু সুদিনের আলোও দেখা দিল এই দুর্বিপাকের পিছনেই।

চণ্ডীচরণ আসিয়াছেন খবর পাইয়া বিপিনবিহারী একটু সকাল সকালই আফিস থেকে ফিরিলেন। পা যেন উঠিতে চাহিতেছে না। দুর্বল-চিত্ত আদৌ নন তিনি, কিন্তু বিপদটা ভাইয়ের উপর দিয়া আসিল বলিয়াই বেশ খানিকটা মুশড়াইয়া গেছেন। নূতন উদ্যম ভাইয়ের, উঠতির সময়ই এই আঘাত, কি করিয়া যে তাঁহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিবেন, কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবেন !....বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখেন চণ্ডীচরণ হরেনকে বুকের কাছে লইয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন, সামনে মা বসিয়া, দেয়াল ঘেঁসিয়া গিরিবালা দাঁড়াইয়া আছেন। কি একটা যেন হাসির কথা উঠিয়াছিল, সবার মুখেই তাহার জের লাগিয়া রহিয়াছে, চণ্ডীচরণের মুখটা একটু বেশি প্রদীপ্ত।

দাদা আসিতেই চণ্ডীচরণ নিজেকে সংযত করিয়া উঠানে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিপিনবিহারী একটা তেপাই টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, ভাইয়ের মুখের পানে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতেই চাহিয়া লইয়া চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ কি হোল ?"

"ঠিক বুঝলাম না দাদা, তবে বোঝবার চেষ্টাও করিনি। মনে হয় ভালোই হয়েছে।"

জ্যেষ্ঠ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি নিজে ছেড়ে দাওনি তো ?"

"না, ভালোই হয়েছে এই জন্যে বলছি যে নীলকুঠির অবস্থা দিন দিন কি হচ্ছে দেখতেই তো পাচ্ছি ; অথচ না ছাড়ালেই কামড়ে পড়ে থাকতে হোত ; তাও আবার রৈয়ামের মতো জায়গায়...."

জ্যেষ্ঠের নমিত মুখের পানে চাহিলেন, বিরক্তির লক্ষণ আছে কি না দেখিবার জন্য। কিছুই না দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন—"তাই বলছিলাম ভালোই হয়েছে, মা বৌদিকেও সেই কথাই বলছিলাম। আমার প্ল্যানও ঠিক হয়ে গেছে।"

ভাইকে অবসাদগ্রস্ত না দেখিয়া বিপিনবিহারী একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তবু যে একটু বিমূঢ় হইয়া না পড়িয়াছিলেন এমন নয়, প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করেছ ?"

"ছেলেদের দ্বারভাঙ্গায় পড়াবার জন্যেই তো বাড়িটা করেছেন আপনি ?—আমি সেইখানে গিয়ে ওদের ভর্তি করে দিয়ে বসি। তারপর সেইখান থেকে চাকরির চেষ্টা-চরিত্র করতে থাকি। আজকাল তো নানান দিকে সুবিধে দাদা—রেলের কত ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে, দুটো জেলা-কোর্ট রয়েছে, কত রকম ওপ্‌নিং ; আর রৈয়ামে পড়ে থাকলে...."

বিপিনবিহারী চাকরটাকে ডাকিতে তামাক দিয়া গেল। কিছু না বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে হুঁকা টানিতে লাগিলেন। এতগুলা কথার উপর কোন রকম অভিমত না পাইয়া চণ্ডীচরণ চুপ করিয়া গেলেন, বার-দুয়েক দাদার মুখের পানে আড়-চোখে দেখিলেন মাত্র। বিপিনবিহারীর মুখটা ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে ; এক সময় হুঁকাটা থামাইয়া বলিলেন—"মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না—বাবা এক সময় বলেছিলেন—বিপিন যদি কখনও মনে করে যে পাণ্ডুলের মতন ছোট জায়গায় পড়ে থেকে নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পাচ্ছে না তো ও বেরিয়ে পড়ে সেই ভালো, তাতে দুঃখ করবার কি আছে ?....আমার দ্বারা হোল না, কেন না হঠাৎ মারা গিয়ে আমার পথ বাবা নিজেই বন্ধ করে গিয়েছিলেন। আজ কিন্তু চণ্ডীর মুখে বাবার সেই কথা শুনে আমার বুকখানা দশ হাত হয়ে গেছে মা। একটা সুলক্ষণ যে আজ্ যে করেই হোক, তুমি রয়েছ সামনে, শুনলে বাবার মুখের কথাটা। ওকে আশীর্বাদ করো—নিজের নাম পর্যন্ত যারা ঠিক মতন বানান করতে পারে না সেই সব কুঠিয়ালদের দাবড়ানি ওকে যেন না সইতে হয় আর। অন্য যেখানেই চাকরি করবে—রেলেই হোক আদালতই হোক—ভদ্র, শিক্ষিত সমাজ পাবে। তার অভাবটা যে কি, বাবা অত প্রতিপত্তির মধ্যেও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন, চিরকালটা আপশোষ করে গেছেন এই নিয়ে, আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও।....চণ্ডীর কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে মা ! ও যদি না মুশড়ে পড়ে তো আমি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করি না।"

চণ্ডীচরণের ঐ একটু কথাতেই সমস্ত সংসারের উপর থেকে যেন একটা গুমোট কাটিয়া গেল। এই আকস্মিক আঘাতটা বিপিনবিহারীকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, ওঁর গতিবিধি পূর্বের চেয়েও সবল হইয়া উঠিল, বিপদের মুখে দৃষ্টি হইয়া উঠিল সতেজ, অবসাদমুক্ত। শুধু তাহাই নয়, চণ্ডীচরণ ভাইপোদের লইয়া খেলা—বই-পড়ার এমন একটা মাতন তুলিয়া দিলেন যে বাড়ির আবহাওয়াটাই বদলাইয়া গেল। সব

চেয়ে পরিবর্তন হইল গিরিবালার। শ্বশুরবাড়ির প্রথম সঙ্গী এই দেওরটির উপর বরাবরই তাঁহার একটু বেশি টান ছিল, কিন্তু বিবাহের সেই প্রথম বৎসরের পর আর এত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পান নাই; গল্পে, আলাপে, সেই প্রথম দিনের আলোচনায় তাঁহারও মনের অবসাদটা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল, অন্ততঃ এটা বেশ টের পাওয়া গেল যে ভিতরে যাহাই থাক, উপরটা বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে; চেহারাও অনেকটা ফিরিয়া গেল।

চাকরি-ক্ষেত্রেও বিপিনবিহারী এত দিন একটু সন্তর্পণে কাটাইতেছিলেন, সে ভাবটা ছাড়িয়া কতকটা বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন।

মোটের উপর চারিদিক দিয়াই জীবন যেন কতকটা স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। এই সময় আর একটি ব্যাপার হইল যাহাতে গিরিবালার মনটা শোকের প্রভাব থেকে আর একটু মুক্ত হইয়া উঠিল।

মাঘ মাস। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বিপিনবিহারী চণ্ডীচরণের সঙ্গে দ্বারভাঙ্গায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া এক্কা হইতে নামিতে চাকর খবর দিল একজন বাঙালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

প্রশ্ন করিলেন—"কখন?"

"আজ সকালে।"

"খাওয়া-দাওয়া করেছেন? দেখা-শুনো করেছিলি তো?"

"আজ্ঞে হ্যা।"

বৈঠকখানাটা একটু ঘুরিয়া গেলেন। দেখেন দাওয়াতে একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। সৌম্য কান্তি, শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথায় দীর্ঘ শুভ্রকেশ—কাঁধের উপর আসিয়া কুঞ্চিত হইয়া আছে। তবে সন্ন্যাসের কিছু দেখিলেন না। নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথা থেকে আসছেন?"

"আপাতত পশুপতিনাথ থেকে।"

এই সময় নেপালে পশুপতিনাথের মেলা হয়। যাওয়ার অথবা ফিরিবার পথে এক-আধ-জন যাত্রী এখানে এক-আধ-দিন আটকাইয়া যায়, ক্বচিৎ দু'-এক জন বাঙালীও থাকে।

বিপিনবিহারী সাধারণ আতিথ্যের ভদ্রতায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন রকম অসুবিধে হয়নি?"

"কিছু না; আপনি জামা-টামা ছাড়ুন গিয়ে।"

"হ্যাঁ, এসে আলাপ-পরিচয় করা যাবে; এখুনি আসছি।"

নিস্তারিণী দেবী ও-বাড়ি গিয়াছেন। বিপিনবিহারী প্রবেশ করিতে গিরিবালা বলিলেন—"বাইরে পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হোল ?"

"কোন্ পণ্ডিতমশাই ?"

"বেলেতেজপুরের।"

আজ প্রায় ষোল-সতের বৎসরের কথা, বিপিনবিহারী একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। "পণ্ডিতমশাই !"—বলিয়া তিনি যেমন ছিলেন সেই ভাবে ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন। একেবারেই ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আপনি ! আর আমি দিব্যি কাষ্ঠ-লৌকিকতা করে ভেতরে চলে গেলাম !"

পণ্ডিতমশাই উঠিয়া বিপিনবিহারীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—"দোষ হয়নি, কম দিনের কথা নয় তো। আমিও আত্মপ্রকাশ করলাম না, ভাবলাম আগে জামা-জুতো ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নেওয়াই ভালো। গিরি দিদিমণি বুঝি বলে দিলে ?"

"বলে দিতে যে হোল এর লজ্জা আমি কি করে ঢাকি বলুন ? কী যে মনে হচ্ছে আমার।...."

"অনেক দিন হোল, তায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, তার ওপর আমিও তোমায় একটু ধোঁকা দিলাম; আর সব চেয়ে ধোঁকা দিলেন বোধ হয় ইনি—সে সময় তো ছিলেন না"—বলিয়া নিজের দীর্ঘ শ্মশ্রুর উপর দিয়া একবার হাতটা টানিয়া লইয়া হো-হো করিয়া তাঁহার সেই পুরাতন হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিলেন বৈ কি, 'আপনি' বলে। ওটুকু যদি না করতেন তো বোধ হয় চিনে নিতে পারতাম।"

"যে-উদ্দেশ্যে করা সেটা তো দিদিমণি ফাঁসিয়ে দিলে। তা হোক, তুমি আগে জামা-জুতো ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসো, অনেক দূর থেকে আসছ ! তার পর ধীরে-সুস্থে গল্প হবে। উঃ, কত দিন পরে সে দেখছি তোমাদের, আর কী যে আনন্দ হোল ! ছেলে দু'টির সঙ্গে দেখা হোল না শুধু, দু'টো দিন বিলম্ব হয়ে গেল।"

"সে কি কথা পণ্ডিতমশাই ? দ্বারভাঙ্গায় নূতন একটু কুঁড়ে তুলেছি। আপনার পায়ের ধূলো দিতে হবে। আপনাকে পাওয়া—আমার এত বড় সৌভাগ্য বাড়ি বয়ে যখন এসেছে···"

প্রীতিভরে হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"তুমি তো সৌভাগ্যটা আসলে কার বুঝতে পারছ না বিপিন ভায়া। তা যাবো দ্বারভাঙ্গায়, পথেই তো পড়ে। তবুও তো একটু খুঁৎ থেকেই যাবে;—সেই কথাই বলছিলাম—মানে, তোমাদের সব 'ক'টিকে এক সঙ্গে দেখা আর আলাদা আলাদা দেখা...."

সামনের একটি চৌকিতে কম্বল পাতা থাকে, মুখোমুখি হইয়া বিপিনবিহারী তাহার উপর বসিয়াছেন। গোড়াতেই একটা ত্রুটি হইয়া যাওয়ায় একটু অনুশোচনায় মিশিয়া আনন্দটা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; বলিলেন—"আমি কালই সহরে লোক পাঠিয়ে দোব পণ্ডিতমশাই, সবাই একসঙ্গে পায়ের ধূলো নোব। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!—ভাবতেও পারিনি কখনও যে আপনি এতটা পথ বেয়ে দয়া করে আসবেন। এটা নিতান্ত পশুপতিনাথের পথ বলে...."

পণ্ডিতমশাই একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ভায়া, পশুপতিনাথ যদি মনের কথা না জানতে পারতেন তো ফাঁকি দিয়ে ও-পুণ্যটুকু নিয়ে নিতাম। কিন্তু তিনি যখন জানেনই সব তখন আসল কথাটা প্রকাশ করে বলাই ভালো,—তোমাদের উপলক্ষ্য করে পশুপতিনাথ দেখে গেলাম কি পশুপতিনাথকে উপলক্ষ্য করে তোমাদের দেখতে এলাম—কোনটে আমার আসল সে সম্বন্ধে ঠিক করে বলতে পারি না। আরও উদ্দেশ্য ছিল—পুণ্যভূমি মিথিলা দেখা—ন্যায়ের জন্মদাত্রী মিথিলা; আরও ছিল—বোধ হয় তুমি আন্দাজ করে নিয়েছ...."

বিপিনবিহারী বলিলেন—"হিমালয় দেখা।"

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটি ভাস্বর হইয়া উঠিল। বলিলেন—"ভায়া, কী অপূর্ব জিনিষই যে দেখলাম! কবিবরেরই কথা একটু অন্য অর্থে ব্যবহার করে বলতে ইচ্ছে করে—"সুখং নু দুঃখং নু বা"....অন্য অর্থে এই জন্যে বলছি যে দেখে এবং পেয়ে যতটা আনন্দ পেলাম তার চেয়ে দুঃখই হোল বোধ হয় বেশি—এই ভেবে যে সারা জীবনটা কি ধনে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।....বার্ধক্য এসে গেল; ঘোরবার ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, সব কমে এসেছে, এমন কি মনের বৃত্তিও নিস্তেজ হয়ে এসেছে, এই অসময়ে, শুধু মনের আপশোষ বাড়াবার জন্যে পশুপতিনাথ ডাক দিলেন...."

পণ্ডিতমশাই সদ্য-লব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে আস্তে আস্তে যেন লীন হইয়া গেলেন, কেহ যে কাছে আছে যেন ভুলিয়া গেছেন, মুখে একটা অস্পষ্ট

হাসির সঙ্গে একটা অতৃপ্তির আভাস লাগিয়া আছে, সামনের সন্ধ্যার পানে চাহিয়া আছেন।

বিপিনবিহারীর মনে পড়িয়া গেল—পণ্ডিতমশাই পণ্ডিত, ধার্মিক, সব কিছুই, কিন্তু সর্বোপরি তিনি কবি, ওঁর এই প্রকৃতিটি জীবনের আর সব স্তরকেই অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ওঁর ভাবের ঘোরে বাধা না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই পণ্ডিতমশাইয়ের মনটা ফিরিয়া আসিল। প্রশ্ন করিলেন —"তুমি যাওনি ওদিকে, নয়?....যেও, নিশ্চয় যেও।"

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই যে আমি নীলকুঠিতে কাজ করি।"

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"ও-কথা বললে শুনব না ভায়া, আমি তোমার মনের পরিচয় বহু দিন আগেই পেয়েছি। তোমার সেই হিমালয়ের বর্ণনা এখনও আমার চোখের সামনে যেন জ্বল-জ্বল করছে। বাঃ, তুমিই তো আমায় এ-পথের পথিক করেছ। না, যেও একবার নিশ্চয় ফুরসৎ করে..."

দিন পনের থাকিলেন পণ্ডিতমশাই। বহু দিন পরে বিপিনবিহারীর সংসারটি যেন চারিদিক্ দিয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল; মা আসিয়াছেন, ভাই ছেলেদের লইয়া দ্বারভাঙ্গা থেকে আসিলেন, তাহার উপর পণ্ডিতমশাই। আরও পূর্ণতা এই জন্য যে, পণ্ডিতমশাইকে কেন্দ্র করিয়া ছোট শিশু থেকে মা পর্যন্ত সবার রূপ যেন নূতন করিয়া ফুটিল। বিশেষ করিয়া মা'র—সাঁতরার ধর্মালোচনা লইয়াই থাকিতেন; শীতলা-তলা, গৌরাঙ্গের মন্দির, যাত্রা, কথকতা, গঙ্গাস্নান; কচিৎ বাহিরে এক-আধটা তীর্থ;—এখানে আসিয়া অন্তরে অন্তরে সে-সবের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, পণ্ডিতমশাই কতকটা পূরণ করিলেন। নিস্তারিণী দেবী ডাকিয়া শাস্ত্রালাপ শোনেন দুই বাড়ির বধূদের সঙ্গে লইয়া; কখন শাস্ত্রালাপ, কখন তীর্থভ্রমণ-কাহিনী; বিপিনবিহারীকে বলেন—"কী চমৎকার মানুষ বিপিন; একটু ভয় নেই, একটু ধর্মের ভান নেই, অথচ ধর্ম যেন উপচে পড়ছে ওঁর শরীর-মন বেয়ে! এমনটি তো আর কোথাও দেখলাম না।"

গিরিবালা যেন বর্তাইয়া গেছেন। কি করিবেন, কোথায় রাখিবেন্ যেন ভাবিয়া পান না। প্রয়োজন পণ্ডিতমশাইয়ের খুব অল্পই, গিরিবালা সব

আয়োজনই টানিয়া টানিয়া বাড়াইয়া যতটা সম্ভব তাঁহারই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পূজার ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতির বহর দেখিয়া পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলেন—"এ যে আমার ঠাকুরকে বিগড়ে দিচ্ছ দিদি ; ভবঘুরে মানুষ, নমো নমো করে খানিকটা করে জল দিয়ে ভুলিয়ে রাখি,—ধূপের জন্যেও জল দিচ্ছি, নৈবেদ্যের জন্যেও জল দিচ্ছি, আবার আহারের শেষে তাম্বুলের জন্যও এক আঁজলা জলই দিচ্ছি, আর তুমি এ যে…"

গিরিবালা বলেন—"তা হোক ঠাকুরদা', আপনি নির্লোভ মানুষ, আপনাকে তো লোভ দেখিয়ে টেনে আনবার জো নেই—এই তো আঠার বছরের মধ্যে একবার এলেন, তাই আপনার ঠাকুরকে লোভ দেখিয়ে রাখছি, তিনি যদি আনেন টেনে…."

সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ করেন—"তাও এলেন তো একলা, ঠাকুরমাকে কত দিন দেখিনি, আমার মুখ চেয়েও যে তাঁকে নিয়ে আসবেন….না ঠাকুরদা', আসছে বছর আনতেই হবে তাঁকে। মা আমার মুখে তাঁর সুখ্যেত শুনেই কতো দুঃখু করছিলেন। আর বাবার কথাও বলি ঠাকুরদা', একবারও কি আসতে পারতেন না ? আসলে গিরিকে আর মনে নেই কারুর…."

এই সময়টা একলা পাইয়া বেলেতেজপুরের কথাই হয় অনেকক্ষণ—সেই আগেকার বেলেতেজপুরের কথা, আর এখনকার বেলেতেজপুরের কথাও ঃ ভাইয়েরা সব শিবপুরে, বাড়িটা নিশ্চয় খাঁ-খাঁ করে….নিকুঞ্জ-জেঠাদের খবর কি ?….দুলাল বাগদিদের কোন খবর রাখেন ঠাকুরদা' ?…

পূজা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়া যায়। পণ্ডিতমশাই হাতে করিয়া আচমনের জন্য জল তুলিয়া লইয়া গল্পে অন্যমনস্ক হইয়া যান—দুলালের অবস্থাটা একটু ভালো, দু'টি ছেলে রোজগার করিতেছে, হোক ছোট জাত—বাপ-মায়ের উপর টান আছে দু'জনেরই—দুলাল অবশ্য এখন আর কিছু করে না, বয়স হইয়াছে, তায় বরাবরই একটু রুগ্ন ; এই পণ্ডিতমশাই বাহিরে, দুলালই এখন বাড়ি আগলাইতেছে…

গিরিবালা প্রশ্ন করেন—"আর ঠাকুরমা ?—তিনি তো রয়েছেন ঐখানেই ?"

পণ্ডিতমশাই হাতের জলটা ফেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—"মেয়েছেলে যে…."

সঙ্গে সঙ্গেই আবার গণ্ডূষের জন্য জল লইয়া অন্য কথা আরম্ভ করিয়া দেন —"হ্যাঁ, আসবার খুব ইচ্ছে ছিল, রসিকলালেরও, তবে সংসারী মানুষ…."

গিরিবালা বলেন—"আপনিও তো সংসারী মানুষ ঠাকুরদা'…."

পণ্ডিতমশাই হাতের জলটা ফেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—"তা তো বটেই, তবে কথা হচ্ছে....”

অভিমানে গিরিবালার মুখটি অন্ধকার হইয়া ওঠে, বলেন—"আসলে তা নয়, গিরিকে দু'জনেই ভুলে গেছেন ঠাকুরদা'....তা যান্, মেয়েকে নাতনিকে আর চিরদিন কে মনে করে বসে থাকে ?...নিকুঞ্জ জেঠার এ-পক্ষের ছেলেটি না কি নোকসান হয়ে গেল ঠাকুরদা ?”

কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এই রকম প্রসঙ্গে আসিয়া পৌঁছায়, পণ্ডিত-মশাই অস্বস্তি ভাবে আসনে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসেন, কুশি থেকে হাতে আবার গণ্ডুষের জল লইয়া তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন—"হ্যাঁ, বছর-খানেক হয়ে...”

"কেন যে আসে পেটে শত্রুরা...”

পণ্ডিতমশাই মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলেন—"শত্রুই বৈকি, ওদের কথা ভাবতে আছে ?”

সঙ্গে সঙ্গেই একটু জোর করিয়া হাসিয়া ত্বরিত ভাবে বলেন—"ও দিদি, ক'বার আচমনের জল নিয়ে ফেলে দিলাম বল দিকিন ? আমার ঠাকুর যে শুকিয়ে মরবেন !”

গিরিবালা হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"তা বটে ঠাকুরদা', তা তিনি বেলে-তেজপুরের কথা দেন কেন মনে করিয়ে বলুন ? কষ্ট দেওয়ার মতলব থাকলে নিজেও কষ্ট পেতে হয়।”

হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িয়া বলেন—"না, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে ঠাকুরদা', আপনি বসুন পূজোয় ; আমি যাই ওদিকে একটু।”

যাইবার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতমশাই বিপিনবিহারীকে বলিলেন—"বিপিন, তুমি আজ বাইরের ঘরেই শুয়ো, আমি একেবারে প্রত্যুষেই বেরুব, একরকম রাত্রি থাকতেই।”

"যখনই বেরুবেন ডেকে নেবেন পণ্ডিতমশাই। অবশ্য শোবার জন্যে বলছি না, কিন্তু মেয়েদের সবাইকে তো ডাকতেই হবে।”

"না, ওঁদের কাছে রাত্রেই বিদায় নিয়ে নোব ; আমায় এক রকম রাত থাকতেই বেরুতে হবে।”

কথার মধ্যে কি একটা ছিল, বিপিনবিহারী একবার মুখের পানে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

শেষ রাত্রে পণ্ডিতমশায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়াই কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেলেন—নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস হয় না; পণ্ডিতমশাই-ই, তবে আগাগোড়া একটা গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরা, মাথায় একটা ঐ রঙের পাগড়ি জড়ানো। সঙ্গে একটা বেশ বড় গোছের লাঠি আনিয়াছিলেন, তাহার উপর কম্বলটা পাট করা রহিয়াছে।

বিপিনবিহারীর ঘোরটা একটু কাটিলে পণ্ডিতমশাই অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন—"এ বেশে গিরি দিদিমণির সামনে দাঁড়ালে কান্নাকাটি করত, তাই ও-পাট কালই চুকিয়ে রেখেছি। এবার পশুপতিনাথ গিয়ে এই পথ অবলম্বন করলাম ভায়া,—আরও ঠিক করে বলতে গেলে এই আজ থেকে আরম্ভ হোল।"

বিপিনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"সন্ন্যাস নিয়েছেন?"

"ও-কথাটা মস্ত বড় কথা বিপিন। লোকে অবশ্য সন্ন্যাসীই বলবে, আমি কিন্তু নিজেকে বলি পরিব্রাজক মাত্র। সন্ন্যাসীরা চোখ বুজে যাঁকে খুঁজছে, আগে ঘুরে-ফিরে দু'চোখ ভরে তাঁর বাইরের রূপটা দেখি বিপিন—আশ মিটছে না, কী যে অপরূপ!....পশুপতিনাথ গিয়েছিলাম—দেখি, এক হিমালয় দেখতেই তো কত জন্ম কেটে যাবে—তার পরে তো তার স্রষ্টা....?"

আয়ত দৃষ্টিতে, গৈরিকমণ্ডিত দীর্ঘচ্ছন্দ শরীরে একটি প্রসন্নতা যেন ঝলমল করিতেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিপিনবিহারীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু—ইয়ে—ঠানদিদি, পণ্ডিতমশাই?"

পণ্ডিতমশাই দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিপিনবিহারীর মাথায় হাত দিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"দিদিমণির কাছে লুকিয়েছি, তাকে বড্ড ভালোবাসত কি না, দেখলাম একটা মস্তবড় শোক পেয়েছে....এ-শোকের বেগটা না কমলে আর তোমার দিদিমণির এ-সংবাদটা দিও না তাকে। আমার এ-বেশের কথা বোল না।...যখন বলবে তখন এটুকুও বলে দিও যে বাড়িটা দুলাল বাগদিকে দিয়ে এসেছি—আমার ও বড্ড সেবা করেছিল, তা ভিন্ন আমার শিষ্য আর শিষ্যকন্যার বড় প্রিয় ছিল পরিবারটা..."

শেষের কথা কয়টা বলিতে মুখটা হাসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনবিহারী একটু চকিত হইলেন, মনের দ্বিধাটা প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, পণ্ডিতমশাই তাঁহার মাথায় হাতটা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিতে করিতে বলিলেন—"বুঝেছি বিপিন যা বলবে। ওটুকুও যদি মন থেকে

সরিয়ে ফেলতে না পারব তো এ-পথে পা বাড়িয়েছি কেন? যদি কখনও হতে পারি সন্ন্যাসী তো বুঝব ঐখানেই ভগবান তার গোড়া-পত্তন করে-ছিলেন, ।....দুলাল অনেক ব্রাহ্মণের চেয়েই দানের উপযুক্ত পাত্র বিপিন—হোক না কেন তা ভদ্রাসনই—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বড় পবিত্র স্বভাব···নারায়ণ, নারায়ণ, মানুষকে জাতের জন্যে ছোট ভেবে তাঁর সৃষ্টির যেন অপমান না করতে হয় কখনও।...এবার সময় হয়েছে বিপিন, এসো আলিঙ্গনটা করে নি ; আমার গুরু এই গ্রামের শেষেই অপেক্ষা করছেন, এই পনেরটা দিন তাঁর কাছে ছুটি পেয়েছিলাম। হয়েছে, অত পায়ের ধূলোয় কি হবে?.... স্বস্তি—স্বস্তি!"

পথে নামিয়া আর একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না, দৃঢ়, ঋজু গতিতে সম্মুখের পথ ধরিয়া এক সময় একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বিপিনবিহারীর মনে হইল, প্রভাত সূর্যের একটি রশ্মি কক্ষচ্যুত হইয়া নামিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল।

১২

আফিসের ব্যাপারটা ক্রমে ঘোরালো হইয়া উঠিতে লাগিল। আমলাদের মধ্যে বরাবর একটা ঐক্য ছিল, ক্রমে সেটুকুও যাইতে বসিল। ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া ছোট সাহেব দু'-এক জন নিম্নস্তরের আমলাকে হাত করিল, এদিক'কার কথা ওদিকে পৌছিতে লাগিল, খিটিমিটি বাড়িতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় আরও বছর-খানেক টানিয়া-টুনিয়া গেল, তাহার পর, যে আগুন ধূমাইতেছিল, এক দিন সামান্য কারণেই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নীলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কুঠিতে আখের চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। চার্জে ছোট সাহেব। বিলাত থেকে একটা আখপেড়াইয়ের কল আসিয়াছে; কুঠি থেকে মাইল-খানেক দূরে সাগরপুর বলিয়া একটা জায়গা আছে, কলটা সেইখানে বসানো হইবে। কৈলাসচন্দ্র আফিসে কাজ করিতেছিলেন, ছোট সাহেবের আর্দালি আসিয়া বলিল—"বাবু, আধ সের তেল চাই, কলটা চালানো হবে।"

কৈলাসচন্দ্র একটু বিরক্তির সহিত কাজের মধ্য হইতে মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"তেল—তা এখানে কেন? গুদাম-নবিশের কাছে যা।"

"গুদাম-নবিশ আসেননি, তাঁর ছুটি!"

"কে দিয়েছে ছুটি ?"

"ছোট সাহেব।"

কৈলাসচন্দ্র একটু থতমত হইয়া রহিলেন, তাঁহার যেন মনে হইল ব্যাপারটা সাজানো, বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাজ নয়।"

আর্দালি গিয়া উত্তরটা জানাইতে ছোট সাহেব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবটা বেশ একটু চড়া, প্রশ্ন করিল—"তেল দেওয়া হয়নি কেন ?"

কৈলাসচন্দ্রও একটু রুখিয়াই বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাজ নয়।"

"গুদাম-নবিশ ছুটিতে থাকলে বড়-বাবু হিসেবে তুমিই ব্যবস্থা করবে না ?"

"তা করতে হলে গুদাম-নবিশ যে ছুটিতে সেটাও আমার জানা উচিত ছিল।"

"তোমার খোঁজ রাখা উচিত ছিল।"

"সে যে অনুপস্থিত আমার ভাববারই অবসর হয়নি, কেন না ছুটি চাইতে হলে তার আমার কাছেই চাইবার কথা।"

বেশ খানিকটা গরম-গরম আলাপ হইল, সুবিধা করিতে না পারিয়া সাহেব অযথাই তম্বি করিয়া চলিয়া গেল। ব্যাপার যে-রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা কিছু করা নিতান্ত দরকার, সকলেই আসিয়া কৈলাসচন্দ্রের টেবিল ঘেরিয়া দাঁড়াইল। স্থির হইল সকলের দস্তখতে একটা দরখাস্ত দিতে হইবে বড় সাহেবের কাছে।....দরখাস্ত লিখিয়া সবার দস্তখৎ করাইয়া তৈয়ার রাখা হইল। সবাই একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল—নিষ্পত্তিটা যাহাই হোক না কেন।

বৈকালে বড় সাহেব আফিসে আসিল, অন্য দিনের চেয়ে একটু বিলম্ব করিয়াই। নিয়ম-মতো কৈলাসচন্দ্র ক্যাশ-বুক প্রভৃতি তাঁহার খাতা-পত্র দস্তখৎ করাইবার জন্য লইয়া আসিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর সাহেবের মুখটা আজ। এই সময় দস্তখতের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিদিনের কাজ লইয়া কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হয়। আজ সাহেব একটি কথা বলিল না, বাঁ হাতের আঙুলে চুরুটটি ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ওলটানো পাতার উপর খস-খস করিয়া দস্তখৎ করিয়া যাইতে লাগিল—এই দস্তখতের শব্দ আর সেই রকমই শুষ্ক নিশ্বাসের আওয়াজ ঘরটার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।....ওদিকে আফিসের হলটাও একটা আসন্ন কিসের আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া আছে।

শেষ পাতাটির উপর দস্তখৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ খাজাঞ্চি কুলদীপ প্রসাদ

দুয়ারের পাশ হইতে বাহির হইয়া দরখাস্তটা সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে গেল।

সাহেব একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কুলদীপ প্রসাদ হাত হইতে দরখাস্তটা বোধ হয় ছাড়িবার পূর্বেই সেটা ছিনাইয়া, মুঠার মধ্যে দুমড়াইয়া তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া গর্জন করিয়া উঠিল—"বেরোও, বেরোও আমার সামনে থেকে, সব বেরিয়ে যাও—তোমরা দল বেঁধে কুঠির সর্বনাশ করতে চাও...."

সোজা না বলিলেও কৈলাসচন্দ্র এই অপমানসূচক হুকুমের মধ্যে পড়িয়া গেছেন, সংযত কণ্ঠেই বলিলেন—"আপনি অন্যায় করছেন আমাদের ওপর, ছোট সাহেবের...."

সাহেবের উগ্রতাটা সোজা আসিয়া কৈলাসচন্দ্রের উপর পড়িল, বলিল—"তুমিই যত নষ্টের গুরু, দল পাকিয়ে...."

কৈলাসচন্দ্রের কণ্ঠস্বরও কড়া হইয়া উঠিল, বলিলেন—"মিথ্যা অপবাদ দেবার আগে আপনি কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখবেন...."

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে—"হাউ ডেয়ার ইউ!...." বলিয়া কণ্ঠস্বর আরও চড়াইয়া তুলিতে বিপিনবিহারী এবং কৈলাসচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র জগদানন্দ হল্ থেকে বাহির হইয়া আসিলেন। জগদানন্দ নূতন আফিসে ভর্তি হইয়াছেন, কুস্তি করা শরীর, তেজী যুবক—জামার আস্তিনটা প্রায় গুটাইয়া রাখিতেন; বিপিনবিহারী একটা রুল লইয়া খাতায় লাইন টানিতেছিলেন, অনবধানবশতঃ সেটা হাতেই ছিল।....রুল আর আস্তিন-গোটানো দুইটাই আকস্মিক, সাহেব কিন্তু দেখিয়াই—"হামারা বন্দুক লে আও!"—বলিয়া নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়াইল।

কতকটা ভুলে, কতকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটা এক্তিয়ারের বাহিরে চলিয়া গেল, বন্দুকের নাম করিতেও—"লে আও তোম্‌হারা বন্দুক"—বলিয়া বিপিনবিহারী ও জগদানন্দ দুই জনেই অগ্রসর হইলেন। আফিসের সংলগ্নই সাহেবের বাংলো, সাহেব দ্রুত পা চালাইয়াই প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল; আর সব আমলারা আসিয়াই ইহাদের দুই জনকে ধরিয়া ফেলিল।

সেদিনকার নাটকে এখানেই যবনিকা-পাত হইল।

এর পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। আমলারা বিচারের জন্য উপরের কর্তাদের দ্বারস্থ হইলেন, অবশ্য খুব বেশি আশা না রাখিয়াই। আশঙ্কাটাই

ফলিল ; পাণ্ডুলের আফিস প্রায় এক রকম নূতন করিয়া গড়া হইল। পাণ্ডুলের প্রায় সত্তর বৎসরের জীবনের অবসান ঘটিল।

•

পাণ্ডুল।—এ-পরিবারের জীবনে মিথিলার এই সুদূর গ্রামটি বড় একটা পবিত্র স্মৃতি, প্রায়ই আলোচনা হয়, হইলেই সবার মন একটি সজল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া ওঠে। চলিয়া আসার স্মৃতিটি বড়ই করুণ। শৈলেনরা তখন দ্বারভাঙ্গায় পড়িতেছে, বিদায়ের অভিজ্ঞতাটা প্রত্যক্ষ করিতে পায় নাই ; মায়ের কাছে প্রায় গল্প শুনিত, কিছু কিছু বাবার কাছেও।—

চলিয়া আসিতে হইবে এ-কথাটা যেদিন থেকে পাকা হইয়া গেল, পাড়ায় যেন একটা চাপা হাহাকার পড়িয়া গেল। সত্তর বৎসর ধরিয়া "মধ্যু"-বাবুর এই দুই পরিবার সমস্ত পাণ্ডুলের প্রীতিই অর্জন করিয়া আসিয়াছে—এই দুইটি বাড়িতে যে আর কেহ আসিয়া থাকিবে এটা কেহ ভাবিতেই পারিত না। সমস্ত দিন বাড়ি পাড়ার বর্ষীয়সীদের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। এক দিন দুলারমনের ঠাকুরমা আসিলেন। আর এক রকম নড়িতেই পারেন না বলা চলে ; প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে—নিস্তারিণী দেবী সাঁতরা হইতে ফিরিলে একবার দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আর এই। লাঠি ধরিয়া, নাতির উপর ভর দিয়া আসিলেন, ধনুকের মতো বাঁকিয়া গেছেন, নিস্তারিণী দেবী তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া কম্বলে বসাইলেন! দুলারমনের ঠাকুরমা পরিশ্রমের জন্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন "দুলহীন, একবার বিপিনকে ডেকে পাঠাও।...এই সব দেখবার জন্যেই বেঁচে ছিলাম..."

বিপিনবিহারী আসিলে বলিলেন—"কাছে এসে বোস্ বিপিন।"

বিপিনবিহারী পাশে আসিয়া বসিলেন। ছোট ছেলেকে যেমন করে, বৃদ্ধা সেই ভাবে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন—হাঁপাইতেছেন, চোখে জল ঝরিতেছে —তাহার মাঝেই বলিলেন—"তোকে কোলের ওপর নিয়ে উঠোনের ঐখানটায় পা ছড়িয়ে ব'সে "উপটন" মাখাতাম—দুলহীনকে বলতাম—'ছেলের তোমার লোহার শরীর করে দোব, যত বিপদ, আপদ, কুনজর—গায়ে লেগে সব ছিটকে পড়বে,—আমি থাকতে থাকতেই সেই বিপিন পাণ্ডুল ছেড়ে চলল।...দুলহীন, কথা কইছ না যে তুমি ?"

কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নাই, এক বিপিনবিহারী ছাড়া ; কিন্তু তাঁহার অবস্থা সকলের চেয়ে আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখের জল ফেলার অভ্যাস

একেবারেই নাই—কোন অবস্থাতেই, কিন্তু আর সামলান যায় না। হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া শক্ত, অথচ এদিকে রগ দুইটা এত টন্‌টন করিয়া উঠিতেছে যে চোখের জলের লজ্জা আর বুঝি ঠেকাইয়া রাখা যায় না। অসহ্য অবস্থায় পড়িয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল—"দোস্ত আছ?

বিপিনবিহারী পরিত্রাণ পাইলেন—"ফণীন্দ্র এসেছ বুঝি?"—বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুলারমনের ঠাকুরমাকে বলিলেন —"পাণ্ডুল ছেড়ে গেলেও পাণ্ডুল কি আমায় ছাড়বে দাদী? তোমাদের টানে আবার কত বার···"

শেষ না করিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ফণীন্দ্র ঝা বাল্যবন্ধু, সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝার বংশের ছেলে; শান্ত প্রকৃতি, বেশি কথা কয় না, আড়ম্বর করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরেন নাই কখনও; কিন্তু বিপিনবিহারীর চেয়েও বিপিনবিহারীর কথা যে বেশি করিয়া ভাবেন অনেক বারই সেটা ধরা পড়িয়া গেছে। বাংলার মতো এখানেও পাতাবার রেওয়াজটা ছিল সে সময়, দু'জন পরস্পরকে ডাকেন "দোস্ত্" অর্থাৎ স্যাঙাৎ।

"দোস্ত্ হঠাৎ অসময়ে যে?"

ফণীন্দ্র ঝার এদেশী প্রথায় ত্রিকোচ্য করিয়া কাপড় পরা, বাঁ হাতে একটা কৎবেলের নস্যাধার, গায়ে এদেশী প্রথাতেই একটা চাদর জড়ানো, ডান হাতটা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। বিপিনবিহারীর প্রশ্নে একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বাঁ হাতের নস্যদানিটা আঙুল দিয়া দু'-এক পাক ঘুরাইলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না।

বিপিনবিহারী বলিলেন—"তা বোস', অসময়ে আসতে মানা আছে বলেছি না কি?···বরং এসে বাঁচিয়েছ আমায়—যা পাল্লায় পড়েছিলাম···"

চৌকিতে বসিতে বসিতে বলিলেন—"দাদী দেখা করতে এসেছে। বুড়িয়া এসেই কচি ছেলের মতন আমায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে সেই সব দিনের কথা—কবে কোল পেতে উপটন্ মাখিয়েছিল, কবে কি করেছিল।···যেতে হবে, মনটা আজ-কাল এমনই খারাপ থাকে, তার ওপর বিনিয়ে বিনিয়ে সেই সব পুরনো কথা—আমি ভাবছি দিলে বুঝি বুড়িয়া আমায় এই বুড়ো বয়সে কাঁদিয়ে—এমন সময় তুমি···"

ফণীন্দ্র ঝা বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলেন, কি যেন একটা চেষ্টা

করিতেছেন ভিতরে ভিতরে—আস্তে আস্তে ডান হাতটা বাহির করিয়া নেকড়ায় জড়ানো একটা কিসের তাল বিপিনবিহারীর সামনে চৌকীর উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটে রাখো দোস্ত্।"

বিপিনবিহারী গল্পের মধ্যেই হঠাৎ থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি এ দোস্ত্?"

ফণীন্দ্র ঝা যেন আরও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"তোমাকে হঠাৎ যেতে হচ্ছে—এই সময় আবার চণ্ডীরও চাকরীটা গেল—অবস্থাটা তো জানিই দোস্ত, কাকাজীর মৃত্যুর পর ভালো রকম সামলে উঠতেও পারনি—কিছু নগদ তোমার হাতে থাকলে হোত ভালো—তা আমার অবস্থাটা তো জানোই—পণ্ডিতের বংশের ছেলে, পুঁথিতে যদি কাজ হোত, এক সিন্ধুক সঙ্গে করে দিতাম…"

ফণীন্দ্র ঝা একটু হাসিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার আগের মতোই দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিলেন—"তাই এগুলো নিয়ে এলাম—আমি নিয়ে এলাম কি তোমার দোস্তের বৌ-ই গছিয়ে দিলে—খান-কতক রূপোর গয়না—এক-আধখানা বোধ হয় সোনার থাকতে পারে, দেখিনি অত—আমাদের সবই তো রূপোর গয়না, জানোই তো—আর অল্পই—এতে যে কি হবে—তবে আর তো নেই বিশেষ…"

বিপিনবিহারী সম্মোহিতের মতো বাণ্ডিলটার দিকে চাহিয়া আছেন। আজ যেন অশ্রুর লজ্জা হইতে পরিত্রাণ নাই-ই, কোন মতেই নাই, এক জায়গায় রেহাই দিয়া সে এক জায়গায় একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। বিপিনবিহারী বাধা দিবার কোন চেষ্টাও করিলেন না, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিলেন—"পাণ্ডুল থেকে শেষে আমায় এই বয়ে নিয়ে যেতে হবে দোস্ত্?"

ফণীন্দ্র ঝা যেন মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন, সমস্তটা সম্পূর্ণ ভাবে স্ত্রীর উপর চাপাইয়া বলিলেন—"আবার সামলে উঠলে তখন…আর মুস্কিল, তোমার দোস্তের বৌ কোন মতেই ফিরিয়ে নেবে না—মাঝে পড়ে আমি…আর তোমাকে যদি ওরা কখন আলাদা করে দেখত…"

বিপিনবিহারী চারিটা আঙুল বাণ্ডিলটার উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আর বলতে হবে না দোস্ত, এই আমি নিলাম; কিন্তু আপাতত তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে দাও গে; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দরকার যদি পড়ে আবার তাঁর হাত থেকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

আসিবার দিন সমস্ত গ্রাম যেন ভাঙিয়া পড়িল, শাম্পেনীতে উঠিলেন—হায়-হায়-এর সঙ্গে শুধু আশীর্বাদ—

গিরিবালা বলেন—"সবটাই খুব কষ্টকর, কিন্তু তার মধ্যেও তুলারমন আর খজনীর মুখ যেন মনে গেঁথে বসে আছে। আপনাদের বাড়ির চৌকাঠে ঠেস দিয়ে তুলারমন শাম্পেনীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু' হাতে আঁচল তুলে মুখের প্রায় সমস্তটাই ঢেকে ফেলেছে, চোখ দিয়ে জল উপচে উপচে পড়ছে। আঙুলের ওপর দিয়ে আমার পানে চেয়ে আছে—যেন যতটা পারে, যতক্ষণ পারে, দেখে নিতে চায়।

আর একটু এগিয়ে, শাম্পেনী থেকে অল্প একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে খজনী—কান্না নেই, কিচ্ছু নেই, ফ্যাল ফ্যাল করে আমার কোলে অরুর দিকে চেয়ে আছে—মুখ দেখলে মনে হয় তার যেন কিছুই রইল না জীবনে—যেন বুঝতে পারছে না কি হোল—যারা ছেড়েই যাবে তাদের জন্যে ও কেন এমন করে সব ছেড়ে দিয়ে বসল…"

দ্বিতীয় পর্যায়

১

কথাটা একটু উঁচুদরের দার্শনিকতার মতো শোনায়, কিন্তু সুখ-দুঃখ সত্যই আপেক্ষিক। এক সময় যাহা অশ্রু উদ্বেল করিয়া তোলে, তাহারই মধ্যে কোথায় যে আনন্দের, মুক্তির উপাদান লুকানো থাকে বোঝা যায় না। একদিন ভগ্নহৃদয়েই পাণ্ডুল ছাড়িতে হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল জীবনের সব সঞ্চয় বুঝি বিনষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু উত্তর জীবনে এইটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাণ্ডুল ছাড়াটা, জীবনের পূর্ণতর উপলব্ধির জন্য গিরিবালার প্রয়োজন ছিল। হয়তো সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু প্রবাসমাত্রেই জীবনকে খানিকটা পঙ্গু করে, আরও বেশি করিয়া করে যখন সে প্রবাসের অর্থ পাণ্ডুলের মতো একটা সঙ্কীর্ণ পল্লী জীবন। বাঙালী মেয়ের জীবন ছড়ায় সংসারের মধ্য দিয়া—স্বামী-পুত্র-কন্যা, স্বজন-পরিজন লইয়া এই গৃহস্থালীর সংসারটা তাহার জগৎ—বাইরের যে বড় জগৎ সেখানে সে চিরদিনই অসূর্যম্পশ্যা। সেই জন্য তাহার সংসারটি একটা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে পাতিতে না পারিলে তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয় না ; জীবনকে আরও পাঁচজন বড়, ছোট, সমকক্ষর সঙ্গে মিলাইয়া দেখা যায় না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বড় হইয়া থাকিলে মনে হয় দিব্য আছি, চরমে প্রতিষ্ঠিত আছি ; একটু নামিয়া গেলে মনে হয় অতলে ডুবিয়া গেলাম, আর উপায় নাই।

অবশ্য পাণ্ডুলের স্মৃতি চিরকালই মিষ্ট ছিল, খানিকটা কারুণ্যের সংযোগে আরও মিষ্ট—অহি, খঞ্জনী ; নূতন জীবনে বিদেশিনী সঙ্গিনী সব ; স্বজাতি-বিরহের মধ্যে দুইটি পরিবারের স্নিগ্ধ জীবন—এক অন্যকে পূর্ণ করিয়া ; তবু কিন্তু এক একবার এক ধরণের আতঙ্কের সহিতই পাণ্ডুল মনে পড়িত ; গিরিবালা হাসিয়া বলিতেন—"জেঠামশাই কী বনবাসেই পাঠিয়েছিলেন রে ! ঐখানেই যদি পড়ে থাকতে হোত !"

মায়ের প্রথম দ্বারভাঙ্গায় আসার ব্যাপারটা শৈলেনের বেশ মনে পড়ে। ওরা দুই ভাইয়ে কয়েক মাস হইতে দ্বারভাঙ্গায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে,—সাঁতরার মতো পাঠশালা বা মাইনর স্কুল নয়, একেবারে বড় হাই স্কুল না হোক, তবু হাই স্কুলের অংশ একটা, ছোট ছোট বাঙালী ছাত্রদের জন্য রাজের হাই

স্কুলের একটা শাখা। ক্লাসের সংখ্যা কম বলিয়া অল্প বয়সের ছাত্ররাও বেশ মাতব্বর। কত রকম কথা জানে, কত রকম নূতন ছড়া, সে সবের কি অদ্ভুত মানে!—পাণ্ডুলের কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারে না। একটা ছড়া রাজস্কুলের হেড মাষ্টারের টাক লইয়া। ফোর্থ ক্লাস, অর্থাৎ এখানকার সব চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র ঘোৎনা রচনা করিয়াছে। ঘোঁৎনা নিজেই কি একটা বিরাট ব্যাপার! তিন বছর এক ক্লাসে আছে—এক দিন থার্ড মাষ্টারের মুখের উপর বলিল—"আমার গোঁফ বেরিয়ে গেছে স্যার, বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বললে কথা রাখতে পারব না, বাবাও আমায় ঘোঁতন বলতে সুরু করে দিয়েছেন, ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে তো?"

—হেড মাষ্টার পর্যন্ত শুনিয়া চুপ করিয়া গেল।

পাঁচুর বাবার নাম শিবনাথ, কোন মাষ্টার অনুপস্থিত থাকিলে মাঝে মাঝে পড়াইতে আসেন, পাঁচু সোজা শিবুদা' বলিয়া ডাকে! শৈলেনের নিজের কানে শোনা, ওদের ক্লাসেই পড়ে পাঁচু। বলে—"পাড়ার সবাই ঐ বলে ডাকে, আমি তো তবু নিজের ছেলে রে!"

এ তো গেল স্কুলের কথা, তা ভিন্ন দ্বারভাঙ্গা সহর, রাজার জায়গা, প্রতি-নিয়তই সেখানে কত কি হইতেছে। বহু দিন আগে একবার শশাঙ্ক আর শৈলেন পাণ্ডুলে গিয়াছিল, তখন বাংলা স্কুলেও এত শেখে নাই, দ্বারভাঙ্গা সম্বন্ধেও এতটা জানিত না, তাইতেই এ-বাড়ির ও-বাড়ির সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিল, নেহাৎ জেঠামশাই, বাবা না হোক্ মা-জেঠাইমা পর্যন্ত তো নিশ্চয়। মা আবার জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া শুনিতেন, যেন তারাইয়া তারাইয়া।....সে গেল অনেক দিন আগের কথা, তাহার পর দুই ভাইয়ে আরও অনেক কিছু দেখিয়াছে, শিখিয়াছে, আরও বেশি করিয়া সহুরে হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে পাণ্ডুলের জীবগুলি আরও বেশি করিয়া হইয়া গেছে গেঁয়ো। একটা অদ্ভুত ধরণের অনুকম্পা লাগিয়া থাকে—ছোট ভাই-বোনদের উপর তো বটেই—মা, খুড়িমাও বাদ যান না—আহা, কত কম জানে!—পাণ্ডুলের মানুষ সে!—পাড়াগাঁয়ের!....শোনাবার পক্ষে মা যেন আরও ভালো। মা বড় বলিয়া শোনাবার সময় নিজেকে বেশি করিয়া বড় বলিয়াও মনে হয়।

সেই মা আসিতেছেন, খবর শুনাইবার জন্য দুই ভাইয়ে যেন রেষারেষি পড়িয়া গেছে।

দাদার মনেও যে এই একই প্রবাহ সে-খবর শৈলেন কতকটা আকস্মিক ভাবেই টের পাইল।—গুন্-গুন করিয়া গানের সঙ্গে হাতের-লেখা লিখিতেছিল,

শশাঙ্ক—“কি লিখছিস, দেখি”—বলিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, দু’একটা অক্ষর সম্বন্ধে এলোমেলো অভিমত দিয়া বলিল—“হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল,—মা এলেই শৈল যেন—‘শুনেছ মা, শুনেছ মা’—বলে তাঁকে উস্তমফুস্তম করে তুল না, তেতে-পুড়ে আসছেন একে।”

শৈলেন ঠিক না বুঝিয়াই হোক, বা কতকটা সন্দেহেই হোক, ঘুরিয়া দাদার মুখের দিকে একটু চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বিজ্ঞের মতো স্বরটা গম্ভীর আর হ্রস্ব করিয়া বলিল—“মা এলে তো আগে পায়ের ধূলো নোব।”

ঘুরিয়া আবার লিখিতে লাগিল।

একটু নীরবে গেল। তাহার পর শশাঙ্ক আবার গলাটা অভিভাবকের মতো করিয়া বলিল—“পায়ের ধূলো নিয়েই যত রাজ্যের গল্প এনে জড়ো করবে তো? জিরুতেও দেবে না একটু?....”

শৈলেন লিখিতে লিখিতেই একটু ভাবিয়া লইল, না ঘুরিয়াই উত্তর করিল—“জিগ্যেস করলে আমি কি করব? অবাধ্য হোতে পারি না তো?—গুরুজন....”

এবার শশাঙ্কর একটু চুপ করিয়া থাকিবার পালা গেল, তাহার পর কাঁধটায় ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—“আচ্ছা, সে আমি দেখে নোব’খন, জিগ্যেস না করলেই হোল তো?”

মন-জানাজানি খানিকটা হইয়াই গেল, আর ঢাকাঢাকি দরকার নাই। শৈলেন কলম ছাড়িয়া ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—“তুমি বুঝি আগে ভাগে বলে দেবে সব?”

শশাঙ্ক আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বরে বলিল—“আমি বড়ো, বাঃ!”

শৈলেন স্থির দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর “বেশ” বলিয়া আবার লিখিতে সুরু করিয়া দিল।

ছেলেবেলার এই “বেশ” কথাটা মারাত্মক; শশাঙ্ক খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—“বেশ” বললি যে, করবি কি তুই?”

“আমি যা বলবার বাবাকে বলব।”

তাহার মানে নালিশ,—দীর্ঘ ফর্দ আছে তাহার, ছেলেবেলার তো এবেলা-ওবেলা ফর্দ বাড়িয়া চলে। অবশ্য শৈলেনের বিপক্ষেও আছে—দীর্ঘতর, কিন্তু সে একটু গোঁয়ার গোছের, প্রহার-লাঞ্ছনাকে অতটা গায়ে মাখে না।....অনেক তর্ক-বিতর্কের পর একটা রফা হইল: কতকগুলা খবর শশাঙ্ক দিবে, কতকগুলা দিবে শৈলেন।—রাজের হাতি ক্ষেপিয়া মাহুতটাকে শুঁড়ে জড়াইয়া পায়ে করিয়া যে কিক্ করিয়াছিল—সে খবরটা দিবে শশাঙ্ক, তেমনি শৈলেনের ভাগে রহিল

ঘোঁৎনা—কপিরাইট গোছের—তাহার একটা গল্পও শশাঙ্ক মায়ের কাছে বলিতে পারিবে না। লাহেরিয়াসরাইয়ের সরকারি উকিলের বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথাটা বলিবে শশাঙ্ক, কলিকাতা হইতে কি কি জিনিষ আসিয়াছিল সে সমস্তই ; তেমনি রাজস্কুলে আগুন লাগার খবরটা দিবে শৈলেন—ধরো যদি ভুলিয়া বলিয়াই ফেলে সে তাহাতে দু'-একটা লোকও পুড়িয়া মরিয়াছিল তো শশাঙ্ক কিছু বলিতে পারিবে না, তাহার ভাগে তো খ্যাপা হাতির মাহুত পড়িয়াছে। ক্লাসে কে কে পড়ে, আর কে কি-রকম—সে নিজের নিজের। হেডমাষ্টার শশাঙ্কর, তেমনি সেকেণ্ড আর থার্ড মাষ্টার শৈলেনের ভাগে। রাজের ইন্দ্রপূজাটা লইয়া একটু গোল বাধিল। সে একটা বিরাট ব্যাপার ;—পূজা-অংশটা অনুষ্ঠিত হয় দেউড়ির ঠিক বাহিরেই—যাগযজ্ঞ, সাত-আট দিন ধরিয়া মেলা, কত দেশ থেকে কত রকম দোকান-পাট আমদানি হয়, কত নূতন ধরণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ; লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। তাহার পর বিসর্জনের অংশটা,—স্টেশনের কাছে, শৈলেনদের বাড়ির পাশেই বিরাট দীঘিটার চারি দিকে বাঁশ-বাঁখারির খিলান করিয়া তিন থাকে কাচের গেলাসের মতো এক-রকম প্রদীপ টাঙাইয়া দেওয়া হয় অজস্র, তাহাতে আবার রঙিন তেল দেওয়া ; রাস্তার দু'ধারে মিনাবাজার বসে, আর প্রশস্ত দীঘিতে অসংখ্য নৌকা—সাঁতরার গঙ্গার বড় বড় ভাউলিয়ার মতো—আলোয় আলোয় ছয়লাপ—নাচ-গান, আতসবাজি....দুইটা মিলাইয়া প্রায় এক পক্ষ ধরিয়া ইন্দ্রের আগমনে সমস্ত সহরটা যেন সত্যই অমরাবতী হইয়া ওঠে।...ও-সব না হয় হইল ; কিন্তু এই ইন্দ্রপূজার বর্ণনাটা কে দিবে মায়ের কাছে? এটা যার ভাগে পড়িবে দাঁড়ি-পাল্লাটা তাহার দিকে এমন ঝুঁকিয়া যাইবে যে সমস্ত ভাগ-বাঁটরা একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইবে। কাহিনীটাতে গাল ভরিয়া বর্ণনা করিবারও অনেক মাল-মসলা ; তা' ভিন্ন আর একটা মস্ত বড় লোভ—মা বেলেতেজপুরের সিংহবাহিনী পূজার কথা বলেন, মাকে স্বীকার করিতে হইবে দ্বারভাঙ্গারই জিৎ। এরা সব এখন দ্বারভাঙ্গারই মানুষ—মা বেলেতেজপুরের চেয়ে কত বড় জায়গায় এলেন এ কথা জানাইয়া দেওয়ার গৌরব অন্যের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে কি করিয়া?

শশাঙ্কর অঙ্কের মাথাটা ভালো, ব্যাপারটাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া সমস্যাটা মিটাইল—দেউড়ির অংশ আর দীঘির অংশ। লটারিতে দেউড়ির অংশটা শশাঙ্কের ভাগে পড়িল। একটু ক্ষুণ্ণ হইল মনে মনে,—শুকনো

ড্যাঙার মেলা বাচখেলার সামনে নিষ্প্রভই, একটু ভাবিয়া, আনন্দের একটা বুক-ভরা নিশ্বাস টানিয়া বলিল—"ভালোই হোল আমার।"

শৈলেন সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

"ভাসানের মেলা তো বাড়ির কাছেই হবে, মা দেখবেনই এই ক'মাস বাদে।"

শৈলেন বলিল—"আমি দেউড়িটা নোব।...

"শশাঙ্ক সহজে রাজি হইতে চাহিল না, তবে শেষ পর্যন্ত হইল রাজি, বলিল—"হাজার হোক তুই ছোট ভাই।"

কিশোর-মনের একটা প্রবণতা হিসাবে কথাগুলা মনে পড়ে, বেশ কৌতুক বোধ হয়; কার্যত কি গল্প বলা হইয়াছিল, কি হয় নাই অত মনে নাই। এটা মনে আছে যে, সত্যসত্যই কিছু বলা হয় নাই। বাড়ির নিচেই ছোট খালটি, বাঁশের পুলের উপর দিয়া দুই ভাই ওঁদের প্রতীক্ষায় রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইল, কাকা গেছেন স্টেশনে।...ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। নামিলেন সবাই; এরা মুখে অর্ধেক হাসি ফুটাইয়া আছে, ওঁরা কিন্তু সবাই বিষণ্ণ। শশাঙ্ক-শৈলেনের স্মরণ হইল—বিষণ্ণ হইবার তো কথা—মুখের ভাবটা বদলাইয়া লইল, বা আপনিই বদলাইয়া গেল। বোধ হয় গল্পের দুরদৃষ্ট দেখিয়াই দুই ভাইয়ে একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল।

বাবা, কাকা কেমন একটা ক্লান্ত অবহেলায় জিনিষ-পত্র নামাইতে লাগিলেন। ঠাকুরমা, মা, খুড়িমা বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তিন জনেই একটা একটা কি প্রশ্ন করিলেন—মায়ের কথাগুলা মনে আছে—"তোরা ভালো আছিস্ তো রে ?"—গলাটা একটু ধরা।

পুলটা পার হইয়া এদিকে পা দিতেই মা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আসিয়া একটু একলা পাইয়া শৈলেন খুড়িমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা কাঁদছেন কেন গা খুড়িমা ?"

খুড়িমার চোখ দুইটিও ভিজিয়া গেছে, আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন—"অহিকে যে আনতে পারলেন না, বাবা।"

এমন কিছু ব্যাপার নয়,—সবাই বিষণ্ণ ভাবেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, বেশির মধ্যে মায়ের চোখে না হয় দুই ফোঁটা জল। কিন্তু শৈলেনের বেশ মনে পড়ে ঐটুকুতেই সেদিন তাহাকে বেশ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। হইতে পারে যে ঐ অশ্রুর জন্যই অত আড়ম্বর করিয়া জমানো গল্প বন্ধ রাখিতে হইল বলিয়া ওর কিশোর-মন একটা ধাক্কা খাইয়াছিল, অন্য কিছুও হইতে পারে—ঠিক মনে পড়ে না, এখন শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে ঐ একরত্তি চোখের জলে মা সেদিন আর সকলের চেয়ে আলাদা হইয়া গিয়াছিলেন। মায়ের যেন একটা নূতন রূপ খুলিল যাহাতে শৈলেনের মনটা একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে ভরিয়া রাখিল। ঠাকুরমা, বাবা, খুড়িমা—কেহই দূরে গেলেন না, তবে মা যেন পূর্বের চেয়ে আরও অনেক কাছে আসিয়া পড়িলেন।....ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না ; ঐ বিস্ময়ের পাশেই কখন বিষাদ আসিয়া জড়ো হইল ; চিররুগ্ন, ম্লানদৃষ্টি অহির জন্য বুকটা টন্-টন্ করিতে লাগিল। অর্থাৎ মায়ের চোখের জলে বাড়ির হাওয়ায় যে একটা করুণ সুর উঠিয়াছে, শৈলেনের সমস্ত মনকে সেটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছেলেবেলার মন, অহেতুকী তাহার গতি, সবচেয়ে আশ্চর্য এই হইল যে এই বিষাদই এক সময় একটা অকারণ অভিমানে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বিষণ্ণভাবে এদিক্-ওদিক্ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে শৈলেন খালের ওপারে একটা নির্জন জায়গায় গিয়া বসিল।.... সে যেন মরিয়া গিয়াছে, অহির মতো ; তাহার পর কত কি হইয়া গেল, পাণ্ডুল ছাড়িয়া আজ যেমন সকলে দ্বারভাঙ্গায় আসিয়াছেন, তেমনি দ্বারভাঙ্গা ছাড়িয়া আবার যেন অনেক দূরে কোন্ এক জায়গায় গিয়াছেন,....সকলেই আছে, শুধু শৈলেন নাই। সবাই নূতন ঘরে উঠিল, বিষণ্ণ, শুধু মায়ের চোখে দুই বিন্দু জল চক-চক করিতেছে—শৈলেনকে যে আনিতে পারিলেন না তিনি !.... নির্জনে বসিয়া শৈলেনের চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল, ঠোঁট দুইটি বার-দুয়েক থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।...কিসের থেকে যে কি হইয়া যাইত ছেলেবেলায় !

অবশ্য সমস্ত স্মৃতিটা যে এই রকম করুণ তা নয়। অনেকক্ষণ গুমরিয়া গুমরিয়া, একটু রাত হইতে যখন ঘরে আসিল দেখে একটা আলোর সামনে বসিয়া শশাঙ্ক প্রবল উৎসাহে ইন্দ্রপূজার বাচখেলার গল্প বলিয়া যাইতেছে—মা, খুড়িমা, হরেন, চাঁদু—মা আবার শুনিতেছেন সব চেয়ে যেন বেশি আগ্রহের সহিত, শশাঙ্কর পিঠে ডান হাতটা, ঘাড়টা তাহার পানে ফিরানো, মুখে একটু একটু হাসি।

শৈলেনের মনটা আবার একটা ধাক্কা খাইল,—বাঃ তাহার এমন চমৎকার গল্প বলিবার সন্ধ্যাটা তা'হলে শুধু শুধুই তো বেশ নষ্ট হইয়া গেল!

মনটা দাদার উপর আক্রোশে-মিশান, এক-রকম ঈর্ষায় আর মায়ের অদ্ভুত আচরণের জন্য নিরাশায় সে কি উৎকট ভাবেই ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে কথাও খুব স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে।

২

দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হইল। প্রথমেই মনটা এখানকার বাড়ির বড় বড় জানালা দেখিয়া যেন প্রসার লাভ করিল।....পাণ্ডুলের সেই ঘুলঘুলি, সেই উগ্র অবরোধ,—গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে মনটা হাঁপাইয়া উঠিলে, অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বাইরের জগতের সামান্য একটু পরিচয় লাভ,—গুটিকতক গাছ, মাঠের একটা ছোট্ট ফালি, চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ আকাশের একটুখানি নীলিমা,—সব একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।....এখানে বড় জানালার কাছে দাঁড়াইলে একটা গোটা দিকের প্রায় সমস্তটা ধরা দেয়। তা' ভিন্ন তাহাতে কত বিচিত্রতা! বাড়ির প্রায় গা ঘেঁসিয়াই খালটা—এখানে বলে নহর। নিতান্ত অপরিসর, কিন্তু সেই জন্য আরও চমৎকার লাগে। শ্রাবণের শেষ। নদীতে একটা বন্যা আসিয়াছে, নহর বহিয়াই তাহার জল একটি সংযত স্রোতে চলিয়াছে দীঘিটার পানে—ও-দীঘির পর আর একটা দীঘি, তাহার পর আর-একটা।...চণ্ডীচরণ বলিলেন—"বৌদি, দীঘি-পুকুর দেখতে হয় তো দ্বারভাঙ্গা; তুমি বর্ধমানের গল্প কর, কাছে ঘেঁসতেই পারে না। একদিন গাড়ি করে তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসব, তখন বলবে!"

নহরের পরে অল্প একটু জমি, মাঝখানে একটা পুরানো ইঁদারা। তাহার পরেই আবার একটু খানা-গোছের, নহরে আর সেটার মাঝখানের জমিটুকুকে যেন একটা ছোট্ট দ্বীপ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরই প্রশস্ত টানা রাজপথ, সব মিলিয়া বাড়ি থেকে হাত কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই। রাস্তাটা গাড়ি-ঘোড়া আর নানা রকমের মানুষে সদাই গম-গম, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে বলিয়া বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বসিয়া বসিয়া দেখা যায়।

আসিবার তৃতীয় দিনের কথা,—গিরিবালা রান্নাঘরে ছিলেন, ছোট জায়ের ডাকে ঘরের জানালার সামনে আসিয়া একেবারেই একটা নূতন জিনিষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।—সামনে আর পিছনে দুই জন করিয়া চারি

জন ঘোড়-সওয়ার—চামড়ায়-পিতলে ঝকমকে সাজ ঘোড়ার—লাল, মোটা বনাতের ওপর জরির কাজকরা পোষাক ঘোড়সওয়ারের। মাঝখানে আরও অপূর্ব ব্যাপার—মখমলের সাজপরা, মাথায় সামলা দেওয়া, ষোল বেয়ারার একটা পালকি, মখমলের উপর অজস্র সাঁচ্চার কাজ-করা তাহার ঘেরাটোপ, দুই দিকে চার-পাঁচ জন করিয়া নানা রঙের কাপড়-পরা দাসী, দুই জন ঘেরাটোপের গায়ে রূপায় বাঁধানো চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে চলিয়াছে, বাকি কাহারও হাতে সোনা-রূপার গঙ্গাযমুনী ঝারী, কাহারও হাতে রূপার পানবাটার মতো কি, প্রায় সব হাতই রূপার মোটা মোটা গহনায় ঝলমল। দুই জায়েই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন ছেলেমানুষ হইয়া গেছেন—রূপকথার খানিকটা জীবন্ত হইয়া সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

শশাঙ্ক স্কুলে যাইবে, ভাত চাহিতে আসিয়া মা-খুড়িমার অবস্থা দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার গুমরে মনে মনে ফুলিয়া উঠিল। বাহিরে নিতান্ত অবহেলার সহিত চাহিয়া দেখিয়া বলিল—"রাণী দেখছ বুঝি?—আমাদের স্কুলের কাছ দিয়ে তো রোজ মন্দিরে যান।"

রাজধানীর বড় রাস্তা, সাধারণে—অসাধারণে মিশানো নিত্য এই জনস্রোত; একটু মনটা চঞ্চল হইলেই গিরিবালা একবার জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়ান। রাজপথের পরে একটা আমবাগান, তাহার পরই গাড়িতে-ইঞ্জিনে গমগম দ্বারভাঙ্গার প্রকাণ্ড রেল-স্টেশনের প্রাঙ্গণ। নিজ্ স্টেশনটা একটু ওদিক্ পানে বলিয়া যাত্রীর কোলাহলটা অত কানে আসে না—শুধু গতিশীল জগতের একটি পরিপূর্ণ রূপ চোখের সামনে সদাই নিজেকে মেলিয়া ধরিয়া থাকে। পাণ্ডুলের মতো অসহায় মনে হয় না, মনে হয় না যে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আছি—সে যে এক কি অসহ্য মনের ভাব!

ছোট-জা একদিন কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"দিদি, পাণ্ডুলের সম্বন্ধে অবিশ্যি বলতে নেই একথা—বাবা পাণ্ডুলেই এসেছিলেন তো—তবু ধরো দ্বারভাঙ্গাতেই যদি এঁদের ভালো কাজ হয়, এখানেই যদি থাকতে পাই আমরা…"

অনেক দিন পরে এই ধরণের একটা মনোভাব গিরিবালার মুখেও প্রকাশ পাইয়াছিল, সামান্য উপলক্ষ্যেই। একটা ছোটখাট কি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে; শশাঙ্ক প্রথম স্থান পাইয়াছে—মাকে আসিয়া খবর দিল। গিরিবালা স্থির নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"হবিই তো, তোদের বিকাশ-মামার আশীর্বাদ, তোরা বড় জায়গায় বড় হবি ব'লে ভগবান আমাদের এনেছেন এখানে দেখছিস না?"

সত্যই, পাণ্ডুলের চেয়ে এখানে মনের আশাও বড় হইয়াছে ; সবার আশীর্বাদ ফলুক এখানে—জেঠামশাই, বাবা, পণ্ডিতমশাই, কাতু মাসি, বিকাশ দাদা—সবার প্রাণ-ঢালা আশীর্বাদ ; যাহাদের লইয়া জীবন তাহারা এইখানে বড় হইয়া গিরিবালার জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলুক।

জায়গার মতো মানুষের সঙ্গেও পরিচয় হইতে লাগিল। আসিবার দ্বিতীয় দিনের কথা : সন্ধ্যা হইয়াছে, জিনিষ-পত্র এখনও সব গোছানো হইয়া ওঠে নাই, নিস্তারিণী দেবী ঘরের মধ্যে সেই কাজেই ব্যাপৃত আছেন, গিরিবালা শাঁক বাজানো শেষ করিয়াছেন, এইবার ধুইয়া তুলিয়া রাখিবেন এমন সময় সদর দোর বাহিয়া জনচারেক স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক জন বর্ষীয়সী, বিধবা, সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যতটা বোঝা গেল বেশ টকটকে রং, কাঁচি দিয়া ছাঁটা চুল কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাকি দুই জনের মধ্যে এক জন প্রায় গিরিবালার মতো, এক জন বছর কয়েকের ছোট হইবেন। একটি ছোট মেয়ে, বছর বারো কি তেরো বয়স। পাণ্ডুলের কড়া পর্দার অভ্যাসে এদেশে ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক ঠেকিল যে গিরিবালা যেন মূঢ়ের মতো ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। অদ্ভুত অভ্যর্থনা দেখিয়া উঁহারাও একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন, বড় দুই জনের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত ছোট তিনি হঠাৎ দুই পা বাড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—"মুখফোড় বলে আমার বদনাম আছেই, রাগ করবেন না বৌদি, আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের দূর থেকে দেখেই বুঝি আপনি শাঁক বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু এখন দেখছি...."

দলের মধ্যে অল্প একটু চাপা হাসি উঠিল। ততক্ষণে গিরিবালারও সম্বিৎ হইয়াছে, শাঁকটা তুলসীমঞ্চের উপর রাখিয়া আগাইয়া গিয়া বলিলেন—"আসুন, আসুন।"

বর্ষীয়সী এবং তাঁহার অপর সঙ্গিনীকেও বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া, ছোট মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"এসো মা।"

একটু লজ্জায় পড়িয়া গেছেন, জড়িত কণ্ঠে আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বর্ষীয়সী বলিলেন—"ননীর কথায় কেউ কান দেয় না মা, কিছু মনে করো না। শাশুড়ি কোথায় ?"

যাঁহাকে ননী বলা হইল তিনি ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিলেন—"বুদ্ধিমান হলেই দেয় কান ; নইলে তো এতক্ষণ ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকতেন হাঁ করে।"

এবার সকলে একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, তাহারই মধ্যে গিরিবালা বর্ষীয়সীকে বলিলেন—"মা ঘরেই আছেন, ডেকে দিই।"—বলিয়া একটু পা

চালাইয়াই ভাঁড়ার-ঘরের পানে চলিয়া গেলেন, এবং তখনই একটি কম্বল হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনারা বসুন, মা এলেন বলে।"

বারান্দায় কম্বলটা বিছাইয়া দিলেন।

ওঁদের বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তারিণী দেবী হাত-পা গামছায় ভালো করিয়া মুছিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুলের অভ্যাসে ওঁরও একটু আড়ষ্টভাব, বর্ষীয়সীই বলিলেন—"আমরা এলাম আপনাদের এখানে বেড়াতে।"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বড় আহ্লাদের কথা; আমরা আপনাদের আশ্রয়েই এসে পড়েছি।"

সঙ্গিনী তিন জনকে প্রণাম করিবার আদেশ করিয়া বর্ষীয়সী বলিলেন—"বিদেশে সবাই আমরা পরস্পরের আশ্রয়।...চণ্ডীর মুখে, আপনারা এসেছেন শুনে কাল ভাবলাম যাই, সন্ধ্যের পরে একটু আটকে গেলাম—পোড়া জায়গায় দিনমানে তো আর বেরুবার জো নেই, পর্দা নষ্ট হবে! আর, এটুকু পথ গাড়ি করে আসাও চলে না।"

প্রণামের পালার মধ্যে গিরিবালা একটু ফাঁপরে পড়িয়াছেন। এঁরা ব্রাহ্মণ না কি? বধূর অস্বস্তির ভাবটা বুঝিয়া নিস্তারিণী দেবীও কি করিয়া তথ্যটা সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"বৌদি, মা আমাদের বামুনেরই মেয়ে।"

সবাই একসঙ্গে একটু হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালা তাড়াতাড়ি নত হইয়া পায়ের ধূলা লইলেন, বর্ষীয়সী আশীর্বাদ করিয়া নিস্তারিণী দেবীর দিকে একটু চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দেখলেন তো?—মুখে একটু যদি আগল থাকে, আমাকে পর্যন্ত বাদ দেয় না।"

পরিচয় হইল। এঁরা এখানকার পুরানো বাসিন্দা। যেমন হিসাব পাওয়া গেল, মধুসূদন যে-সময় পাণ্ডুলে আসেন ইঁহার স্বামীও প্রায় সেই সময় বরাবর দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং চাকরি ও সেই সঙ্গে নানা রকম কারবার করিয়া এই সহরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বছর দুয়েক হইল তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে, এখন বড় ছেলে কারবার দেখেন। তিনি ছাড়া আরও তিনটি ছেলে, তাহারা লেখাপড়া করে, খবর পাওয়া গেল একটি শশাঙ্করই সহপাঠী। গল্পচ্ছলে যতটা পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে নিস্তারিণী দেবী আর গিরিবালা বুঝিলেন, সহরে এঁদের বেশ প্রতিপত্তি আছে, বাঙালী সমাজে তো বটেই, তাহার বাহিরে

পর্যন্ত। কথাবার্তার মধ্যে চমৎকার একটি মার্জিত রুচির ছাপ, বর্ষীয়সীর তো বটেই, বাকি তিন জনেরও। তিনটির মধ্যে বড়টি পুত্রবধূ, মাঝেরটি কন্যা, এবং ছোটটি দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার কন্যা; সম্বন্ধে নাতনি। পুত্রবধূটি বৌ-মানুষ বলিয়া একটু স্বল্পবাক্, ছোট মেয়েটি নেহাৎই ছোট, ঠাকুরমার গা ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল! মেয়েটি কথাবার্তায়, গতিবিধিতে একটু মুক্ত, একটু বেশি রহস্যপ্রিয়ও!...বাঙালীর মেয়েছেলে পথ বাহিয়া দেখা করিতে আসিল দেশের মতোই—গিরিবালার শুধু যে ভালোই লাগিতেছিল এমন নয়, আশ্চর্যও বোধ হইতেছিল। এঁদের মুখেই শুনিলেন অনেক বাঙালী পরিবারের কথা—দূরের কথা আলাদা, তবে পাড়ার মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া-আসা আছেই। বর্ষীয়সী একটু দুঃখ করিয়া বলিলেন—"তবে ঐ সন্দের পর। দেশের মতো দুপুর হোল, কি বিকেল হোল, একবার কাছে-পিঠে থেকে বেড়িয়ে এসে মনটা হালকা করে এলাম সেটি হবার জো নেই। নেহাৎ গায়ে-গায়ে বাড়ি হোল, চোরের মতন এদিক ওদিক দেখে ছুট করে যদি চলে যেতে পারা গেল তবেই; কী কঠিন পর্দা দিদি, বোলো না আর; কত পাপেই যে বিদেশে বুড়ো বয়স পর্যন্ত ক'নে বোয়ের মতন কাটাতে হোল...."

কতকটা যেন আপনা-আপনিই গিরিবালা শাশুড়ির পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বৌমার আমার পাণ্ডুলের কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এইতেই দুঃখু করছেন, সে-পর্দা যদি আবার দেখতেন!"

ননীবালা বলিলেন—"আমরা কিন্তু মার মতন অত মানি না জেঠাইমা।"

বর্ষীয়সী বলিলেন—"তোরা মানিস্ না, তোদের মানায়; তোরা হলি এখানকার ঝিউড়ি মেয়ে, এখানেই জন্ম, এখানেই সব। বুড়ো হলেও আমরা তো বউই এখানকার, বলুন দিদি?"

ননীবালা নিজের ভাজের পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"বৌদিদিও মানেন না।"

তিনি শঙ্কিত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, এমন কথা বলো না ঠাকুরঝি! আমি আবার কবে না মানলাম?"

"এই যে বেড়াতে এলে, সন্ধ্যেই হোক, আর যাই হোক, বৌ-মানুষ তো?"

"ওমা, এ তো মার সঙ্গে এসেছি!"

"শুনছ মা নিজেই এখনও বৌ-মানুষ।"

সকলেই এক-সঙ্গে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বর্ষীয়সী হাসির মধ্যেই অনেকটা ক্লান্তভাবে বলিলেন—"পারি না আর তোর জ্বালায়। চোপোর

দিন এই করছে দিদি, আর বলবেন না। অত কথা কি, আপনাদের বাড়িতে এই প্রথম এলো, ঢুকতে না ঢুকতেই বৌমার সঙ্গে...”

ননীবালা বলিলেন—“তোমারই বৌমা, আমার তো বৌদিদিই।”

“তা’ বলে প্রথম সম্ভাষণেই ঠাট্টা করতে হবে ?”

“ননদ হয় ঠাট্টা করে, নয়ত কোঁদল, কোনটে ভালো হোত বল না ?....শুনুন্ জেঠাইমা, এতগুলি লোক বাড়িতে ঢুকলাম, বৌদি কোথায় এসে ‘আসুন বসুন’ বলে খাতির করবেন, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কোঁদলের ব্যবস্থাই তো ? সে জায়গায় যদি কোঁদল না করে ঠাট্টা করে থাকি....তাহলে তো দেখছি আসাই মুস্কিল....”

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—“না মা, তুমি সর্বদাই এসো আর নিজের ভাজ জেনে কোঁদল-ঠাট্টা যখন যা খুসি তাই কোরো ; একটি নয়তো, দু’টি ভাজ তোমার এখানে, বিদেশে পাড়াগাঁয়ে থেকে ওঁরা যে কী মানুষ-ক্যাংলা হয়ে গেছেন !”

আরও খানিকক্ষণ গল্পের পর উঁহারা ঘর-দুয়ার আসবাব-পত্র দেখিয়া ইঁহাদের যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় গিরিবালা একটু একান্তে পাইয়া ননীবালার হাত ধরিয়া বলিলেন— “খুড়িমা হুট বলতেই আসতে পারবে না, আপনি কিন্তু আসবেন ভাই।”

ননীবালা গলা নামাইয়া বলিলেন—“আমার কি অসাধ ? কিন্তু যম যে এখানেই।”

নূতন সম্পর্কে ননদ-ভাজের মধ্যে একটু হাস্যবিনিময় হইল, গিরিবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিলেন—“সে তো ভালো কথাই আরও, তিনিই পাইক হয়ে আসবেন, নিয়ে যাবেন।”

উঁহারা চলিয়া গেলে গিরিবালা বলিলেন—“কী চমৎকার মানুষ সব, না মা ?”

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—“হ্যাঁ, ভালোই মনে হলো তো, দিব্যি মিশুকে, মেয়েটিও বেশ হাসিখুসি।”

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—“তাহলে আমরা কবে যাবো মা ওঁদের বাড়ি ? বলে গেলেন যেতে...”

নিস্তারিণী দেবী বধূর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন, ‘মা’ শব্দটার

উপর ঝোঁক দিয়া বলিলেন—" 'আম্—রা' !···একটু সবুর করো মা, সহরের চাল কি অত তাড়াতাড়ি ধরতে আছে ?···আমার মালাছড়াটা এনে দাও তো ।"

মালা দিয়া আসিয়া গিরিবালা জাকে বলিলেন—"শুনলি তো ছোটবৌ ?··· আমাদের আবার সহরে বাড়ি হওয়া ! পাণ্ডুল মজ্জায় মজ্জায় সেঁধিয়ে রয়েছে ।"

ছোটবৌ বলিলেন—"উনি আবার ওখানে চুল পাকালেন। ভাগ্যিস চুল কাঁচা থাকতে থাকতেই আমরা চলে আসতে পেরেছি !···না দিদি, পাণ্ডুল মাথায় থাকুন, পাঁচটা লোকের মুখে পাঁচ রকম কথাও তো শুনতে পাব এখানে ? তা' ভিন্ন আমি তোমার মত অত মুশড়ে পড়িনি ।"

বড় জায়ের মুখের পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিলেন। গিরিবালা রহস্যটা ভেদ না করিতে পারিয়া বলিলেন—"বুঝলাম না···"

"ঐ ননী ঠাকুরঝি ;—ও-কি না টেনে নিয়ে গিয়ে ছাড়বে ভেবেছ নাকি ? ···মার কোন জারিজুরিই খাটবে না—আমার কথা লিখে রাখো····"

সেই রহস্যপ্রবণ নাছোড়বান্দা মেয়েটির সামনে শাশুড়ির অসহায় ভাবটা যেন উপলব্ধি করিয়া দুই জনে কৌতুকরঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

৩

এক-একটা অলস অবসরের মধ্যে তবুও পাণ্ডুলের জন্য মনটা হু-হু করিয়া ওঠে, চারিদিকে চারটি মাটির ঘর দিয়া ঘেরা সেই ক্ষুদ্র জগৎটি, মাঝখানে প্রশস্ত উঠান, এক পাশে তুলসী-চবুতরা—বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্র চালের উপর, ও-বাড়িতে যাওয়ার পথে সজনে গাছটির উপর পড়িয়া ঝিলমিল করিতেছে, দাওয়ায় মা ঠাকুরঝির চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন, নিচেই পাড়ার মেয়েরা—পড়াউয়ের বৌ, শনিচ্রার বোন, দুখনার খুড়ি—তাহাদের সব কথাতেই একটা বিস্ময়ের ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিয়া গল্প—"আই হে দুলহীন !—শুনলিয়েই ?" ····হয়তো দুলারমন বসিয়া আছে সামনেই—সেই ছেলেবেলার দুলারমন—হাস্যময়ী—পড়াউয়ের বৌয়ের কথার উপর একটা ঠাট্টার কথা বলিয়া হাসিতে যেন উল্টাইয়া গেল।····আহা, দুলারমন—যা অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন ! আর খজনী ! ওঁরা সব কত করিয়া বলিলেন, কিন্তু আর আসিতে চাহিল না।

একটি সখীর মতোই পাণ্ডুল যেন সারা অঙ্গে জড়াইয়া আছে। নিজেদের আলাদা করিয়া ভাবা যায় না।···কে আছে সেই বাড়িতে এখন ? কাদের

কণ্ঠস্বর ? ঘরে, দাওয়ায়, উঠানে কি রকম সব পায়ের আঘাত পড়িতেছে ?—কি রকম শিশুর কলহাস্য ? কাহারা আসে যায় ? দুলারমন আর আসে না কি ? খজনী কি আবার নবাগতদের শিশুর ভার লইল ?....না খজনী আর শিশু ছুঁইবে না বলিয়া শপথ করিয়াছিল,—আসিবার এক দিন আগে অরুকে খুব করিয়া একবার বুকে চাপিয়া গিরিবালার কোলে ফিরাইয়া দিয়াছিল—চোখ ডব ডব করিতেছে—বলিল—"আর আমি বাচ্চার মায়ায় কখনও ভুলব না গো দুলহীন—বড্ড বেইমান—বড্ড বেইমান।...." ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। গিরিবালা বলিলেন—"পরের ছেলেই তো ? তুই এবার সংসারী হ' খজনী—নিজের খোকা মানুষ কর।"...."নেই হে দুলহীন !"—বলিয়া যেন কত আতঙ্কেই খজনী সেই যে পলাইল, আসিল তাহার পর দিন একেবারে যাত্রার সময়—শাম্পেনী থেকে খানিকটা দূরে আতাগাছের তলায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের প্রাণ দিয়া গিরিবালা এই ইচ্ছা-বন্ধ্যা খজনীর মন বুঝিতে পারেন,—ছেলেরা বেইমানই—সত্যই তাহারা যে কত বেইমান হইতে পারে !....অহির কথা মনে পড়ে—মায়ের বত্রিশ নাড়ীর অত দরদ—সবইত ভুলিল সে ?—শেষ পর্যন্ত সব পাণ্ডুলই অহি ময় হইয়া রহিল তাঁহার কাছে। গিরিবালা চোখ মোছেন—ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন—কেহ আসিয়া পড়িল না তো ? শুধু দুঃখের পাণ্ডুলই পড়ে মনে, তাই যেন ভালো লাগে আরও বেশি করিয়া। পাণ্ডুল যেন জায়গা নয়, বাড়ি নয়—যেন একজন কে—অভিমানে মুখ ভার করিয়া আছে।

।

তবুও দ্বারভাঙ্গা ধীরে ধীরে পাণ্ডুলকে চাপা দিয়া ফেলিতে লাগিল। পাণ্ডুলে প্রথম প্রথম আসার কথা মনে পড়ে—চারিদিকেই অপরিচয়, চারিদিকেই বিধি-নিষেধ, দিন দিনই মনটা যেন নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। দ্বারভাঙ্গা সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার আগ্রহে ও আশায় মনের দল যেন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

ওঁরা শ্রাবণ মাসে আসিলেন, আশ্বিনের শেষাশেষি পূজা আসিয়া পড়িল। এখানে বারোয়ারি দুর্গাপূজা নাই, তবুও পূজার যে সাড়াটা পড়িয়া গেল, ওঁদের অন্তঃপুর পর্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল। আরও একটা ব্যাপার—সে রকম ব্যাপার বোধ হয় কুড়ি বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। অষ্টমীর দিন গেলেন প্রতিমা দেখিতে। ঘোড়ার গাড়ি করিয়া যাইতে যাইতে সে যে কী

আগ্রহ ! অনেকটা যেন শিশুর কৌতূহলের সঙ্গে পরিণত বয়সের ধর্মভাব মিশিয়া গিয়াছে। গাড়ি হইতে যখন নামিলেন মনে হইল কি যেন এক নূতন লোকে আসিয়া গেছেন।—সামনেই বর্ষার জলে কূলে-কূলে ভরা বাগমতী নদী—উত্তর হইতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া আসিয়া মন্দিরের সামনে খানিকটা বিস্তার লাভ করিয়া আবার লীলায়িত গতিতে দক্ষিণের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ওপারের ভাঙা তটের উপর আম-বাগান, কাশবন, গাছে-লতায় ঢাকা এক-আধটা ঘর ; এপারে ছায়াবৃত কাঁচা ঘাট, তাহার পরেই নানাবিধ দোকানের সারি, তাহার পরেই মন্দির। নানা রকম নানা বয়সের মানুষ, মেয়ে, বেটা-ছেলে ; মাঝে মাঝে বাঙালীর মুখ দেখা যায়, পরিচিত, আবার অপরিচিতও। গাড়ি থেকে নামিয়া চারিদিকে একবার বিহ্বলভাবে চাহিয়া গিরিবালা কতকটা যেন ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"হ্যাঁ মা, এই নদীতেই নাইব তো ?" এত বড় সৌভাগ্যটা যেন কল্পনাতেই আনিতে পারিতেছেন না।

চাপা-গলায় একান্তেই বলিলেন, কিন্তু চণ্ডীচরণের কান এড়াইল না, হাসিয়া বলিলেন—"না, বেলেতেজপুরের গোঁসাই-ঠাকুরুণের জন্যে একটা আলাদা আসবে।....ইস্টিশনের রেলগাড়ি না কি বৌদি ?"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"পাণ্ডুলে যা হয়েছিল বাবা, বিশ্বাসই করতে পারছেন না।"

সমর্থন পাইয়া গিরিবালা চাপা-গলায় বলিলেন—"নদীতে নাওয়া সেই সাঁতরায় মা, শৈলেন কোলে।"

বাইরের মাটির প্রতি কণাটি মাড়াইয়া যেন নদীতে নামিলেন। স্নান হইল খরধার, মুক্ত স্রোতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া ;- ডুব দিয়া দিয়া আশ আর মেটে না। এদিক্‌টা সব মেয়েই, বেশ মুক্ত দৃষ্টিতেই সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চারিদিকের পূর্ণতার ছোঁয়াচেই মনটা যেন কিসে পূর্ণ হইয়া গেছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সেই বহুপূর্বে সাঁতরার গঙ্গায় প্রথম স্নান। এটা হয়তো অত বড় কিছু নয়, তবুও বয়সের, অভিজ্ঞতার পরিণতিতে, তাহার উপর বোধ হয় দিনটির মাহাত্ম্য-অনুভূতিতে আজও যেন একটা নূতন কি উপলব্ধ হইল,—নদীর স্রোতে জলের আর এক উচ্চতর স্তর সৃষ্টি করিয়া যেমন বান ডাকে সেই রকম গোছের।....সবাই উঠিয়া আসিয়াছে, গা মুছিতেছে, বেটা-ছেলেদের কাপড় ছাড়া পর্যন্ত হইয়া গেছে, গিরিবালা তখনও জলে—স্রোতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সামনের পানে চাহিয়া আছেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"কবির মেয়ে, টেনে না তুললে উঠবে না চণ্ডী,

ব্যবস্থা কর।” চণ্ডীচরণের আদেশে হরেন গিয়া ডাকিল—“মা, তোমার হোল না?”

যাহাকে মন্দির বলা হইয়াছে, সেটি মন্দির গোছের কিছু নয়, খুব বড় একটা চৌকো ঘর। মাঝখানে বড় একটি বেদীর উপর শ্যামা মূর্তি। শ্যামাই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সমস্ত এই দেবভূমিটুকুর নাম কালী-স্থান। জনশ্রুতি এই যে, কোন বাঙালী তান্ত্রিক এইখানে কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, পরে দ্বারভাঙ্গারাজ দেবীর জন্য এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বাংলার মতো মিথিলাও তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্র; রাজপরিবারের কুলদেবীই কঙ্কালী কালী।

স্থায়ী মূর্তি কালীই, তবে নবরাত্রে এখানে মাটির প্রতিমা গড়িয়া দশভুজার ব্যবস্থা আছে। তাহার জন্য কালী মন্দিরের পাশেই অনুরূপ আর একটি ঘর আছে, অপেক্ষাকৃত ছোট। দেশের মতোই ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূজার জন্য নৈবেদ্য মাল্য কিনিয়া, প্রতিমা দেখিয়া, একটা মাটির পুতুলের সামনে দাঁড়াইয়া দর করিতেছেন, সামনে দুইটা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং ননীবালা, তাঁহার জননী ও আরও অনেকে অবতরণ করিলেন। নজর পড়িতেই ননীবালা হন হন করিয়া আগাইয়া আসিয়া গিরিবালার হাতটা ধরিয়া বলিলেন—“বাঃ, কি চমৎকার! তোমরাও এসেছ?”

মাঝে আরও কয়েক বার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, হৃদ্যতা বাড়িয়াছে।

গিরিবালা বলিলেন—“আমাদের তো হয়েও গেল, ফিরতি।”

“ফিরতি বললেই শুনছি কি না; চলো আর একবার ঠাকুর দেখে আসবে।” বলিয়াই ননীবালা “ঐ যাঃ!”—বলিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া হাতটা একটু উঁচাইয়া অমনি সতর্কতার ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন যে, গিরিবালাকে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে হইল—“কি হোল?”

“ঠাকুর দেখবার কথাটা মুখ দিয়া হঠাৎ বেরিয়ে গেল কি না—ভয় হচ্ছিল ‘যাব না’—না বলে বসো আবার।”

ফিকির দেখিয়া দুই জায়েই হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা পাশেই শাশুড়ি এবং অল্প দূরে স্বামি-দেবরকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—“নিজের হাতে তো নয় ভাই।”

“ও, এই কথা? জেঠাইমা তো আমার হাতে—নিস্তারিণী দেবী পাশে একটা দোকানে তুলসী কাঠের মালার দর করিতেছিলেন, ননীবালা কাছে গিয়া বলিলেন—“বৌদিদের আমরা একটু নিয়ে যাই জেঠাইমা; আমরা এই এলাম।”

"আমাদের তো হোয়ে গেছে দেখা মা, ফিরছি যে এবার।"

দুই জায়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। ননীবালা বলিলেন—"আর কিছু না, দেখাটা হয়ে গেল বৌদির সঙ্গে, এখন মনটা এই দিকে পড়ে থাকবে, পূজোর ব্যাঘাত হবে, সঙ্গে সঙ্গে থাকলে আর সেটুকু...."

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে নিয়ে যাও।"

গিরিবালা বলিলেন, "তোমরা তো দেখছি স্নান করে এসেছ...."

ননীবালা জ্রযুগল কপালে তুলিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়, না হলে তোমায় ছুঁতে সাহস করি?"

ভিড়ের মধ্যে সকলেই সম্ভব-মত সংযত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"আমি তাই বললাম? দেখো তো মা। বললাম, নাওয়াটা সারা হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

নিস্তারিণী দেবীকেও আবার যাইতে হইল; ননীবালার মা সবাইকে গুছাইয়া লইয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গিনী হিসাবে তাঁহাকেও টানিলেন। নিস্তারিণী দেবী পুত্রের পানে চাহিতে বিপিনবিহারী বলিলেন—"হয়ে এসো তাহলে, আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি।"

পাশেই মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন, উঁচু দেয়াল দিয়া ঘেরা খানিকটা বাগান গোছের; প্রতিমা দর্শন করিয়া সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। জায়গাটায় পুরুষ মানুষ কেহ যায় না, স্ত্রীলোকেরাই বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করে, নিজেদের মধ্যে দেখা-শোনা আলাপ-আলোচনা হয়। সেইখানে অনেকগুলি নূতন বাঙালী-পরিবারের সঙ্গে দেখা হইল, ননীবালা, তাঁহার জননী এঁদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। দ্বারভাঙ্গা সহর দ্বিধা বিভক্ত, এক নিজ দ্বারভাঙ্গা, অন্যটি লাহেরিয়াসরাই,—আদালত, কাছারি সব সেইখানেই—অনেকগুলি উকিল, মুন্সেফ, ডেপুটির পরিবারের সঙ্গে জানা-শোনা হইল। কয়েক জনের গায়ে একেবারে আধুনিক গহনা পরিচ্ছদ; কেহ বেশ গায়ে পড়িয়া ভাব করে; কেহ একটু গম্ভীর, একটি অপরিস্ফুট হাসির সঙ্গে নিজের বিভিন্নতাটুকু বজায় রাখিতে চায়। একজন ননীবালার বোধ হয় বেশি পরিচিত, গিরিবালার পরিচয় করাইয়া দিতে একটি ভঙ্গি সহকারে বেটাছেলের মতো হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, ভ্রূ কপালে তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"এখানকার পাড়াগাঁয়ে সতের-আঠার বছর কাটিয়েছেন আপনি! এখানকার সহরে-সহরেই আট বছর কাটল—ভাগলপুর, ছাপরা, গয়া, ডুমকা—তবু বছরে অন্ততঃ বার তিনেক কলকাতায় না গেলে হাঁফ ধরে যায়!"

হাসিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটু কি মিশাইয়া চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া গিরিবালার পানে চাহিল, যেন অদ্ভুত কি দেখিতেছে।

একটু সরিয়া আসিয়া ননীবালা একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"দেখে নাও বৌদি, পাণ্ডুলে পড়ে থাকলে এ জিনিষ দেখতে পেতে? আমাদের দ্বারভাঙ্গা একটি চিড়িয়াখানা।"

গিরিবালা একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"আস্তে ঠাকুরঝি, শুনতে পাবেন।"

"বয়ে গেল? শুনতে পাওয়ার জন্যেই তো বলা। মানুষের মতন একটু আলাপ কর, না, 'কলকাতায় না গেলে হাঁপিয়ে উঠি।' কেউ আর মুন্সেফের বৌ হয় না; কলকাতাতেই পড়ে থাকে!"

একটি বর্ষীয়সীর আবার কেমন করিয়া গিরিবালাকে চোখে লাগিয়া গেল। পরিচয় প্রসঙ্গে বার-বারই তাঁহার মুখের পানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া লইয়া কখনও ননীবালার মা, কখনও নিস্তারিণী দেবী, কখনও বা ননীবালাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কত রকম মন্তব্য করিতে লাগিলেন—পাঁচটি ছেলের মা?···কোলে একটি মেয়ে?—বড় আদরের বোন হবে···· সাঁতরায় এদের বাড়ি? ও মা, সে যে খুব সমাজ জায়গা গো···এক এক জনকে দেখলেই কেমন একটা আহ্লাদ হয়, মায়া বসে যায়—যায় না? —আপনার বৌটি সেই রকম দিদি····বেশ লক্ষণমন্ত বৌ····একবার আমাদের ওখানে নিয়ে আয় না এঁদের সবাইকে ননী, দোষ কি? আমার বৌমা দেখলে বর্তে যাবেন; নতুন পোয়াতি, আসতে পারলেন না তিনি! তিনিও এই রকম শান্ত-শিষ্টটি কি না—বর্তে যাবেন একেবারে····"

ননীবালা বলিলেন—"কিন্তু আমি সে একেবারেই শান্ত নয়, ঢুকতে দেবে কেন?"

সকলের মধ্যেই একটা হাসি পড়িয়া গেল। বর্ষীয়সী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোন কথা ননীর! অথচ সে-বেচারি ননী-ঠাকুরঝি বলতে অজ্ঞান। যাবি, নিশ্চয় যাবি শীগ্গির।"

আবার, থিয়েটার আসিতেছে, দিন পনের পরেই; বাঙালীদের কালীপূজার বারোয়ারিতে।

জীবনের গতি বড় বিচিত্র, মানুষ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক এক সময়

নিজের বয়স ছাড়িয়া দশ-বারো বছর আগাইয়া যায়—হয়তো আরও বেশি। তেমনি আবার পিছাইয়াও যায়—প্রৌঢ়া হয় তো হইয়া পড়ে একেবারে কিশোরী···থিয়েটার আসিতেছে, গিরিবালা ছোট্ট মেয়ের মতোই উদ্বেগ লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ও-জিনিষটা তাঁদের জীবনে দেখা হয় নাই। যাত্রা অপেরার অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর, থিয়েটার বাদ পড়িয়া গেছে; ওঁদের ছেলেবেলায় ওটা এখনকার মতো গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে নাই। তাহার পরই পাণ্ডুল—সেখানে যাত্রাই বলো, অপেরাই বলো, থিয়েটারই বলো – সেই এক নটুয়া ?

অবশ্য আগ্রহটা বাহিরে বাহিরে প্রকাশ করেন না, তবে ছেলেরা যখন গল্প করে, সীন-সীনারির বর্ণনা দেয়, হাতের কাজ ভুলিয়া আগ্রহভরে শোনেন।

শৈলেনের এখনও মনে পড়ে—মা ছিলেন একেবারে আদর্শ শ্রোত্রী। রান্নাঘরের এক দিকে বসিয়া ওরা তিন ভাইয়ে আহার করিতেছে, শৈলেন বলিতেছে—"নীরোদ বাবুর জনার পার্ট দেখো, কাঁদিয়ে যদি না ছাড়েন তো আমায় তখন বলো। ইস্কুল থেকে আসবার সময় রোজ রিহার্সেল শুনছি····আর সে গান! দাদা, যখন সেই 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর' গানটা গান!···"

গিরিবালা পিঁড়ির উপর বসিয়া একটি ঈষৎ-হসিত উৎসুক দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া আছেন, তরকারি দিয়াছেন, খুন্তিটা হাতে রহিয়াই গেছে, প্রশ্ন করেন—"খুব মিষ্টি গলা বুঝি ?"

শশাঙ্ক গম্ভীর ভাবে বলে—"কলকাতার দানীবাবুর নাম শুনেছ ?"

শোনেন নাই বলিয়াই প্রশ্ন। গিরিবালা মানিয়াও লন, বলেন—"পাণ্ডুলে পড়েছিল তোদের মা, শুনবে না ?····খুব ভালো গাইতে পারে বুঝি দানীবাবু ?"

একটা বেশ কৌতুককর ব্যাপার চলিতে থাকে, বেশ চমৎকার। মা হইয়া গেছেন ছোট, অভিজ্ঞতায় ছেলেরা হইয়া গেছে বড়; ছেলের থাকে দর্প—সে যে বেটাছেলে, অনেক দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, পড়িয়াছে; মায়ের মুখ থাকে একটা অদ্ভুত ধরণের হাসি। ছেলে যদি বুঝিত তো দেখিত সেটাও একটা প্রসন্ন দর্পেরই। ছেলের কাছে পরাভবই যে মায়ের বিজয়!

গিরিবালার প্রশ্নে শশাঙ্ক একটু হাসিয়া শৈলেনের দিকে চায়, নিরীহ ব্যঙ্গের স্বরে বলে—"দানীবাবু গাইতে পারে! শুনে রাখ রে শৈলেন!"

মায়ের দৃষ্টির সে-অমৃত শৈলেন এখন বোঝে। লজ্জিত হইবারই কথা তো? কিন্তু ছেলেদের পানে চাহিয়া একটা অপূর্ব শান্ত হাসিতে মুখটা আলো

হইয়া গেছে, বলিতেছেন—"ঠাট্টা রাখ বাপু, মা জানে না বলেই তো জিজ্ঞেস করেছে, তোরাও যেন জন্মেই এতটা বড় হয়েছিস্, এত দেখেছিস, এত শুনেছিস্ !....ছাখো না !...."

যাহা বহু প্রত্যাশিত তাহা যখন আসিয়া পড়ে, তখন অধিকাংশ স্থলেই নৈরাশ্য বহন করিয়া আনে। থিয়েটার সম্বন্ধেও তাহাই হইল। যাহাকে ছেলেরা স্টেজ বলিতেছে সেটার একটু নূতনত্ব আছে বটে, তবে আরও উঁচুদরের কিছু আশা করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েক বিষয়ে যেন বিসদৃশ ঠেকিল,—নদীও গুটাইয়া যাইতেছে, পাহাড়ও গুটাইয়া যাইতেছে, ঘর-বাড়িও গুটাইয়া যাইতেছে। একবার একটা যুদ্ধের দৃশ্যে, মৃত সৈন্যেরা মাটিতে পড়িয়া আছে, হঠাৎ মাঝে একটা প্রকাণ্ড রাস্তা সমেত দুই সারি চারতলা পাঁচতলা বাড়ি হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল ; অপঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কয়েক জন মৃত সৈন্যকে তাড়াতাড়ি বাঁচিয়া উঠিয়া সরিয়া পড়িতে হইল।...উপর থেকে মুড়ি ছড়াইয়া বৃষ্টি দেখানো হইল। প্রথমটা একটু লাগিয়াছিল ধোঁকা, কিন্তু হঠাৎ স্টেজের মধ্যে থেকেই কাহার একটা কালো বিলাতি কুকুর চেনশুদ্ধ ঢুকিয়া পড়িয়া সেগুলা খুব ব্যস্তভাবে খুঁটিয়া বেড়াইতে থাকায় একটা উগ্র রকম গোলমাল বাধিয়া গেল। যাহার কুকুর সে স্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া চেন ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—এদিকে প্রেক্ষাগার হইতে কতকগুলো দুষ্টু ছেলে "টমি-টমি" বলিয়া চিৎকার করিতে কুকুরটা দোটানায় পড়িয়া প্রবল আপত্তিসূচক নানা রকম ডাক শুরু করিয়া দিল। "ড্রপ ফেল্, ড্রপ ফেল্" করিয়া একটা শব্দ উঠিল, সামনের পট'টা মাঝ পর্যন্ত নামিয়া আটকাইয়া গেল, তাহার পর দুইবার ঝাঁকানি খাইয়া নামিয়া আসিয়া কুকুরের ব্যাপারটা চাপা দিল। এদিকে উগ্র হাস্যের গোলমাল আর ওদিকে স্টেজে কথা-কাটাকাটি, আহত কুকুরের কাতরানি—এই সব মিলিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা তুমুল বিশৃঙ্খলা লাগিয়া রহিল। ননীবালা গিরিবালার পাশেই বসিয়াছিলেন, উগ্র হাসিতে নিজের পেট'টা চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি এই জন্যেই আরও আসি বৌদি, ভূ-ভারতে আর কোথাও এত হাসির খোরাক জোগাতে পারে না....ওঃ—বাবা গো !—কুকুরে বিষ্টি খাচ্ছে !....মুড়ির কথা কার পোড়া মাথায় ঢুকল বল তো !....কী, না, জলের মতন চকচক করতে করতে পড়বে ; বাবাঃ, এতও জানে !....তাও, মুড়ির কথা ভাবলি তো কুকুরটার কথাও ভাব—ওঃ !...."

—হাসিতে দুইজনে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

যাই হোক্, রাতটা গোলমালে কাটিল মন্দ নয়। লাভের মধ্যে লাভ—আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল; একটা জায়গা থেকে অপরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গিয়া বেশ একটি নিজস্বতার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, আর ভালো-মন্দ সব কিছুর উপরই একটা দরদ আসিয়া পড়িতেছে। লাহেরিয়াসরাই হইতে একটি পরিবার দেখিতে আসিয়াছিল, একটু নাক সিঁটকাইয়া বলিল—"পোড়া কপাল! এই দেখতে আবার তিন মাইল পথ বেয়ে এলাম।"

পাশাপাশি দুইটি সহর—ভাব-আড়ি দুই-ই আছে; ননীবালা মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া চিপটেন কাটিলেন—"এর চেয়েও খারাপ হয় বলে আমরা দ্বারভাঙ্গা ছেড়ে অন্য কোথাও যাই-ই না।"

গিরিবালা একটু অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিলেন। থিয়েটার ভাঙিয়া গেলে বলিলেন—"বেশ বলেছ ঠাকুরঝি; হ্যাঁ গা, অমন একটু বেগোছ সব কাজেই হয়ে যায়, তাই বলে...."

—দ্বারভাঙ্গা দোষে-গুণে মায়া বিস্তার করিতেছে।

৪

দ্বারভাঙ্গাতেও দেখিতে দেখিতে তিনটা বৎসর কাটিয়া গেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা শশাঙ্কের উপনয়ন। উল্লেখযোগ্য বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, বিপিনবিহারী ও গিরিবালার সন্তান-সম্পর্কিত এই প্রথম কাজ; তাহা ভিন্ন নূতন বাড়িতেও এই প্রথম উৎসব। বিপিনবিহারী কতকটা সাধ্যাতীতই খরচ করিলেন। ছোট বোন অভয়া দেবী পূর্ব হইতেই আসিয়াছিলেন, কাজের সময় আর তিন জনেও আসিলেন; শিবপুর হইতে আসিলেন শশাঙ্কের দুই মামা। দ্বারভাঙ্গার বাড়িটার শ্রী কয়েক দিনের জন্য একেবারে অন্য রকম হইয়া উঠিল।

জীবনে পূর্বেকার অন্য সব উৎসব হইতে এ উৎসবের সুর বেশ একটু স্বতন্ত্র। অবশ্য সংসারে শাশুড়িই সব, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া সব কিছু, তবুও এই উৎসবের লহরগুলি চারিদিক্ হইতে আসিয়া যে দোলা দেয় তাহাতে একটা নূতন ধরণের অনুভূতি জাগে,—মনে হয়, জীবনে একটা মস্ত-বড় সার্থকতা আসিল—মা-হওয়ার যেন একটা নূতন অর্থ হইল। কাজ-কর্মের ব্যস্ততার মাঝে

হঠাৎ এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া শশাঙ্কের পানে চাহিয়া থাকেন—তাহার উপর যেন একটি নূতন আলোক আসিয়া পড়িয়াছে – সেই আলোকে হঠাৎ বড় হইয়া ছেলে যেন একটু আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। এক একবার এক অদ্ভুত ধরণের কষ্ট হয় ; সবাই বলে পৈতার সঙ্গে ওদের না কি আলাদা করিয়া জন্ম হয়—দ্বিজ মানে না কি তাই। ওর ছেলেবেলা থেকে একটি ধারাবাহিক চিত্র-পরম্পরা চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—ধীরে ধীরে বড় হইয়া আসিতেছে তবু যেন নিতান্তই মায়ের জিনিষ। পৈতা ওর জন্মান্তর, সবাই বলিতেছে—নিশ্চয় ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে—পৈতার পর ছেলেদের জাতও যায় বদলাইয়া, এদিকে স্ত্রীলোক বলিয়া মায়ের জাত যে-কে সেই থাকে।···দেখেন, শশাঙ্ক উৎসবের আয়োজনে কোন না কোন ফরমাস লইয়া ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফিরা করিতেছে—গম্ভীর মুখটা পরিশ্রম আর উৎসাহে রাঙা। একটা নূতন ধরণের ব্যথা লাগে মনে, ভয় হয়। ননীবালা বলেন—"দেখো বৌদি, দণ্ডী নেবার পর ছেলে যেন তিন পা'র বেশি না চলে যায়, তা' হলেই ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।" হাসির মধ্যেই হয় কথা, নিজেও হাসিয়াই উত্তর দেন, কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করিতে থাকে ! কী যে অদ্ভুত জিনিষ এই সন্তান, এক জন্মে বেদনা, আর এক জন্মে যে-আশঙ্কা, যে উদ্বেগ তাহাতে মনে হয় বেদনা ছিল সহস্র গুণ ভালো।

মন যে সর্বদাই এই রকম যুক্তিহীন হইয়া থাকে এমন নয়। এই তো চারি দিকেই ব্রাহ্মণদের পৈতা-হওয়া ছেলে, কে আর সন্ন্যাসী হইয়া গেছে ? কে-ই বা হইয়া গেছে মা থেকে পৃথক্ ? বরং এই যে ছেলের একটা নূতন ব্যক্তিত্ব হইতেছে, এর জন্যই তাহাকে যেন আরও নূতন করিয়া পাওয়া যায়।

তবুও একবার একলা পাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন—"শশাঙ্ক, শোন্ বাবা, তুই যেন তিন পায়ের বেশি এগিয়ে যাস্‌নি দণ্ডী নেওয়ার পর।"

শশাঙ্ক এখন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, নূতন নূতন কথা শিখিয়াছে, হাসিয়া বলিল—"কী অন্ধ সংস্কার তোমার মা ! ও-সব না কি ফলে ?"

গিরিবালা যতটা সম্ভব নির্ভয়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"জানি গো জানি—কলিকালে ও-সব কিচ্ছু ফলে না আর, তবু তোমার বাহাদুরি করে তিন পায়ের বেশি যেতে হবে না।····বামন হতে যাচ্ছ, একটা কথা সর্বদা মনে রেখো বলে দিচ্ছি।"

"কি ?"

"গোড়াতেই মায়রে অবাধ্য হয়ো না,—সেটা যে কত বড় দোষের !....পৈতেই বলো, যাই বলো, মায়ের চেয়ে কিছুই বড় নয়।"

—মাতৃত্বের গুমর নয়, শুধু একটা ভয় দেখাইয়া রাখা।

ভয় পাওয়ার উল্টা পিঠেই তো ভয়-দেখানো।

"ভবতি, ভিক্ষাং দেহি মে।"

দাদার পৈতার দিনের সমস্ত উৎসব-কোলাহলের উপর ঐ ক'টি সংস্কৃত কথার ঝঙ্কার শৈলেনের কানে যেন এখনও লাগিয়া আছে। সবার আগে ভিক্ষা চাহিল মায়ের কাছেই।....শাস্ত্রের ব্যবস্থায় বড় কৌতুক বোধ হয়—নারীর প্রতি অবহেলাটা যেন মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়, তাই মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মাকে আনিয়া একেবারে সবার পুরোভাগে দাঁড় করাইয়া শাস্ত্র নিজের দোষটা ক্ষালন করিয়া লয়; ঋষি, আচার্য, পুরোহিত, এমন কি পিতা পর্যন্ত থাকেন পশ্চাতে।

মা শুধু সন্তানের নয়, শাস্ত্রেরও যেন মস্ত বড় একটা ভরসা।

দণ্ডী-ঘরের মধ্যে মায়ের সামনেই দাদা দাঁড়াইয়া;—মুণ্ডিত কেশ, পরনে গৈরিক উত্তরীয়, হাতে বিল্বদণ্ড, গৌর বক্ষের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত বাঁকা হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। কতকটা এই নূতন বেশ-সংস্কারে আবার কতকটা যেন একটা ভিতরেরই অভিনব কিছুতে সমস্ত শরীরটি ভাস্বর।....একটা রব উঠিল—"আগে মাকে ডাকো, মাকে ডাকো আগে...মারই হাতের ভিক্ষে আগে নিতে হবে, এখানে আর সবাই পরে, বাবা !...মার এদিকে খোঁজই নেই—কোথায় তিনি ?....কোথায় গো নতুন ব্রহ্মচারীর মা ?...."

ছোট পিসিমা গিয়া মাকে ডাকিয়া আনিলেন,—কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, একটা কাজ নয় তো তাঁহার আজ। রাঙাপেড়ে গরদের শাড়িপরা, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া যেন একটি জ্যোতিশ্চক্রের সৃষ্টি করিয়াছে; সবার নানা অভিমতের মধ্যে যেন একটু বিপর্যস্ত। বড় পিসিমা হাতে সাজানো ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া দিলেন,—একখানি রেকাবিতে আলো চাল, পৈতা, দুটি টাকা। শশাঙ্ককে বলিলেন—ব্রহ্মচারী এবার বলো—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি মে।" শশাঙ্ক কথাটা বলিয়া কাঁধের ভিক্ষার ঝুলিটা মেলিয়া ধরিল, মা রেকাবিটি উজাড় করিয়া দিলেন। পিসিমা শশাঙ্ককে বলিলেন—"এবার বলো—'স্বস্তি'।"

অনেকে জড়ো হইয়াছে, বড় পিসিমা সবার মুখের উপর সস্মিত দৃষ্টি বুলাইয়া

লইয়া বলিলেন—"বুঝলেন ঠাকরুণ, তিন দিনের জন্যে ছেলে সন্ন্যাসী এখন, সে আর কাউকে প্রণাম করবে না, উল্টে তারই আশীর্বাদ নিতে হবে।"

অন্য কে এক জন অল্প অল্প মাথা দুলাইয়া বলিল—"হুঁ, শাস্ত্র বড় কড়া জিনিষ বাপু!"

মা একটু মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, চোখে অশ্রু জমিয়াছে, সেটাকে গোপন করা দরকার; একবার চকিতে একটু হাসিয়া বড় ননদের পানে মুখ তুলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। একটু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি হইল, কে বলিল—"মায়ের মনই তো, —কেমন একটু উৎলে ওঠেই এই সময়টা।"

উপনয়নটা হইল পাণ্ডুল ছাড়িবার প্রায় বৎসরখানেক পরেই।

একটা জিনিষ দিন দিন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল,—সংসার অচল হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের মৃত্যুতে অর্থ-সংগতির দিক্ দিয়া যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল, বিপিনবিহারী পাণ্ডুলে থাকিতে ধীরে ধীরে সেটা কোন রকমে সামলাইয়া আনিয়াছিলেন মাত্র, বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিবার অবসর হয় নাই। এই সময় পাণ্ডুলের চাকরী গেল। দ্বারভাঙ্গার জীবনটা আরম্ভ হইল অনিশ্চিত ভরসার উপর;—আশা করা ভালো, কিন্তু অনিশ্চিতের উপর ভরসা করিয়া থাকার মতো মারাত্মক আর কিছুই নাই; একটা কিছু হইবেই, ভগবান্ কি এতই বিরূপ হইবেন?—তিনিই যখন এতগুলিকে সংসারে আনিয়াছেন।.... কথাটা নিশ্চয় সত্য—চরম সত্যই তাহাতে ভুল নাই; ভুল হইল একটা কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই, এই ভরসায় হাতে অল্প যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সেটার খরচে হিসাবের বিশেষ বালাই না রাখা। নূতন সহরে বাস, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে খরচও নানা আকারে হইয়া পড়ে; বুঝিতে বুঝিতে, টাকাগুলা যে কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইতেছে ধরিতে ধরিতে তার অনেকটাই খালি হইয়া আসিল। এই সময় শশাঙ্কর উপনয়নও আসিয়া পড়িল। নিজেদের সাধ তো আছেই, তাহা ভিন্ন চারিদিক্ থেকেই আত্মীয়-কুটুম্বদের পত্র আসিতে লাগিল—বিপিনবিহারীর কাছে, আবার গিরিবালার কাছেও—প্রথম ছেলের প্রথম কাজ, কেহ কোন ছুতা-নাতা শুনিবেন না।

উপনয়নের পর প্রায় মাস খানেক পর্যন্ত বিপিনবিহারী হিসাবের দিকে ঘুরিয়াও চাহিলেন না। বোনেরা অনেক দিন পরে আসিয়াছে, তাও আসিয়াছে একেবারে তাঁহার সংসারে। পাণ্ডুলে ছিল মধুসূদনের পাতা পুরানো সংসারের

ধারা, সেখানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে বিপিনবিহারীর বিশেষ কোন সংকোচ ছিল না, তাঁহাদেরও গায়ে লাগিত না। এখানে এখন আলাদা কথা। তাহা ভিন্ন বোনেরা কি সেই রকমই আছে। কালের বিস্তারে শাখা-প্রশাখায় তাহারা হইয়া পড়িয়াছে সুদূর কুটুম্ব ; ভাই-বোনের মাঝেও মর্যাদা আসিয়া পড়ে।···· বিরাজমোহিনীর বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে, নূতন জামাইটিও আসিয়াছে।

মাস-খানেক পরে, একে একে যখন সবাই চলিয়া গেলেন বিপিনবিহারী হিসাব করিতে বসিলেন। দেখা গেল, অদূর ভবিষ্যতে অনেক ভরসার সেই অনিশ্চিতের গর্ভে যদি একটা কিছু না আসিয়া পড়ে তো এত বড় সংসারটা যে কি করিয়া চলিবে তাহার কোন হদিসই পাওয়া যায় না।

তাহার পরও ছুইটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এত বড় সংসার, কি করিয়া যে কাটিয়াছে যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না। দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলে এখনও যেন আতঙ্ক আসিয়া পড়ে মনে। আর, সংসার ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া নাই ; চণ্ডীচরণের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, নিজেরও ছয়টি পুত্র একটি কন্যা। তা'ভিন্ন বড় হওয়া মানে তো শুধু আকারেই বিস্তার নয়, কত সমস্যার আবির্ভাব হয়. জটিলতা আসে। চারিটি ছেলে স্কুলে পড়ে ; এক এক সময় মনে হয় ছাড়াইয়া লই, আর কিছু না হোক কাগজ-পেন্সিলেও তো একটা নিয়মিত খরচ আছে, পোষাক-পরিচ্ছদেও ওরই মধ্যে একটা ঠাট বজায় রাখিতে হয়, তাহাতে সংসারে টান পড়ে।····অভাবের কাছে প্রায় পরাভব স্বীকার করিতে করিতে বিপিন-বিহারী আবার সিধা হইয়া ওঠেন। ভগবান্ যেমন ছুঃখ দিয়াছেন সেই সঙ্গে দিয়াছেন অটুট স্বাস্থ্য আর অদম্য সাহস।····একটু যেন আশার আলো দেখা যায়, এক এক করিয়া ছুটি ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে, পাস করিবেই, তাহার পর····

ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বারভাঙ্গা তখন বিদেশই, বিদেশে ঋণের চেহারা যেন আরও ভয়াবহ। তাহাকে তুষ্ট করিতে গিরিবালার গায়ের কয়েকখানি গহনা গেল। নিস্তারিণী দেবী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"আমার ভয় হচ্ছে আরও কি দেখতে হবে বিপিন, চল্ পাণ্ডুলে ফিরে যাই। বিঘে কয়েক ক্ষেত রয়েছে, তারই একপাশে ছু'টো কুঁড়ে তুলে থাকা যাবে। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দে তা থেকেও কিছু আসবে ; সমাজের মধ্যে অভাবগুলো যেন আরও বিটকেল হয়ে দেখা দেয়। আর, সামনে থাকলে ক্ষেতের জিনিষগুলোও একটু পাওয়া যাবে, এমন ফাঁকি পড়তে হবে না।"

বিপিনবিহারী বলেন—"দেখি···"

স্ত্রীর মতটা জিজ্ঞাসা করেন। মত হইলে সেই অনুযায়ীই যে কাজ করিবেন তাহা নয় ; একবার দেখেন—কে কতটা নুইয়া পড়িল।

গিরিবালার অনেক আশা,—বিকাশ দাদার কথাগুলো যেন তাঁহার রক্তকণার সঙ্গে মিশিয়া আছে—"বড় মা হতে হবে গিরি।"—এত দুঃখ-অভাবের মধ্যে যে তাহারই আয়োজনই হইতেছে। বিকাশ দাদা এখনও খোঁজ নেন মাঝে মাঝে। চিঠি যখন আসে, গিরিবালা সব অভিযোগের কথা যান ভুলিয়া—লেখেন এরা সবাই মানুষ হইয়া উঠিতেছে—গৌরবে মনটা ভরিয়া ওঠে বলিয়া লেখার মধ্যে নিজেকে একটু অন্তরালে রাখেন, লেখেন—তিনি নিজে তো অত-শত বোঝেন না, তবে যেখানেই যান ওদের সুখ্যাতি শোনেন, সবাই বলে ওরা দিবেই পাস, তার পর না কি কলেজে যাইবে—সে আবার এখানে নয়, কলকাতায় কি পাটনায়—ওঁর এখন থেকে এত ভাবনা হইতেছে—নিতান্ত ছেলেমানুষ কি না ওরা, কখনও বাহিরে যায় নাই—আর পাটনা তো এখানে নয়, কলকাতা আরও দূর—কী যে করিবেন, এখন থেকেই যেন ভাবনায় পড়িয়াছেন···

নিজের আশাটাকে আশঙ্কার সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা। যে-দিন লেখেন, সমস্ত দিন এমন হালকা বোধ হয়, সংসারের ছোট বড় দুঃখগুলা যেন স্পর্শই করিতে পারে না ; সব কাজেই যেন নিজের মাতৃত্বকে অনুভব করিয়া ফেরেন।

হরেন, পূর্ণেন্দু, কি অরু—এরা সব ছোট, অত বোঝে না, গিরিবালা শশাঙ্ক কিম্বা শৈলেনকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করেন—"তোদের কষ্ট হচ্ছে বড্ড, না রে ?"

ছেলেরা হয় তো বিমূঢ় ভাবেই উত্তর দেয়—কেন মা ?

গিরিবালা একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া যান ; প্রথমটা বাধো-বাধো ঠেকে, বলেন—"না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম····"

সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেন, একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে বলেন—"এই ধর্ ভালো খাওয়া-দাওয়া পাস না, কাপড়-জামার কষ্ট····"

যখন বলিয়াই ফেলিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য স্থিরদৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া থাকেন।

দু'জনেই এ-সব বোঝে আজকাল। একটু হয়তো অপ্রতিভ হইয়া পড়ে তাহার পরই হাসিয়া একটু চোখ নাচাইয়া বলে—"ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে—ভয়ঙ্কর !—ভয়—ঙ্কর।····মা, তুমি যেন কী হয়ে পড়ছ দিন দিন !····"

শৈলেন আবার একটু ভাবুক গোছের, এক দিন মাকে একলা পাইয়া গল্পে গল্পে মনের অনেক চোরা কুটুরি খুলিয়া ফেলিল। একবার বলিয়া উঠিল—"আমার কি মনে হয় জানো মা ?"—একটু লজ্জিত দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"কি রে, বল্ না।"

"না, তুমি হাসবে।"

"বলই না ; না হাসব না।"

"মনে হয় আসছে জন্মে তোমরা দু'জনে গোড়া থেকেই খুব গরীব থাকবে, খু—ব গরীব ; কিন্তু এই রকম ধার্মিক। তার পর কষ্ট যখন খুব বেশি সেই সময় আমি জন্মাব। তার পর অনেক দিন খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠে তোমাদের এত বড় করে তুলব যে...."

গিরিবালা একবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসির মধ্যেই কিন্তু আবার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। হাসি আর অশ্রুর মাঝেই বলিলেন—"কি সাধ ছেলের বাবা ! আমরা কোথায় মাথা কুটে মরছি—কি করে একটু ভালো খাবে, কি করে ভালো পরবে, ছেলের ওদিকে... "

একটু পরেই কিন্তু কতকটা বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"শোন্ তাহলে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; বিকাশ দাদাও ঠিক তোর মতন কথাই মাঝে মাঝে বলতেন শৈল, মামা-ভাগনের একটা মিল থাকেই কি না। বলতেন 'গিরি, একেবারে বড়-মানুষ হয়ে জন্মাবার মতন দুর্ভাগ্য আর নেই, তাতে মনটা বাড়তে পায় না। মানুষের যত নিচু পর্যন্ত বনেদ তত উঁচুতে সে উঠতে পারবে—তত বেশি তার মনের প্রসার হবে।'....হ্যাঁ রে শৈল, আর জন্মের কথা আর জন্মে, এ-জন্মেও তো কষ্টটা কম পেলি না—আমরা দু'জনে তো তোদেরই মুখ চেয়ে আছি...."

এক দিন আবার হরেনকে প্রশ্ন করিয়া খুব একটা মজার উত্তর পাওয়া গেল। হরেন একটু চনমনে-গোছের, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মুখটা ঘুরাইয়া উত্তর করিল—"কষ্ট কেন ?—যার বাবা নেই, মা নেই, তারই কষ্ট ; আমাদের তো ঠাকুরমা পজ্জন্ত রয়েছেন !"

বিকাশ দাদাকে যখন উত্তর দেন, এই সব কথাও লিখিতে বড় ইচ্ছা করে,—কত বড় মা হইবার যে তাঁর আশা তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিতে ; লজ্জায় অতটা পারিয়া ওঠেন না।

বিপিনবিহারীর প্রশ্নে গিরিবালা যে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেন এমন নয়। মনের আশাটা এত বড় যে সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে, বর্তমান অবস্থার সামনে নিজের মনেই কেমন বেখাপ্পা শোনায়। তা ভিন্ন আশাটা যতক্ষণ মনের গোপনে থাকে, থাকে এক রকম, আলোচনা করিতে গেলেই সেটা যে কত অসম্ভব তাহা যেন স্পষ্ট হইয়া ওঠে।....শাদা উত্তর না দিয়া ঘুরাইয়া বলিলেন—"গয়না তুটো গেল কি না, মা বড় মুশড়ে পড়েছেন।"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"মার কথা থাক্, সে তো তাঁর মুখেই শুনেছি। তোমার মতটা কি—ওদের ছাড়িয়ে নি? মা যা বলছেন সেও তো মন্দ কথা নয়···"

গিরিবালা একটু ভীত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। মুখ দিয়া কোন উত্তর বাহির হইল না।

বিপিনবিহারী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—"মার কথা বলছ,—ননীবালাদের বাড়ি নেমন্তন্ন হোল, তুমি মাথাব্যথার ভান করে পড়ে রইলে, গেলে না—সেটাও তো গয়নার শোকেই হোতে পারে; ভালো কাপড়ও নেই, গয়নাও গেল, তাই আমাদের ওপর অভিমান করে...."

গিরিবালার মুখটা হঠাৎ এমন হইয়া গেল যেন স্বামীর কথা মনের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া আঘাত দিয়াছে, বলিলেন—"তুমি বলতে পারলে কথাটা—এত দিন আমায় দেখবার পর!"

বিপিনবিহারী উত্তরটা ঐ রকমই আশা করিয়াছিলেন, তবে এ আকারে নয়। যাহাকে চিরদিন নরম প্রকৃতির বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন, মনে হইয়াছিল সে নরম ভাবেই, রুচিকর করিয়া বলিবে কথাটা; একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"সত্যিই একটু ভুল হইয়া গেছে—এই বংশেরই আর এক বউ যে খালি পেটে শুধু পানে ঠোঁট রাঙা করে ঠাট বজায় রাখতেন সে-কথা ভুলে গেছলাম।"

গিরিবালা মনের একটু চড়া সুরে বাঁধা তারটা ঢিলা করিয়া দিলেন, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অত বাড়ায় না, কোথায় তিনি, কোথায় আমি!"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"গয়নার কথা বলছ—আসল গয়না তো ওরাই; বাঁ হাতে শাঁখাটা থাকলেই হোল আমার।"

এইখানেই আর একটা কথা বলিয়া রাখিতে হয়; এই সময়টার প্রায় শেষাশেষি বাইরে একটা রেল-আফিসে চণ্ডীচরণের চাকরী হইল। বিপিন-বিহারী বলিলেন—"বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও চণ্ডী।"

আপত্তি করিতে বলিলেন—"বুঝেছি তোমার মনের ভাবটা; কিন্তু এই রকম করাতেই আমার বেশি সাহায্য হবে, সেখানেও সামলাবে আমারই সংসারের একটা অংশ তো? তা ভিন্ন ঘরকন্না আর চাকরি দুই-ই সামলাতে গেলে, চাকরিটাই হাতছাড়া হবে; কত বড় দুঃসময় যাচ্ছে দেখছ না?"

৫

ভাইয়েরা বহু দিন হইতেই একবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবারে উপনয়নের সময় আসিয়া আরও ধরিয়া পড়িল। যাওয়া কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না, কয়েক বৎসর ধরিয়াই একটা না একটা কিছু লাগিয়াই আছে। এমন সময় এক দিন খবর আসিল, মা হঠাৎ কিশোরের বিবাহের জন্য বড় জিদ ধরিয়া বসিয়াছেন, সামনের মাসে দিতেই হইবে। পাত্রী এখনও ঠিক হয় নাই, তবে অনেক জায়গায় দেখা শুনা হইতেছে। এ-উপলক্ষে গিরিবালাকে আসিতেই হইবে। এখানকার পত্রে দিন ধার্য করিয়া পাঠাইলেই সাতকড়ি আসিয়া লইয়া যাইবেন।

কয়েক দিন আগে ছোট জা চণ্ডীচরণের কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন। গিরিবালা বিরূপ অদৃষ্টের উপর যেন অভিমান করিয়াই ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"হবার নয়, শুধু ভগবানের ঠাট্টা করা!....কত দিন যে দেখিনি সবাইকে; বাবাও জেঠামশাইয়ের মত ফাঁকি দেবেনই—বুঝতেই পারছি।"

কয়টা দিন গেল, কি উত্তর দেওয়া হইবে আলোচনা হইতেছে, এমন সময় একটা পোষ্টকার্ড আসিল—বরদাসুন্দরী দিন-চারেকের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়াছেন, দিন-দুই পরেই সাতকড়ি গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য রওয়ানা হইবেন।

শোকের প্রথম বেগটা কমিলে, সে-দিনটা বাদ দিয়া বিপিনবিহারী পরদিন প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করলে?"

গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করার কথা বলছ?"

"সামনেই এগ্‌জামিন ছেলেদের, এখন গেলে...."

গিরিবালার মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, বলিলেন—"ছাড়িয়ে নাও ছেলেদের স্কুল থেকে ; না হয় একটা বছর ঐ ক্লাসেই থাক।"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব্যাকুল মিনতির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমরা কি ভাবো ?....আমি যেমন মা, আমারও তো এক জন মা ছিলেন ? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই এমন ভাবে সব মুছে দিয়ে সংসার করতে হবে ?"

সমস্ত দিন চঞ্চল ভাবে কাটাইয়া বিকালে শাশুড়ির কাছে বসিয়া হঠাৎ পা দুইটা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"মা, একবার বাবাকে দেখবার উপায় করে দাও—দিতেই হবে তোমায় ক'রে।"

বধূর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বিপিনকে বলেছি বৌমা, চণ্ডীকে তার করে দিয়েছে ছোটবৌমাকে নিয়ে আসবে।...কি করবে বল ?—মেয়েছেলের সংসার করা এমনই, তুমি মা হারালে, আমি গঙ্গা হারিয়ে বসে আছি।"

গিরিবালা বারো বৎসর পরে পিত্রালয়ে আসিলেন। কান্না লইয়াই প্রবেশ করিতে হইল এবারে, কিন্তু দু'দিন পরে মায়ের শোকটা যখন একটু উপশম হইল, বাড়ির শোকে মনটা আচ্ছন্ন রহিল। চারখানা ঘর লইয়া ছোট্ট মাটির বাড়ি, কিন্তু সেইটুকুই যে কি একটা তৃপ্ত আনন্দ-কলরবে পূর্ণ থাকিত ! এখন সে আনন্দ তো নাই-ই, শ্রীও যেন কোথায় চলিয়া গেছে। নিতান্ত যেটুকু সর্বদা ব্যবহার হয় সেটুকু আছে এক রকম, তাহার পরই জঙ্গল। ব্যবহার করার ইতিহাসও শুনিলেন,—ভিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন শুধু তিনটি প্রাণী—রসিকলাল, বসন্তকুমারী আর বরদাসুন্দরী। তিন ছেলেই শিরপুরে, দুই বৌ-ও। না আসেন যে এমন নয়, শনিবারে শনিবারে কেউ এক জন আসেন, সে-রকম কিছু কাজ হইলে বৌয়েরাও দু-তিন দিনের জন্ত আসিয়া থাকেন ! তেমনি আবার বরদাসুন্দরী মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি গিয়া কয়েক দিন করিয়া কাটাইয়া আসেন। আবার এমনও হয়, বাড়িতে তালা আঁটিয়া তিন জনেই দীর্ঘকালের জন্ত শিবপুরে গিয়া রহিলেন।

গিরিবালা ভায়েদের প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁ রে, ভিটে ছেড়ে দিলি সব ?"

উত্তর রসিকলালই দিলেন—"ওদের দোষ দিই না গিরি ; বেলেতেজপুর আর থাকবার জায়গা নেই ; অন্ততঃ আমাদের পক্ষে তো নেই। পাণ্ডিতমশাই

গেছেন বিবাগী হয়ে, ঘোষাল কাকা গেছেন মারা, নিকুঞ্জ দাদা—সেও না-থাকার মধ্যেই। তুই বোধ হয় বলবি—সে যা ছিলেন তার চেয়ে এই ভালো, কিন্তু সেটা বোধ হয় ভুল—অনেক শত্রুতা করেছেন, তবুও নিজের লোকই তো? তা ভিন্ন ওরা আসবেই বা কি করে?—ম্যালেরিয়ায় দেশ ছেয়ে গেছে, দু'টো দিন যদি থাকে তো জ্বর নিয়ে যায়, বৌমাদের তো আরও সয় না।....এবার তো সব বাঁধনই ঘুচল,—এক দিক্ ভেঙে দাদা বেরিয়ে পড়লেন, এক দিক্ ভেঙে এই ছোট বৌ, এবারে সদরে তালা ঝোলানো ভিন্ন আর কি উপায় আছে বল্? আর, আমাদেরও তো হয়ে এলো—এখন তো এই মনে হয় মা সিংহবাহিনী শিবপুরে যে একটু সঙ্গতি করে দিয়েছেন এই তাঁর দয়া, গঙ্গাই দরকার এখন দু'জনের, সেটুকু তো পাব?"

কী রকম যে হইয়া গেছেন বাবা গিরিবালা যেন ওঁর দিকে চাহিতে পারেন না, চুল প্রায় সবই পাকিয়া গেছে; অমন শরীর ঢিলা মারিয়া গেছে। যদি হাসেনও তো সেটা যেন হাসির মুখোস পরা।

সাতকড়ি একবার একান্তে পাইয়া বলিল—"ওঁকে এইখান থেকে শিবপুর নিয়ে যেতেই হবে দিদি, তুমিও জোর দাও, নৈলে উনি বাঁচবেন না। ওঁর কবে থেকে এ-দশা শুরু হয়েছে জানো?—যবে থেকে পণ্ডিতমশাই গেছেন চলে। অর্জুনের যেমন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কাকার সেই রকম ছিলেন পণ্ডিতমশাই। কী সুন্দর প্র্যাক্‌টিস্ গড়ে উঠেছিল, লেখাতেও কি সুন্দর হাত খুলে গিয়েছিল, যেই পণ্ডিতমশাই গেলেন, এক দিনে যেন সব উবে গেল।...নিয়ে চলো শিবপুরে, সেখানে থাকেনও ভালো, দেখবে।"

নিকুঞ্জ জেঠার সঙ্গে দেখা করিলেন। উপরের ঘরে একটা খাটে আফিম খাইয়া এক রকম নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছেন, একবার ডাকে সাড় হইল না, দ্বিতীয় বার একটু জোরে ডাকিতে চোখ খুলিয়া পিট-পিট করিয়া চাহিয়া রহিলেন। গিরিবালা পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—"জেঠামশায়, আমি গিরি।"

সাড় হইল। একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তাহার পর কতকটা বিড়-বিড় করিয়াই বলিলেন—"গিরি—গিরি।...বোস্।"

সামনের জলচৌকি থেকে গড়গড়াটা নামাইয়া রাখিয়া গিরিবালা উপবেশন করিলেন।

নিকুঞ্জলাল নিজের কপালের উপর ডান হাতটা বুলাইয়া, পাঁচটি আঙুল দিয়া কপালটা যেন একটু খামচাইয়া ধরিলেন, মাথাটা একটু দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—"গিরি—গিরি—হুঁ—দেখতে যে আর পাব এমন আশা ছিল না...

দেখ্ না, দিদি ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে গেল··· কৈ গো, গিরি এসেছে একবার এসো····বৌমাও চলে গেল····কত অত্যাচারটা করেছি তোদের ওপর—ঐ দু'টো নিরীহ বৌ আর লক্ষ্মণের মতন দু'টো ভাই মুখ বুজে—কি বলছিলাম যেন···?"

গিরিবালা বলিলেন—"সে সব পুরনো কথা আর কেন জেঠামশাই ?—সে সবই আপনার আশীর্বাদ।"

"ছেলেপুলে ক'টি বললিনি তো ?"

"আপনার ছ'টি নফর জেঠামশাই, কোলেরটি আপনার দাসী।"

ঘাড়টা গোঁজাই আছে, নিকুঞ্জলাল হাতটা একটু তুলিলেন, বলিলেন—"আশীর্বাদ করব বৈ কি, ফলবেও দেখে নিস্···যাদের বুক ভেঙ্গে গেছে তাদের আশীর্বাদ ফলেই···হ্যাঁ, কি বলছিলাম ?····এই তো, ঠিকই বলছিলাম—ছোট বৌমা গেলেন—সতীলক্ষ্মী····দামুদিদি গেল কোথায় ?—রসিকের একটা বিয়ে দিয়ে দেবে না ?···বাঃ, একা দাদারই ?—ছোট ভাই কেউ নয় ?···দেখলি তোর নতুন জ্যেঠাইমাকে ?····কৈ গো ?····"

দরজার পাশেই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এক পা আগাইয়া আসিতেই গিরিবালার নজর গেল। বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ, শ্যামাঙ্গী, একটু ঢ্যাঙা-গোছের, চোখ দু'টি রাইমণির মতোই নরম, একটি বছর ছয়েকের ছেলে হাঁটুর কাছের কাপড়টা খামচাইয়া গিরিবালার পানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালা গিয়া প্রণাম করিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"গিরিবালা, না ?····কার সঙ্গে কথা কইছ—মানুষ ?—দু'টো কথার মিল পাবে না। এসো বাইরে।"

গিরিবালা ফিরিয়া দেখিতে বলিলেন—"ও ভাবতে হবে না, নিঝুম হয়ে পড়েছেন। এসো তুমি।"

অনেকক্ষণ গল্প হইল ; চোখ দু'টির মতো স্বভাবটিও রাইমণির মতো নরম। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলেন—নিজের লইয়া গল্প করিলেন না বেশি—যে পরিচয়টুকু না দিলেই নয়, বা যেটুকু নেহাৎই প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িল শুধু সেইটুকু। বেশি ভাগ গল্পই হইল গিরিবালার শ্বশুর বাড়ি লইয়া—কেমন দেশ, কি বৃত্তান্ত—এই সব। নিজের সম্বন্ধে যেটুকু বলিতে হইল তাহাতেও যে একটা বেদনা বা অসন্তোষের সুর আছে এমন মনে হইল না। সোজা বলিয়া যাওয়া—কুলীনের মেয়ে—কি করিয়া সম্বন্ধটা হইল, কি করিয়া বিবাহ হইল····"এখন দু'টি ছেলে, এই ইনি বড়—তোমাদের পাঁচ জনের কল্যাণে থাকেন বেঁচে, ভালো, নৈলে করছিই বা কি বলো ?"

রামমণির মতোই লুচি-হালুয়া করিয়া জল খাওয়াইলেন, গিরিবালা আপত্তি করিতে বলিলেন—"ও মা, সে কি হয়?—এ-বাড়ির যিনি লক্ষ্মী ছিলেন তাঁর কাছে তোমরা কী ছিলে সে কি জানা নেই আমার?"

হারাণের আর সে ভাব নেই, কেন না ঘুড়িটা নেই, আর রসিকলাল নিয়মিত ভাবে প্র্যাকটিস্‌ও করেন না। বন্ধু-মনিবের অনুকম্পায় সে জোতজমি করিয়াছে কিছু, তাই লইয়াই থাকে। তবে প্রতিদিন সকালে আসিয়া একবার করিয়া হাজিরা দেয়, তিনটি প্রাণীর গৃহস্থালী, কিছুই কাজ থাকে না, তবু খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু না কিছু একটা করিয়া দিয়াই যায়। বয়স হইয়াছে, তবে কষ্টে নাই বলিয়া ভাঙিয়া পড়ে নাই।····রসিকলাল তাগাদায় পড়িয়া যদি কোনও 'কলে' যান, পালকি ডাকিয়া আনে; পালকিতে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও ঔষধের বাক্সটি পূর্বের মতোই নিজের হাতে ঝুলাইয়া লইয়া পাশে থাকিয়া গল্প করিতে করিতে চলিতে থাকে। গিয়া, রসিকলাল যখন রোগী দেখিতে ভিতরে ব্যস্ত থাকেন, পূর্বের মতোই বাহিরে লোক জড়ো করিয়া নানা রকমের মুড়ুলি করিতে থাকে, সান্ত্বনা দেয়,—বলে—"দেশে রোগ বেড়েছে তার তোয়াক্কাটা কি?—তোরা গা-ঢেলে অসুখে পড়্ না কেন'—বাবাঠাকুরকে আমি এখান থেকে ছেড়ে দিলে তো কলকাতা যাবেন গিয়ে?····আরও আছি এক ফিকিরে, সে দেখবি'খন।"

চোখ নাবাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

ফিকিরটা বোধ হয় একেবারে গিরিবালার কাছেই প্রকাশ করিবার জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

উনি আসিবার দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ এক দিন একটা মাস কয়েকের মাদি—ঘোড়ার বাচ্ছা আনিয়া হাজির করিল—একেবারে বাড়ির মধ্যে। গিরিবালা তিনটি ছেলে এবং কোলের মেয়েটি লইয়া আসিয়াছেন, তাহা ভিন্ন কাজের আয়োজনের বাড়ি—মা, পিসি, বোনের সঙ্গে আরও ছেলেমেয়ে জুটিয়া উঠানে রকে জটলা করিতেছে, ঘোড়ার বাচ্ছা দেখা মাত্রই তাহাদের মধ্যে একটা উৎসুক চঞ্চলতা পড়িয়া গেল এবং একটু ডানপিটে-গোছের বলিয়া অরু দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া এক লাফে বাচ্ছাটার পিঠে চড়িয়া বসিয়া ঝুঁটিটা কসিয়া ধরিল। বাচ্ছাটা চঞ্চল হইয়া পড়ায়

পড়ো-পড়ো হইতেই হারাণ তাড়াতাড়ি আনন্দে একরকম চিৎকার করিয়া উঠিল—"গিরি দিদিমণি দেখো, শীগগির দেখোসে।"

ছেলেদের মধ্যে হাততালি, নাচ আর নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপের সঙ্গে একটা উৎকট কলরব পড়িয়া গেল। গিরিবালা ঘরে বেসন চালিতেছিলেন, চালুনি-হাতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন, আর সকলেও আসিয়া জড়ো হইল, রীতিমতো একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল। গিরিবালা ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"শীগগির নামিয়ে দে, এখুনি পিঠ থেকে ছিটকে দেবে ফেলে ও-ডানপিটেকে।....নাব বলছি অরু।"

হারাণের মুখটা আনন্দে আর চাপা বিস্ময়ে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"তুমি বাজে বকুনি দিদিমণি—পড়লেই হোল যেন! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষণটা মিলিয়ে যেয়ো...."

গিরিবালা ভয়ের সঙ্গে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওরে, নাবিয়ে দে হারাণ—"অরু নাব বলছি, কাজের বাড়িতে হাত-পা ভেঙে শেষে একটা..."

হারান শুধু সওয়ার আর সওয়ারি উভয়ের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, বিজয় হাস্যের সহিত বলিল—"আমি যা বললাম—থির হয়ে তুমি শুধু লক্ষণটা মিলিয়ে যেয়ো...."

বাচ্ছাটা হয় তো একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াই এক রকম শান্ত ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। হারাণের সাহায্য লইয়া অরু জিহ্বা ও তালুর সংযোগে টক্ টক্ করিয়া একটা শব্দ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে নিজের শরীরের দোলা দিয়া সেটাকে গতিবান্ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়টা লাগিয়া থাকিলেও ব্যাপারটা হইয়া পড়িয়াছে হাস্যোদ্দীপকই বেশি। গিরিবালা একবার সবার মুখের উপর চোখ বুলাইয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, আমি লক্ষণ কি মেলাব বল দিকিন ? .."

বসন্তকুমারী কতকটা রাগের ভান করিয়া, কতকটা হাসিয়া বলিলেন—"তুই নাবা দিকিন আগে—লক্ষণ তো দেখছি হাত-পা ভাঙবার....আর ছেলেও তোর কি হয়েছে গিরি ?—এ কী খোট্টা বোম্বেটে বাবা !....নাব বলছি দাদু...."

হারাণ বলিল—"লক্ষণটা বুঝতে পারলেনি তোমরা ?—এটা বাবাঠাকুরের ঘুড়ির নাতনি..."

একটি মুহূর্ত শুধু সকলেই কিছু না বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সবার উচ্চহাস্যে উঠানটা যেন ফাটিয়া পড়িল, ঠাট্টার সম্বন্ধই বেশি লোকের, ভিড়ের মধ্যে থেকে এক জন বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, সেই জন্যে বুঝি তুই...."

হারাণ একটু রাগিয়া উঠিল—"তোমরা লক্ষণটা কেউ বুঝবে না ঠাকরুণ, সেরেফ ঠাট্টা। শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে বাড়িতে তো এতগুলি ছেলেপিলে রয়েছে, কৈ, গিরি দিদিমণির এই ছেলেটি ছেড়ে তো কেউ লাপ্যে এসে আপন সওয়ারি ভেবে ঘাড়ে উঠে বসল না…কেন? গিরি দিদিমণিই বলুন না, হারাণে সেই কোন্ কালে বলে দেয়নি সে তানার ছেলেই বেলেতেজপুরের মোক্তার হ'য়ে বসে বাবাঠাকুরের পাওনা গণ্ডাগুনো জোচ্চোরদের হাত থেকে খালাস করবে?….কৈ, 'না' বলুক দিকিন গিরি দিদিমণি?"

বাড়িতে হাসির একটা ছোঁয়াচ আসিয়া গিয়াছে, তাহার রাগাতে আর বলিবার ভঙ্গিতে হাসিটা বাড়িয়াই চলিল, বসন্তকুমারী বলিলেন—"বেশ, তোমার মোক্তারকে এখন নাবাও দৈবজ্ঞি ঠাকুর, যখন হবে তখন তার মোক্তারির ব্যাগ হাতে করে পাশাপাশি যেও…তোমার কপালের নেকন কে খণ্ডাবে?"

তাহার অত-বড় গুরু-গম্ভীর কথাটা সবাই ঠাট্টাতেই হাল্কা করিয়া দিতেছে দেখিয়া হারাণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই আরও একটু বেশি রাগিয়া তর্জনী সঞ্চার করিয়া বলিলেন—"কপালের নেকন আমার নয়, কপালের নেকন তাদের যারা বাবাঠাকুরকে অকর্মন্যি ভালোমানুষ পেয়ে ফিসের ট্যাকা আটকে রেখেছে—কিছু নয় তো পাঁচশো—হাজার তো হবেই। হারাণে বসে নেই, সেই ঘুড়ির নাতনির পিঠে চড়িয়ে খোকাবাবুকে দিয়ে না আদায় করাই তো…"

একটা ঝাঁকানি দিয়া সওয়ারসুদ্ধ বাচ্ছাটার মুখ সদর দরজার দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"চলো খোকাবাবু তুমি বাইরে—এখানে—কি যে বলে…"

একটু ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"তা হাসো সবাই, হাসতে তো মানা নেই, কিন্তু য্যাখন দুষমণের ঘরের ট্যাকা এনে ঝনঝনিয়ে ঢালবে ত্যাখন বোলো—হারাণে পরমাণিক এক দিন বলেছিল—আর ঢালবেই—সে আমি খোকাবাবুর ঘোড়ায় চড়বার দাপটেই টের পেয়েছি…."

মেয়েদের হাসি ও একপাল ছেলে-মেয়ের হুল্লোড়ের মধ্যে ভাবী মোক্তারকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

এঁদের আর একটি আশ্রিত পরিবারের অবস্থাও এখন ভালো, চারি দিক্‌কার এত কষ্ট-নৈরাশ্যের মধ্যে গিরিবালা খানিকটা তৃপ্তি পাইলেন।—

দুলাল বাগদি কাজের ক'টা দিন এক রকম সপরিবারেই এখানে পড়িয়া

রহিল। নিজেদের বয়স হইয়াছে, আর বেশি খাটিতে পারে না, তবে তাহার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতকুড় সবাই মিলিয়া আনা-থোওয়া, কাঠ-কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা—তাদের অধিকারের মধ্যে সে সব কাজ তাহার জন্য একটি লোক রাখিতে দিল না। এই পরিবারটিও বেশ সুখেই আছে। কাজের ভিড়ের মধ্যেই এক দিন গিরিবালা তাহাদের সবাইকে একত্র করাইয়া পরিচয় লইলেন। তিনটি ছেলের বৌ, দুইটি জামাই,—একটিকে ঘরজামাই করিয়া রাখিয়াছে দুলাল। বলিল—"খেঁদিটা আমাদের দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারলেনি দিদিমণি—হুড়কো হয়ে উঠল—য্যাতবার শ্বশুরবাড়ি পাঠাই পেলিয়ে এসে—ত্যাখন ঐ সমুন্দি-পোকে বললাম—তু ব্যাটাই তাহলে আমাদের এখেনে এসে থাক...."

—বলিয়া নিজের রসিকতায় হাসিয়া উঠিল।

বেশ জামাইটি হইয়াছে—হৃষ্টপুষ্ট, যেন কালো পাথরে কোঁদা শরীরটা, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তেল-চুকচুকে চুল, টানা টানা দুটি চোখ, বয়স বাইস-তেইস। ডাক পড়িতে সে কাজের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরের ঠাট্টায় হাসিয়া মুখটা কাৎ করিয়া লইল। দুলাল আরও একটু ঠাট্টা করিল, গিরিবালার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"তা কিন্তু ব্যাটা আমার বেইমান নয় গো দিদিমণি, বোতুন বাপকে আগলে পড়ে থাকে—খেদির মতন হুড়কো নয়।"

ছেলেটি লজ্জায় আর দাঁড়াইল না। ওরা সকলে কাজে চলিয়া গেলেও গিরিবালা দুলাল আর তাহার বৌকে বসাইয়া রাখিলেন, বলিলেন—"তোরা একটু বোস্ বাছা; তবু তোরা মা-সিংহবাহিনীর কৃপেয় বেঁচে-বর্তে আছিস, একটু কথা কইতে পারছি, এদিকে তো পণ্ডিতমশাই গেলেন, ঠাকুরমা গেলেন, ঘোষাল ঠাকুরদা গেলেন, নিকুঞ্জ জেঠামশাইয়ের ঐ অবস্থা....বাড়ির কথা তো ছেড়েই দিলাম..."

দুলাল একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—"হুঁ, আচি বৈ কি বেঁচে দিদিমণি—না বাঁচলে বড়কর্তার জন্যে, ছোটমা'র জন্যে কে শ্মশানে কাঠ বইত গিয়ে?"

হঠাৎই চোখে কাপড়ের খুঁট চাপিয়া খুক্-খুক্ করিয়া একটু কাঁদিয়া উঠিল। গিরিবালার চোখে জল আসিয়া গেল, দুলালের বৌ চোখে আঁচল দিল। প্রায় মিনিট দুই-তিন কেহই আর কিছু কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর গিরিবালা চোখ দুইটা মুছিয়া বলিলেন—"চুপ কর্ দুলাল, কি আর করবি?"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শোকটা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আঁচলটা মুখে

চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোর তো ভাগ্যি, ওটুকু সেবাও করতে পারলি, আমি মেয়ে হয়ে কি করতে পারলাম বল্? জেঠামশাই যাবার আট মাস পরে টের পাই...."

শোকের আবেগটা প্রশমিত হইতে বিলম্ব হইল। অনেকক্ষণ কোন কথাই জোগাইল না। তাহার পর গিরিবালা বলিলেন—"তা এখন কেমন আছিস-টাছিস বল্ দুলু—সে রকম কষ্টের ভাবটা আর নেই তো? দিনকতক যেন বড্ডই কষ্টে পড়েছিলি পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে।"

দুলাল নিজের পাকা চুলগুলা মুঠায় করিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল, বলিল—"কষ্টটা একটা মস্ত-বড় বিপদের মধ্যে দিয়ে যে কেটে গেল দিদিমণি, শোননি?"

"বিপদ!—"—গিরিবালা একটু বিস্মিত ভাবে চাহিলেন!

"বিপদ নয় কেমন করে? পণ্ডিতমশায় বাপের ভিটে বাগদির ঘাড়ে চাপ্যে গেলেন। তিনি বিবাগী-সন্ন্যাসী, পাপ কাছে ঘেঁসতে পায় না, কিন্তু আমার যে কী দশাটা করে গেলেন!...অথচ গুষ্টিসুদ্দু মরতে বসেছি—বলে লোভ শত্তুরই—আরও শত্তুর হোয়ে দাঁড়্যেচে। এদিকে পেটের জ্বালা, সম্পত্তির লোভ, উদিকে পরকালের ভয় ...কেউ একটা সৎপরামর্শও দেয় না, মুখ ঘুরিয়ে বসে—ঐ যে, বামুনের একটু দয়া পেয়েচি! বাবাঠাকুরের কাছে এলুম—উল্ট পরামর্শ—বলে, 'পাপটা কি এত সস্তা রে দুলু? পণ্ডিতমশাই যা করে গেচেন তার ওপর চিত্তগুপ্তের আঁচড় চলবে না, এই বলে দিলুম—তুই কর্ তো ভোগ-দখল'... গুরুরই শিষ্য তো দিদিমণি? শেষে ভেবে-ভেবে ধম্মঠাকুরের কাচে মাথা খুঁড়ে একটু বুদ্ধি জোগালো...."

গিরিবালা অধিকতর কৌতুকে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, দুলাল বলিল—"বামুনের হাতে বেচে দিনু দিদিমণি,—রেজেষ্টারি করে চোখে একটু ঘুম এল—একটুও মিথ্যে নয়, তোমার ছাওয়ায় বসে বলচি—ডাক্তার বাবাঠাকুরের মেয়ে তুমি।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"নিলে কে?"

"সে-কথা আর বলুনি—নিলে চক্কোত্তিঠাকুর...হকের আদ্দেক দামও দিলে না, চারটে ঘর, অতখানি বাগান! তবে একটা কথায় রাজি করিয়েছি—পণ্ডিতমশাই যে-ঘরটাতে থাকতেন সে-ঘরটায় একটি শিবঠাকুর পিতিষ্টে করে নিত্যি ভোগ দিতে।"

দুলালের স্ত্রী একটি ছোট নাতনিকে কোলে লইয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। স্বামীর পানে খুব দ্রুত একটা কটাক্ষ করিয়া, মুখটা ঘুরাইয়া

লইয়া মন্তব্য করিল—"তা দিচ্চে ঘটা করে, কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাওনি রোজ সাঁজে-সকালে?"

দুলাল একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—দেবে, দেবে, করচে ব্যবস্থা, একদিনেই হয়? আমায় কাল পজ্জন্ত বললে—করচি ব্যবস্থা…"

তাহার বৌ মুখ না ঘুরাইয়াই টিপ্পনী করিল—"আর রান্না চড়িয়ে কাজ নেই,—পেসাদ খাবে দলা-দলা করে!"

দুলাল চটিয়া উঠিল, বলিল—"তুই চুপ কর, সে তোদের মতন হাড়ি-বাগদি কি না—ঠাকুর-দেবতাকে ভোগা দিতে যাবে!"

গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"তা ত্যাত দিন পজ্জন্ত পণ্ডিতমশাইয়ের পুণ্যির জন্যে আমি করে রেখেছি ব্যবস্থা—সেই ইস্তক ধম্মঠাকুরের ঘরে রোজ একটা বড় ঘিয়ের-পিদ্দিপের যোগাড় আচে; তা' ভেন্ন তানার নাম করে বাবার মন্দিরটাও লতুন কোরে মেরামৎ করে দিনু—এই লক্ষ্মীর মা-ই সলা দিলে।…. তবে কথা কি জান দিদিমণি?—ধম্মবাবা আমাদের ছোটজেতের ঠাকুর কি না—পুণ্যি যা দেয় তাতে তেমন জোর হয় না…তার সাক্ষী এই আমাদেরই দেখো না গো…."

৬

বেলেতেজপুর ছাড়িতে খুব কষ্ট হইল,—জন্মভূমি—আর কখনও দেখিতে পাইবেন কি না কে জানে? তবে সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে শিবপুরে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রথমত শোকের পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়ত সবই নূতন—অতবড় একটা শোকের পর নূতনত্বটা যেন মনটাকে আরও ধুইয়া দিল। ভাইয়েরা খুব একচোট ঘুরাইয়াও আনিলেন—কলিকাতার যত দ্রষ্টব্য স্থান—চিড়িয়াখানা, আজব ঘর, পরেশনাথের মন্দির, কালীঘাট;—পথে পড়িল হাওড়ার পুল, বড়বাজার, চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ…অফুরন্ত বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটা যেন টনটন করিতে থাকে, অথচ এদিকে পলক ফেলাও যায় না। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের গৃহিণী গিরিবালা, বিস্ময়ের আকুলতা প্রকাশ করিবার বয়স নাই, তবু দ্বিতীয় দিন সব দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া গল্প-গুজবের মধ্যেই একবার অহেতুক ভাবেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভাইয়েরা প্রশ্ন করিতে বলিলেন—"তোরা হাসবি, কিন্তু তবু না বলে থাকতে পারলাম না—তোদের কাছে তো দুলারমনের গল্প করেছিলাম

সে বার—সেই তার বরের কলকাতায় পালিয়ে আসবার কথা ?—এইবারে ভাবছিলাম তোদের বলব একটু খোঁজ করতে···ভাগ্যিস বলিনি !”

আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“তা দোষ দিবি কি করে বল ?—দ্বারভাঙ্গায় থাকি, রাজার সহর—কলকাতা বড়লাটের সহর না হয় তার চার গুণই হবে ; বাবাঃ, এ কী কাণ্ড রে !”

সামনের দু'-এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়ও হইল, ক্রমে আলাপ গাঢ় হইয়া উঠিল। শিবপুরের একটা মস্ত-বড় সুবিধা কলিকাতার পাশে থাকিয়াও সেটা একটা মফঃস্বল সহরেরই মতো,—বেশি ভাগ রাস্তাই অপরিসর —প্রায় গলির মতো, দোকান-পাট কি গাড়ি-ঘোড়ার বালাই নাই তত। সাঁতরার ধরণেরই, শুধু, বাড়িগুলা একেবারে গায়ে গায়ে লাগা ! বেশ লাগে, দুপুরবেলা জেঠাইমার সঙ্গে পাশের বাড়ি, সামনের বাড়ি, তাহার পর আবার তাদের সংযোগে কাছের বা অল্প দূরের অন্য সব বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো। কাছেই চৌধুরীদের বড় পুকুর, কাক-চক্ষুর মতো জল, মেয়েদের জন্য আলাদা ঘাট ; ওদের শিবমন্দিরের পাশ দিয়া—দূর্বা ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর দিয়া নিত্যই পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া স্নান করিতে যান, ফিরিবার সময় মন্দিরের উঁচু চাতালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে সমস্ত শরীরটি এমন একটি মধুর শুচিতায় ভরিয়া যায় যে, এক একদিন চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া ওঠে।···কেমন যেন নিজের ঘর, নিজের দেশের পদ্ধতি ; এখানকার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলা হইয়া ওঠে নূতন করিয়া সরস, নূতন ভাবে অর্থবান !···গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা হইলেও বেশ সঙ্গিনী জোটে, বাজারের ভিড়ের মধ্যে দিয়া লঘুগতিতে চলিয়া যান সবাই, জেটির পাশে স্নানের ঘাটটিতে একটু গড়িমসিও করেন —উন্মুক্ত স্থান, প্রশস্ত নদী,—মনটা একটু তরল হইয়া ওঠে, মনে হয় সত্যই যেন মায়ের বুকের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এক এক দিন সঙ্গিনীদের কাহারও কাহারও পরিচয়ের জের ধরিয়া আরও নূতন পরিচয় হয়—সাঁতরার গঙ্গার ঘাটের মতোই। ফিরিবার পথে রাস্তার ধারেই কালীতলায় প্রণাম করিয়া পূজা দেন ; প্রণাম করিবার সময় বুকটা ভরিয়া ওঠে—মা কেন এমন ভাবে গেলেন ?—অহি কোথায় ?—দ্বারভাঙ্গার সবাইকে তুমিই দেখো মা,—তোমার ভরসাতেই সবাইকে ফেলে এসেছি··আরও সব কত কি কথা, ভালো মত বোঝা যায় না ; শুধু একটা অসীম নির্ভরতার সঙ্গে মনটা থমথম করিতে থাকে।···আনন্দেরই তো উপকরণ, কিন্তু তবুও যে মনটা কেন আর কি করিয়া বিষাদে গড়াইয়া পড়ে, গিরিবালা আশ্চর্য হইয়া যেন কূল পান না।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন বাপের কাছেই কাটান, সেবা করিয়া গল্প-গুজব করিয়া ; অবশ্য রসিকলাল যদি থাকেন বাড়িতে। রসিকলালের জীবনটা আবার একটু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে ; গিরিবালার অনুরোধ-অভিমানে এখন তবুও অনেকটা নিয়মাধীন হইয়াছেন, নচেৎ নাওয়া-খাওয়ার একেবারেই ঠিক থাকে না—হয়তো কোন মঠে গিয়া সমস্ত দিনটাই কাটাইয়া দিলেন, নয়তো কোন নূতন সাধু দর্শন, কি, কোথায় কথকতা হইতেছে, কালী-কীর্তন হইতেছে ; এক একদিন গঙ্গার ধারে কোনও নির্জন জায়গায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন হয়তো প্রহর দুয়েক রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া গেছে। গিরিবালা থাকিতেও কয়েক দিন এই রকম হইয়া গেল। এক একদিন সকাল-বেলায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া ফিরিলেন সন্ধ্যার একটু প্রাক্কালে। পূর্ব হইতেই বৌয়েদের উপর শপথ দেওয়া, তাঁহারা আহার করিয়া লন, বসন্তকুমারী আর গিরিবালা ভাত আগলাইয়া উপোস করিয়া রহিলেন।....গিরিবালা একটু বেশি অভিমানেই অশ্রুমুখী হইয়া বলিলেন—"তুমি এমন করে আর বাঁচবে না বাবা ; তুমিও যাবে আর জেঠাইমাও যাবেন।"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"জেঠাইমার থাকবার ভারি সাধ !....কিন্তু ওঁর শরীর তো পাত হচ্ছে এই করে করে।"

রসিকলাল আসনে বসিতে বসিতে হাসিয়া বলিলেন—"যত বাঁচবার দায় আমার, না ?"

বসন্তকুমারী মুখ ভার করিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"ঐ শোন্, সমস্ত দিনের পর ভাতের আসনে বসতে বসতে কথার ছিরি শুনলি তো ? কিছু আর বলি না।....হ্যাঁরে গিরি, এই তিনটে অপোগণ্ডকে সংসারে বসিয়েছ এখন একটু…"

অন্নের গ্রাস তুলিতে তুলিতে রসিকলাল থামিয়া গেলেন, হাসিয়া বলিলেন—"সংসার পেতে দিলাম, দেখে-শুনে করুক সব,—সেই গল্পের বুড়ির মতো আমায় আবার কুলগাছ আগলে বসে থাকতে হবে নাকি ?....সে বরং তুমি করো—চুলগুলো শণের নুড়ির মত হয়েছেও—"

অট্টহাস্যই করিয়া উঠিলেন।

এঁরা দুজনেও না হাসিয়া পারিলেন না। বেগটা থামিলে রসিকলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তা নয় গিরি, শোন্—আমি হয়েছি গুরুমশাই-মরা পাঠশালের পোড়ো, আমায় এখন পায় কে ? না বিশ্বাস হয় এখনও ঐ সাক্ষী রয়েছে তোর জেঠাইমা—আমি চিরকালটাই এই রকমটা ছিলাম না নিজের খেয়াল নিয়ে ?

বন-বাদাড়, নদীর চর, চষা মাঠ, এ-গ্রাম, সে-গ্রাম....কে আমায় ফাঁদে ফেলে...”

গলাটা ধরিয়া আসিল, পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবেগটাকে যেন ঠেলিয়া রাখিবার জন্যই এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া লইলেন; একটু অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিয়া আবার বলিলেন—“কেন, ফাঁদে পড়বার পরও তোয়াক্কা রাখিনি—অনেক দিন পর্যন্ত, থাকতেন পণ্ডিতমশাই, ভজিয়ে দিতাম।...তারপর ফাঁদ কষে কষে আমায় একেবারে জখম করে নিজে কেমন টপ করে পড়লেন সরে!”

আবার বুকে যেন কি ঠেলিয়া উঠিল, একটু গলা-খাঁকারি দিয়া সেটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—“আমি গুরুমশাই-মরা পাঠশালের পোড়ো...আমায় আর এখন....”

আর রোখা গেল না, বাঁ হাত দিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইলেন। এঁদের দুজনের চোখেও অঞ্চল, বসন্তকুমারী অঞ্চল সরাইয়া বলিলেন—“আর খেতে বসে চোখের জল ফেলতে হবে না...পূজা-অর্চা, সাধুসঙ্গ এই সব নিয়েই তো রয়েছ, মানা করতে যাব কেন? তবে যত দিন গিরিটা রয়েছে, অন্তত খাবার সময়টুকু ঠিক রেখো একটু—এই রকম উপোস করে থাকবে ভাত কোলে করে?”

আরও একদিন এই রকম একটু অনিয়মের ব্যাপারে প্রসঙ্গটা উঠিল, তবে এবার আর রসিকলালের সামনে নয়। আলোচনার শেষে বসন্তকুমারী বলিলেন—“তাই বলি গিরি—ছোট-বৌ বেশ গেল, আমি যে কী দেখবার জন্যে রইলাম পড়ে....ভয় হয় এক-একবার ভাবতে গিয়ে।”

সেদিন আর সব কথা বাদ দিয়া মায়ের যাওয়া লইয়াই গিরিবালার মনটা পড়িয়া রহিল। সত্যই কি মা গেছেন ভালো?....গিরিবালার মনটা সমস্ত সংসারটির উপর দিয়া যেন একবার ঘুরিয়া আসিল।—দুই ভাইয়ে ভালো কাজ করিতেছে, কিশোরও শীঘ্র একটি পাইবে। বাড়ি আলো-করা দুটি-বৌ। সবচেয়ে বড় কথা—সংসারের আগের ঠাটটি বজায় আছে, বরং এদের সংসারের বাহার বোধ হয় আরও বেশি,—তাঁহারা ছিলেন দুই সহোদর ভাই, এঁরা খুড়তুত জেঠতুত হইয়াও অভেদ।...কিন্তু মা বরাবর অনটনের ভাবটাই দেখিয়া গেলেন! যখন নূতন গাছে কচি পাতা দেখা দিল, ফুল ফুটিবে, ফল ধরিবে, তিনি সরিয়া পড়িলেন।...ব্যথিত কণ্ঠে গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—“এই মার যাওয়ার সময় হোল জেঠাইমা?”

বসন্তকুমারী বলিলেন—"হ্যাঁ, গিরি, বুঝছিস না তুই, এই তো যাওয়ার উপযুক্ত সময়। ছোট-বৌ ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল।"

মাঘের শেষ। পশ্চিমে থাকিয়া এখানকার শীত আর গায়ে লাগে না, তবে ক'দিন থেকে একটু মেঘ বৃষ্টি হইয়া ঠাণ্ডাটা একটু পড়িয়াছে! সেদিন আবার আকাশ একটু বেশি ঘোরালো, মনটা বাইরে থেকে যেন ক্রমাগত নিজের মধ্যে গুটাইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। একাদশী, জেঠাইমা সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। দুই বৌয়ে রান্নাঘরে, বাবা বাইরের ঘরে, একতারার একঘেয়ে আওয়াজের সঙ্গে গুন্-গুন্ করিয়া একটি রামপ্রসাদী গাহিতেছেন, ভাইয়েরা ক্লাবে গেছে। ছেলেরা রান্নাঘরে,—ভাত-ডাল যে হইয়া উঠিল, চোখের সামনে এই প্রমাণের সান্ত্বনা রাখিয়া মামিরা গল্প বলিতেছে।

কোলের মেয়েটিকে লইয়া গিরিবালা বিছানায় গিয়া শুইলেন। আজ কি হইয়াছে, মায়ের যাওয়ার কথাটা ক্রমাগত মনে যাওয়া-আসা করিতেছে—কত বিচিত্র অর্থের সাজ পরিয়া।···মনটি গিয়া পড়িয়াছে দ্বারভাঙ্গায়, অনেক দিন চিঠি পান নাই····জোর করিয়াই জেঠাইমার কথাটা মানিয়া লইতেছেন গিরিবালা,—তা'তো বটেই, ভালো যাওয়া তো এই—তবু কি একটা বিষাদে মনটা পূর্ণ হইয়া ওঠে—এই দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দু'জনের একটি মাত্র আশা—শশাঙ্ক, শৈলেন, হরেন বড় হইয়া উঠিতেছে, দুঃখ ঘুচিবেই,—সবাই বলিতেছে, সূত্রপাতও আরম্ভ হইয়াছে—শশাঙ্ক তো দিয়া আসিল পরীক্ষা, লিখিয়াছে—পাস করিবই।····গিরিবালার মনটা সার্থকতার এই রঙিন সূত্র ধরিয়া আগাইয়া চলে—তিন জনে একটার পর একটা করিয়া পাস দিয়া চলিয়াছে—পিছনে আসিতেছে এরা তিন ভাই····ধীরে ধীরে বধূতে, সম্পদে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে····নবনীর মতো নাতি-নাতনিরা সংসারের প্রাঙ্গণে নূতন পা ফেলিল····এই সময় মায়ের মতো না বলা না কওয়া, ঝপ্ করিয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে····একটু আগে হইলে বোধ হয় আরও ভালো।

তা না হইলে····ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়····এই তো অহি গেল! কাহার মনে কি আছে কে জানে?····মা যেন উপর থেকে আশীর্বাদ করেন।

গিরিবালা খুকির মাথা থেকে বাঁ হাতটা সরাইয়া লন, দুইটি হাত একত্র করিয়া বার বার কপালে ঠেকান।—আশীর্বাদ করো মা, আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মতন সব বজায় রেখে যেতে পারি।

এক এক সময় কী যে হয়, চারিদিক্ দিয়া একই ধরণের ভাবের স্রোত

আসিয়া পড়ে। হঠাৎ কিশোরের গলা কানে গেল—"বড় বৌদি আমাকে শীগ্‌গির ভাত দাও। এক হাঙ্গাম হয়েছে।"

প্রশ্ন হইল—"কি হোল গা ঠাকুরপো ?"

"চাটুজ্জেদের ছেলেটা মারা গেল, এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে।"

গিরিবালার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, ধড়মড়িয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, ভীত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিলেন—"কত বড় ছেলে রে কিশোর ? কেন ?—কি হয়েছিল যে ?...."

কিশোর দিদিকে হঠাৎ এত ব্যাকুল দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, তাহার পর কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন—"তাদের তুমি জানো না, অনেক দিন থেকেই ছেলেটি নানান্ খানায় ভুগছিল।....এই দুর্যোগে ভোগান্তি দেখো না ?"

গিরিবালা সেই রকম ব্যাকুল ভাবেই বলিলেন—"নানান খানায় ভুগছিল,.... কিন্তু ছেলেই তো ?"

কিশোরের উত্তরে সম্বিৎ হইল যে কথাটা একটু বেখাপ্পা হইয়াছে ; কিশোর জামা খুলিতে ঘরে গিয়াছিলেন, সেখান থেকেই একটু হাসিয়া নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন—"কিন্তু চিত্রগুপ্ত সে কথা শুনবে কেন দিদি ?....কৈ গো, ভাত বাড়লে বৌদি ?"

কিন্তু কথার ভুলটা বুঝিলেও গিরিবালার মনটা বড় তোলাপাড়া করিয়া উঠিল। ছেলে লইয়া এই রকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কেন এই রকম একটা উৎকট খবর আসিয়া পড়িল ? খানিকক্ষণ ছটফট করিয়া ঘর-বারান্দায় পায়চারি করিলেন। কিশোর খাইতে গিয়াছেন, একবার দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভয় হইতেছে—আবার এমন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া ফেলিবেন না তো যাহাতে মনের চাঞ্চল্যটা ধরা পড়ে ! অথচ যেন কিছু বলা দরকার ; নিজেই বুঝিতেছেন মুখটা শুকাইয়া গেছে। বলিলেন—"ছেলেগুলো এখনও খায়নি বৌ, ওদের সকাল সকাল ঘুমোনর অব্যেস !"

অত্যন্ত কর্কশ লাগিল নিজের কানেই, কি করিয়া যে কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইল !—আর কেনই বা যে !

দু'টি বৌই যেন একটু কাঠ মারিয়া গেলেন। বড়বৌ সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"এই হোল দিদি, ঠাকুরপো উঠলেই..."

গিরিবালা ততক্ষণ চলিয়া গেছেন।....ছেলেদের কথা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে এ কী দুঃসংবাদ !—এমন হওয়া খুব খারাপ নাকি ? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায় ? কি ভাবেই বা তোলা যায় প্রশ্নটা ?....জেঠাইমার পায়ের কাছে বসিয়া

পা দুইটা কোলে টানিয়া লইলেন, কয়েকবার টিপিয়া প্রশ্ন করিলেন—"জেঠাইমা জেগে ?"

একটা ক্ষীণ উত্তর হইল, আজ উপোসটা লাগিয়াছে বেশি, কয়েক বারই বলিয়াছেন। গিরিবালা আর জাগাইলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ পা দুইটা টিপিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে হাত থামিয়া যাইতেছে।....এ রকম ভাবনার সঙ্গে একটা খারাপ খবর মিলিয়া যাওয়া কুলক্ষণ নয় তো ?...নিজেই প্রবোধ লইতেছেন—না, তা কেন হতে যাবে ? তা কি হয় ? ভাবনায় লোকের মনে অমন কত রকম ওঠে....

"দিদি, আসি গো ; দোরটা দিয়ে যাও কেউ।"—বলিয়া কিশোর চলিয়া গেলেন। গিরিবালার বুকটা আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সদরের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন। রসিকলাল গানে একটা যতি দিয়া বলিলেন—"বোস্ গিরি। খেলে ছেলেগুলো ?"

"বসেছে বোধ হয় বাবা। রান্নাঘর আগলে না থেকে বড় দুটোও যদি তোমার কাছে একটু বসে...."

রসিকলাল হাসিয়া বলিলেন—"রান্নাঘরের কাছে দাদামশাই !....আসে বই কি, আমার কাছেই তো থাকে সারাক্ষণ।"

পিন্-পিন্ করিয়া একতারার আওয়াজ উঠিল, এখনই গান সুরু হইবে। গিরিবালা খুব সহজ ভাব ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"চাটুজ্জেদের ছেলেটা মারা গেল বাবা।"

বাপের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন এবং বুঝিলেন নিজের মুখে সহজ ভাব একেবারেই নাই।

রসিকলাল আঙুল থামাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোন্ চাটুজ্জে ?"

জানা নাই। জানা নাই অথচ এত দুশ্চিন্তা, গিরিবালা বাপের মুখের পানে একটু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন—"ঐ যে গো, ছেলেটি ভুগছিল অনেক দিন থেকে...."

"তোর গর্ভধারিণী বেশ গেল গিরি।"—বলিয়া মন থেকে একটা ক্রমবর্ধমান আবর্জনাকে যেন ঠেলিয়া রাখিয়া রসিকলাল বলিলেন—"থাক্ ও-সব কথা গিরি, শোন্, একটা নতুন গান বেঁধেছি।"

একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"গানের কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; —ছেলেবেলায় তোকে সেই বর্ষার সকালে ঘটা ক'রে পদ্য শোনাবার কথা মনে পড়ে গিরি ?—ছোটবৌ সেই রান্নাঘর থেকে ভিজতে ভিজতে এসে...."

হাসিটা যেন ভুল পথে আসিয়াছে বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গেই গা ঢাকা দিল। রসিকলাল তাড়াতাড়ি তানপুরায় আঙ্‌লের টান দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

খেলা আমার শেষ হোল মা,
এবার অমানিশার ভোরে,
নাও মা ডেকে মুছিয়ে মলা,
নাও মা তুলে কোলে ক'রে····

৭

এই সময় আর একটি ব্যাপার ঘটিল।

সন্ধ্যা হইতে একটু বাকি আছে। কলে জল নাই; একটা রেকাবি ধোয়ার প্রয়োজন ছিল, গিরিবালা খিড়কির পুকুরের দিকে গেছেন। দুইটা ধাপ নামিয়াছেন, দেখেন ডান দিকে পুকুরের ধার দিয়া একটি মেয়েছেলে ধীরে ধীরে এদিক্ পানে চলিয়া আসিতেছে। পরনে একটা মলিন, খাটো ডুরে শাড়ি, আঁচলের দিকটা বাঁ হাতে করিয়া বুকের মাঝখানটি জড়ো করা, গায়ে আর কিছু নাই। মেয়েটির রং আধময়লা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে।

জেলেরা পুকুরে মাছের চারা ছাড়িয়াছে, কখন কখন মেয়ে হোক, পুরুষ হোক, কেহ কেহ আসে তদারকে—চারিদিকেই বাড়ি, মাছ চুরি যায়।···· গিরিবালা তাদেরই একজন ভাবিয়া প্রথমটা গা করেন নাই, তাহার পর ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইল।

খুব সন্তর্পণে আর খুব আস্তে আস্তে বেশ একটু লম্বা লম্বা পা ফেলিয়াই মেয়েটি অগ্রসর হইতেছে। দু'-এক ধাপের পরই দাঁড়াইয়া, মাথাটা নিচু করিয়া গভীর অভিনিবেশে জলের মধ্যে কি যেন দেখিতেছে, আবার আগাইয়া আসিতেছে। তখনও বোধ হয় অতটা কিছু ভাবেন নাই, তাহার পর হঠাৎ একবার মুখটা তুলিয়া গিরিবালার পানে চাহিল—অদ্ভুত এক শূন্যদৃষ্টি! সেকেণ্ড কয়েক চাহিয়াই আবার মুখ নিচু করিয়া সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান —একটা মানুষ যে সামনে আছে কোন খেয়ালই নাই যেন।

আরও দুই ধাপ অগ্রসর হইলে গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন "—কে বাছা তুমি ?"

মেয়েটি এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল; স্থিরদৃষ্টিতে গিরিবালার পানে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল যেন প্রশ্নের মানেটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না।

গিরিবালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করছ তুমি এখানে? কে তুমি?"

এবার কতকটা যেন অর্থটুকু বোধগম্য হইয়াছে এই ভাবে বলিল—"খুঁজছি"

"কি খুঁজছ?"

আবার সেই রকম অবুঝ, অপলক দৃষ্টি।

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় বাড়ি তোমার? সন্ধ্যে হয়ে এলো, এ-রকম করে..."

মেয়েটি এ-কথাগুলো যেন একবর্ণও বুঝিল না, পূর্ব-প্রশ্নের উত্তর দিল—"ছেলে।"

গিরিবালার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন—"ছেলে?—এখানে..."

"কে গা দিদি? কার সঙ্গে কথা কইছ?"—বলিতে বলিতে বড়-বৌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মেজবধূও আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন। দুইটা নূতন লোক যে আসিয়া দাঁড়াইল, মেয়েটির সে-বিষয়ে কোন চৈতন্যই নাই, গিরিবালার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া উত্তর করিল "দু'বার হারালো কি না—একবার জলে, একবার আগুনে।"

মেজবৌ কতকটা স্বগত ভাবে বলিলেন—"পাগল।"

মেয়েটি এবার যেন একটু ব্যস্ত-দৃষ্টিতে তাঁহার পানে ঘুরিয়া চাহিল, বলিল—"না না, পাগল নয়, ছিল—ছিল যে...."

একবার যেন নিরুপায় ভাবে চারিদিকে চাহিল, যেন কি প্রমাণ দিয়া বিশ্বাস করাইবে বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার পর আবার মেজবধূর মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া বিশ্বাস করাইবার জন্য কাতর অনুনয়ের স্বরে বলিল—"হ্যাঁ, ছিল গো..."

বাহিরে কোথা হইতে কিশোর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। "তোমাদের কিসের জটলা গা?—বলিতে বলিতে খিড়কির দিকে আসিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; দুইদিকেই প্রশ্ন করিলেন—"এ কোথা থেকে এলো?....তুমি এখানে কি করছ?"

অচঞ্চল চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; বুদ্ধিহীন একটা অদ্ভুত দীপ্তি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিশোর আর একটা কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন,—"যাই' দেরি হয়ে যাচ্ছে।"—বলিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর

যেন সময় নাই এইভাবে এবার একটু দ্রুত ভাবেই সেই রকম খুঁজিতে খুঁজিতে পুকুরের অন্য দিক দিয়া ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর পুকুরে নামিতে গিরিবালার কি রকম একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়িল, দোরটা দিয়া সকলে ভিতরে চলিয়া আসিতে কিশোর বলিলেন—"এ মেয়েটার কথা তোমাদের বলিনি, না?"

গিরিবালা বলিলেন—"না, কৈ বলিস্‌নি তো; পাগলই বোধ হচ্ছে।"

বারান্দার জানালার খাঁজে আধ-বসা হইয়া কিশোর বলিলেন—"পাগল তো বটেই, সেদিনে কিন্তু বড্ড ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল।....বোস না দিদি চৌকিটার ওপর, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার...."

বড়বৌ বলিলেন—"ছেলে মরে গিয়ে ঐ রকম হয়ে গিয়েছে আর কি।"

কিশোর শুরু করিতেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গিয়া বলিলেন—"না, থাক্‌, কাজ নেই শুনে।" তাহার পর গিরিবালার জিদেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"সে-দিনে চাটুজ্জেদের ছেলেটাকে দাহ করতে গেলাম না?....বেশই খানিকটা রাত হয়ে গেল, ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন একটার ওপর হয়ে গেছে। চিতা-টিতা সাজিয়ে আগুন দিতে প্রায় দুটো হয়ে গেল। তেমনি শীত সে দিন, ওদিকে আকাশে মেঘ করে আছে, হাওয়াও দিচ্ছে; পাঠক-মশাইকে শ'য়ের কাছে রেখে আমরা সবাই ঘরের ভেতর গিয়ে দোর দিয়ে বসলাম। ওদের বোতল আছে, গাঁজার ছিলিম আছে, কম পক্ষে বিড়িটা তো আছেই পকেটে, গরম হয়ে গল্প জুড়ে দিলে। সব ভুতুড়ে গল্প, দাহ করতে গিয়ে কবে কে কি দেখেছে না দেখেছে—সেই সব কথা। আবার সাঙেল জুটেছে, খুব জমে উঠল গল্প। আমি এক কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, অনুকূলের ডাকাডাকিতে ঘুমটা গেল ভেঙে। প্রথমেই তো মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—এ আবার কোথায় বসে আছি!....তার পরেই সব মনে পড়ে গেল, জিগ্যেস করলাম—'কি বলছিস?' অনুকূল বললে—'যা, এবার তোর পালা, আগুনটা ঠিক জ্বলছে কি না দেখে আয় একবার।' বললাম—'একলা?'....'একলা নয় তো দোকলা কোথায় পাবি? দেখছিস্‌ তো বোতল খালি করে সব ফ্ল্যাট হয়েছে; পাঠকমশাই সুদ্ধ। আমি আর সদানন্দ শুধু জেগে আছি, দুজনে পালা করে দেখে এলাম, এবার তোর পালা।'....সদানন্দ উড়ে, পাঠকের হোটেলে কাজ করে, একটু দূরে গাঁজা সাজছিল, আমি তারই ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলাম, বললাম—'আমি

ভয়কাতুরে মানুষ সদানন্দ, তায় এই রকম রাত....' 'সে আমিও ভয়....' বলে সদানন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে 'আমি পারব না' বলে ঘাড়ের ওপর হাতটা নেড়ে ঘুরে বসে কলকে সাজতে বসল। অনুকূল বললে—'তুই-ই যা, আর প্রায় ভোর হয়ে এল, ভয়ের কি আছে? আর তুইতো সমানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলি, গল্পগুলোও শুনিসনি যে কথা। যতে সাওেল যা একখানি হাঁকড়েছিল শুনলে আর....কি বলো সদানন্দ?'

আর একটু চেষ্টা করে শেষে আমাকেই উঠতে হোল। দোরটা একটু খুলে রাখতে বললাম, অনুকূল বললে—'দোরের ফাঁক দিয়ে যা হাওয়া ঢোকে তা আরও সাংঘাতিক; তুই যা না, একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দিয়ে চলে আসবি, এই তো রয়েছি আমরা।'

শেষ রাত্তিরে অমন ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়েছে, আমি চোখ কচলাতে কচলাতেই বেরিয়ে গেলাম, ওরা দোরটা বন্ধ করে দিলে।

শ'য়ের কাছে এসেই আমার সমস্ত শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল। প্রথমটা ভাবলাম বুঝি চোখ রগড়েছি তাই এই রকম হোল, আবার একবার ভালো করে মুছে নিয়ে দেখি—না, ঠিক,—একটা আধ-বয়সী মেয়ে হাঁটুর ওপর দুটো হাতের ভর দিয়ে একেবারে ঝুঁকে শ'য়ের মাথার দিক্‌টায় একঠায় চেয়ে আছে। চুল একেবারে এলো আর ভিজে, পরনে গাছকোমর করে বাঁধা একটা খাটো শাড়ী, আর দ্বিতীয় কিছু গায়ে নেই। সব থেকে ভয়ঙ্কর চেয়ে থাকাটা—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঠায় শিয়রের দিক্‌টায় চেয়ে আছে। অন্ধকার, থমথমে মেঘ, শ্মশান, সামনে গন্‌গনে চিতা জ্বলছে, আর ঐ মূর্তি!—অবস্থাটা বুঝতেই পার। চেঁচাতে গিয়ে যেন গলা বেঁধে গেল, পালাতেও যেন পা উঠছে না, মনে হোল পেছন ফিরলেই একটা কিছু ঘটবে। তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক ধরণের সাহস এসে গেল কোথা থেকে। মানে, ভূতের ভয়টা রইল না, তখন অন্য ভয় এসে জুটল,—পিচাশ-সিদ্ধ নয় তো? হয় তো শবদেহ খাবার জন্যে এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমটা ভাবলাম যা হয় করুক, আমি সরে পড়ি, আর আছেই বা কি যে খাবে? তার পর মনে হোল, না, এটা খুবই অন্যায় হয়। আমি আর কিছু না ভেবে—'অনুকূল!' বলে একটা হাঁক দিলাম। একে হাওয়া তায় গলাটা হঠাৎ এমন খাটো হয়ে গেল যে ভেতরে কেউ শুনতেই পেলে না। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার হোল, ডাকটা শুনেই মেয়েটা একেবারে সিদে হয়ে আমার দিকে চাইলে। সে যে কী মূর্তি, দিদি, এখনও যেন আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে

আছে,—ঠোঁট দুটো চাপা কটমট করছে চাউনি, তার মধ্যে চিতের আগুনের শিখাগুলো কাঁপছে, এলো চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে গায়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরেও চিতের একটা আলো পড়েছে···সকলের ওপরে সেই চাউনি—বাপ! ···কিছু একটা হোল এই—ঠিক এই ভাবে আমি যে কি করে দাঁড়িয়ে আছি, আমিই জানি। তার পর ওরই মধ্যে কোথা থেকে একটু বুদ্ধি ফিরে এল। আর কাউকে না ডেকে, ওকেই মরিয়া হয়ে খুব নরম গলায় জিগ্যেস্ করলাম —"কে মা তুমি? কি দরকার এখানে তোমার?

চাউনি আর মুখ থেকে ফেরে না, তবে আস্তে আস্তে যেন একটু নরম হয়ে এল, আমি আবার জিগ্যেস করলাম—'বলো মা, তুমি কে, কি চাও?

বললে—'খুঁজছি।'

'কাকে খুঁজছ?'

'ছেলেকে। একবার জলে হারালাম, একবার আগুনে। নেই এখানে? দেখো না।'

চোখের সেই কড়া চাউনি আর নেই,—কত যেন কাতর ভাব, কত মিনতি!

আমার তখনও গা'টা বেশ ছম-ছম করছে, কিন্তু লোক ডাকবার একটা সুবিধে পেলাম, বললাম—'তুমি দাঁড়াও আমি ডেকে আনছি সবাইকে, তার পর দেখব খুঁজে।'—বলে, মাঝে মাঝে পেছন দিকে চাইতে চাইতে ঘরের দিকে চলে গেলাম।

অনুকূল পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে, দোর খোলাতে, তার পর ওদের বুঝিয়ে বিশ্বাস করাতে খানিকটা সময় গেল। সবাই অবশ্য উঠলও না। যখন বাইরে এলাম—কেউ নেই। তখন আমায় নিয়ে সবাই পড়ল; হাজার বলি, বিশ্বাস করতে চায় না; যতে নিজে অমন গল্প করে, সে পর্যন্ত নয়, বললে—'ধন্যি বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য, গাঁজা খেলাম কারা, আর নেশা হোল কার!'

আমার তখন কেমন জিদ চেপে গেল। এরা সবাই জেগেছে, ভোর ভোরও হয়ে এসেছে, আমি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। ঐ শ্মশানঘাটের বাড়িটুকু, তার পরেই মাঠ, ওদিকে গঙ্গা—কোনখানে কিন্তু আর তাকে পেলাম না। একবার কি মনে হোল চেঁচিয়ে উঠলাম—'কোথায় গেলে গো বাছা? এই পেয়েছি দেখোসে।'···কার উত্তর দিতে বয়ে গেছে?

ফিরছি, দেখি গোপাল ব্রহ্মচারী ঘাটের ওপর বসে, যেমনি কেন শীত হোক্, ওর চারটের সময় চাই কি না নাওয়া। জিগ্যেস করলাম—'ঠাকুরদা', একটি মেয়েকে শ্মশানের দিক্ থেকে এসে এদিকে যেতে····'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন কিশোর, গিরিবালার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নামিয়া গেছে ; যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করিলেন—"কি বললেন তিনি ?"

এমন অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, কিশোর কোন মতেই উত্তরটা আর চাপিতে পারিলেন না। যন্ত্রচালিতের মতোই কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে সবটুকু বলিয়া গেলেন। বলিলেন—"ব্রহ্মচারী বললে—পাগলিটার কথা বলছ ?—সে আবার গঙ্গার ধারে ধারে খুঁজতে খুঁজতে ঐদিকে চলে গেল ; আগুনে পেলে না তো...."

তান্ত্রিকের কড়া প্রাণ, বলে, একটু হাসলেও।

আবার একটু চুপ করিলেন কিশোর। কিন্তু ভুল বা অন্যায়ের একটা সম্মোহন শক্তি আছে ; অনুচিত জানিয়াও তিনি নিজের মন্তব্যটুকু পর্যন্ত দিয়া সমস্ত কাহিনীটুকু পূর্ণ করিয়া দিলেন, বলিলেন—"হয়েছে কি বুঝলে না ? ছেলেটা আগে জলে ডুবে মারা যায়, তার পর তাকে নিয়ে গেছে দাহ করতে।.... সেই মেয়েটাই এসেছিল, তাই জিগ্যেস করলাম না ?..."

মনের উপর একটা দুর্বহ চাপ গিরিবালা যেন আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না, মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, বাবাঃ !"

ভুল যে হইয়াছে এটা বুঝিতে বেশি বিলম্ব হইল না। রাত্রিটা গিরিবালা বড় বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক রহিলেন। পরদিবসও ভাবটা সেই রকমই রহিল, বাড়তির মধ্যে বাড়ি থেকে অনেক দিন কোন খবর না পাওয়ার কথা কয়েক বার বলিলেন, এবং আরও যাহা করিলেন, তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই অহির উল্লেখ করা। অহির প্রসঙ্গটা গিরিবালা এক রকম তোলেনই না—কারণটা বলা যায় না, হয় তো স্বামীর শপথ দেওয়া আছে, হয় তো জীবনের যা সব চেয়ে নিবিড় বেদনা মানুষ তাহাকে লোক-সমক্ষে আনিতে চায় না ; অন্য কোন কারণও হইতে পারে, তবে এ-দিনে গিরিবালা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া অহির স্মৃতিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন।

শেষে আশঙ্কাটা তৃতীয় দিনে ফলিলই। মায়ের মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে অহেতুক ভাবেই যে একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিয়াছিল, চাটুজ্জেদের ছেলের মৃত্যু-সংবাদ সেটাকে নিতান্ত অহেতুক ভাবেই পুষ্ট করিল, খিড়কিতে পাগলির সাক্ষাৎ সেটাকে প্রায় চরমের কাছাকাছি ঠেলিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পরই আসিল কিশোরের এই উগ্র কাহিনী—পুত্রশোকের একটা নিদারুণ চিত্র চিতার আলোকেই যেন নিজের উৎকট ভীষণতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনের

উপর এতটা চাপ সহিল না। গিরিবালা তৃতীয় দিনের সকাল হইতেই একেবারে এক শত তিন ডিগ্রি টেম্পারেচার লইয়া জ্বরে পড়িলেন ; শীঘ্রই সেটা আরও বাড়িয়া ভুল বকা আরম্ভ হইয়া গেল। শুধু অহির কথা—"আমায় বেরিয়ে খুঁজতে দিচ্ছ না কেন তোমরা ?—আমি তাকে বের করবই···আসছি অহি—বাবা আমার, কেঁদো না···দুখ্‌নাকে-চাচি, এই দুটো টাকা—আরও দোব, এখন হাতে নেই—বড়মঠাকুরের চালাটা সারিয়ে দিয়ে বল্ তিনি যেন অহিকে শীগ্‌গির নীরোগ করে দেন—বলিস্ দুখ্‌নাকে-চাচি····"

একটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। বিপিনবিহারীকে তার করিতে হইল, তিনি যেন অন্ততঃ শশাঙ্ককে লইয়া পরের গাড়িতে চলিয়া আসেন।

অহির মৃত্যুর পর প্রায় আট বৎসর কাটিয়া গেছে। অনেকেই ভুলিয়াছে, বোধ হয় কম-বেশ করিয়া সবাই। সকলে ভাবিল ঐ সবাইয়ের মধ্যে বোধ হয় মা-ও আছে—আট-আটটা বছর—একটা যুগের কাছাকাছি যে !

এই একটি মাত্র মানুষ যে শুভঙ্করীর সব মাপ-জোখের বাইরে সেটা সব সময় সবার স্মরণে থাকে না।

৮

অসুস্থতা সমেত এই ঘটনাটুকু গিরিবালার দ্বারভাঙ্গায় ফিরিয়া যাওয়া আরও মাস দুয়েক পিছাইয়া দিল। নিস্তারিণী দেবী বধূর মন চেনেন, ছেলে লইয়াই চরম রকমের কিছু একটা হইয়াছে, টেলিগ্রামের ধরণে এই রকম গোছের একটা আন্দাজ করিয়া শশাঙ্কর সঙ্গে হরেনকেও পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় সবগুলিকেই কাছে পাইয়া গিরিবালার শরীর এবং মন বেশ দ্রুতই আবার ঠিক হইয়া উঠিল। তাহার পর বিপিনবিহারী ওদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিদায়ের বেদনার কথা আলাদা, কিন্তু গিরিবালা নিজে যখন শিবপুর ছাড়িলেন তখন তাঁহার মনটা প্রফুল্লই। অমন একটা আঘাত পাওয়ার পর তাঁহাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টার মধ্যে দিয়া বাড়িটাতে যেন একটা নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। পাশের বাড়ির একটি বৃদ্ধা নিতান্ত অকারণেই কেমন করিয়া গিরিবালাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন, বেশি আনাগোনায় জেঠাইমা বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁহার একটি নিবিড় সখ্য আসিয়া পড়িল। জেঠাইমার মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর ক্রমে ঘনাইয়া উঠিতেছিল সেটি গেছে ; বেশ লাগে এখন দুটি বৃদ্ধাকে একসঙ্গে দেখিতে—মা-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন।

প্রফুল্লতার সব চেয়ে বড় কারণ পিতার মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন দেখিয়া যাইতেছেন গিরিবালা ; তাঁহারই মনে কোন রকম উদ্বেগ দুশ্চিন্তা না আসে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে রসিকলালের মধ্যে অনেকখানিটাই নিয়মানুবর্তিতা আসিয়া পড়িয়াছে। শরীরও ফিরিয়াছে। বৃদ্ধের কাছে বার্ধক্য নিশ্চয় ভাল নয়, কিন্তু তাহার সন্তানের কাছে সেইটাই সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষার জিনিষ—নানা কারণেই।....গিরিবালা অন্তরাল হইতে পিতাকে কখনও কখনও দেখেন—অল্প নত, দীর্ঘছন্দ সুগৌর দেহ, গায়ে সর্বদাই একটি রেশমের নামাবলী, মুখে গোলাপি রঙের আভা, তার চারিদিকে—সেই আভারই রশ্মিপুঞ্জের মতো শুভ্র কেশের রাশি। গিরিবালার মনটা কিসে যেন ভরিয়া ওঠে—মুনি-ঋষি তাহা হইলে এই না কি ?—এর চেয়ে আর বেশি কি হওয়া সম্ভবই বা ?

যাইবার সময় গিরিবালা বলিলেন—"বাবা, তুমি নিজের দিকে একটু চেয়ো, তোমার আর বয়েস নেই অমন করে ঘুরে বেড়াবার ; মস্তবড় দোষ দাঁড়িয়েছে তোমার...."

রসিকলাল হাসিয়া কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"তুই যে একেবারে উল্টো বললি মা, আমার আর বয়েসই নেই নিজের দিকে চাইবার ; যে-টুকু চাই সে-টুকু বরং মস্ত বড় দোষ···"

ম্লান হোক, তবু অশ্রুর মধ্যেই একটু হাসি সবার মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বারভাঙ্গার জীবন আবার শুরু হইল। কয়েকদিন একটু কষ্টই হইল,—ভাইয়েদের সংসারে স্বচ্ছলতার পরেই এখানকার অভাবটা যেন আরও স্পষ্ট। ঠিক এ-ভাবটা হয়তো রহিল না, তবু যাহা রহিল তাহাও যেন অসহনীয় হইয়া ওঠে। বর্ষার মেঘের মতোই এর যেন আর অন্ত নাই। যখন অভাব-দুঃখ, তখন মানুষ একটি একটি করিয়া দিন গুণিয়া সময়ের হিসাব করে—যেন ভারি গরুর গাড়ির চাকা, প্রত্যেক মাটির কণাটি মাড়াইয়া চলিতেছে,—এই একটি দিনের পর একটি দিন গাঁথিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। একঘেয়ে দুঃখের নয়, সুখও আসিয়াছে, তবে সে বিদ্যুদ্‌ঝলকের পর অন্ধকারের মতো দুঃখকেই আরও নিবিড় করিয়াছে। যেমন, শশাঙ্ক পাস দিল,—এক অদ্ভুত উল্লাস মনের। আর, একটা গর্ব

—ছেলে পাস দিল, মনের কেমন একটা আভিজাত্য আসিয়া গেছে, প্রতি দিনের ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগ মনটাকে যেন স্পর্শই করিতে পারিতেছে না। কেমন করিয়া, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই, তবে মনে হইতেছে—শশাঙ্ক পাস দিয়াছে, এবার তো এরা চলিল, যে-কটা দিন দিতে পারে কষ্ট দিয়া যাক্ না।

কি যেন একটা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। সে বারে ননী ঠাকুরঝির ভাই পাস দিল, পাড়াসুদ্ধ সকলকে লইয়া একটা প্রীতিভোজ দিলেন। ঐ রকম একটা কিছু করা যাইত!—অতটা না-ই হইল, ননী ঠাকুরঝির বাড়ি, ও-বাড়ি, রাস্তার ওধারে নূতন ভাড়াটিয়াদের বধূর সঙ্গে 'আতর' পাতাইয়াছেন—সেই 'আতর'-এর বাড়িটুকু, আর এদিক ওদিক ছুটকো দু'চার জন—কতই বা লাগিবে? আর লাগিলেও উচিত করা—এ দিনটি তো জীবনে রোজ আসে না।

চিন্তার মধ্যেই পাস-করা ছেলের মা, আর অভাবগ্রস্ত সংসারের গৃহিণী আলাদা হইয়া গেল। স্বামী বাহিরে গেছেন, আসিলেই বলিতে হইবে। না রাজি হইতেও পারেন এটুকু ভাবিতেও স্বামীর ওপর রাগ হইল—তাঁহার যেন হিসাবের বাড়াবাড়িটা একটু বেশি, অত করিলে চলে কখনও? না, এই রকম অবস্থাই থাকিবে চিরদিন? এই তো শশাঙ্ক পাস দিয়াছে।—আর তাহার দিকটাও দেখা চাই তো বাপ-মা হইয়া,—একটা সাধ-আহ্লাদ নাই তাহার?

কিছু চাই করা, নিজেকে বড় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে,—পাস-করা ছেলের মা।...

গিরিবালা বিকাশ দাদাকে একটা চিঠি লিখিলেন—বেশ বানাইয়া বানাইয়া অনেকখানি—তাঁহারই আশীর্বাদ—কত কষ্টে যে শুধু তাঁহাদেরই কথা সব মনে করিয়া শশাঙ্ককে মানুষ করিয়াছেন!—আজ মনে হইল সব সফল হইয়াছে—এবারও তাঁহার উপদেশ আর আশীর্বাদ নূতন করিয়া দরকার—একটা কথা জানেন বিকাশ দাদা?—শশাঙ্ক এই বংশের মধ্যে প্রথম ছেলে যে পাস দিল!...

মনের আবেগ অনেকটা কমিল, কিন্তু আশ মিটিতেছে না; বিশেষ করিয়া মনে জাঁকিয়া বসিয়াছে খাওয়ানোর কথাটা—কোন মতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। আজ যদি পাণ্ডুল থাকিত, শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতেন....

কেমন এক ধরণের অভিমান আর রাগ হইতেছে গিরিবালার; স্বামীকে

বলিলে তিনি শুনিবেন না, কোন মতেই শুনিবেন না—কেমন একটা হিসাব-হিসাব বাই দাঁড়াইয়া গেছে—সব সময় হিসাব লইয়া থাকিলে চলে ?....আর ধরিবেই যে লোকেরা, এড়ানো চলিবে ?

সংসারের দায়িত্বে আজ নিজেকে অনেকখানিই বড় বলিয়া মনে হইতেছে।....এর পর গিরিবালা এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন যাহা ইতিপূর্বে তিনি কখনও করেন নাই। খাটের গদির নিচে বিপিনবিহারীর নিজের ক্যাশবাক্সর চাবি থাকে ; বাক্সটিও খাটের সঙ্গে গাঁথা একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা। গিরিবালা উঠিয়া চাবিটা বাহির করিয়া খাটের বাক্সটা খুলিলেন। এমন কিছু লুকাচুরি ব্যাপার নয়,—স্বামীকে খাওয়ানর কথাটা বলিবেন, তাহার পর স্বামী সেই অর্থাভাবের কথাটা তুলিবেন, গিরিবালা বলিবেন —"এমনই কি অভাব ?—তোমার বাক্সে তো রয়েছে কিছু, আমি দেখলাম যে চুরি করে ;—এত টাকা, এত আনা, এত পাই ; ঠকিয়ে ভোলাবে সেই পাত্রী কি না আমি !—দেখেছি চুরি করে।"....চুরির কথায় একটা বোধ হয় হাসিও পড়িয়া যাইতে পারে।

খাটের বাক্সটা খুলিয়া ক্যাশবাক্সটা বাহির করিয়া চাবি লাগাইয়াছেন, বিপিনবিহারী আসিয়া প্রবেশ করিলেন, একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি করছ ?"

গিরিবালা একেবারে প্রস্তরমূর্তিবৎ নিশ্চল হইয়া গেলেন। হাতটা চাবিতে, দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর, তাহাতে কী যে লজ্জা, কী যে অপরাধের গ্লানি আসিয়া জড়ো হইয়াছে ! মুখে রা নাই, হালকা হাসির ভরসাতেই হাত দিয়াছিলেন এ-কাজে, কিন্তু মনে হইতেছে যেন এ-জন্মে আর এ-মুখে হাসি ফিরিয়া আসিবে না।

দৃশ্যটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, স্ত্রী ক্যাশবাক্স খুলিতেছেন, তাহাও তাঁহার অবর্তমানের সুযোগে,—বিপিনবিহারী একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন একটু, তাহার পর কতকটা রূঢ় ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"ও কি করছ ?"

সঙ্গে সঙ্গে হুঁস হইল প্রশ্নটার বিকৃত রূপে, কিন্তু সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, বলিলেন—"মনে ভাবো, টাকা আছে তবু সংসারের দুর্দশা দেখে বের করে দিচ্ছি না ? এই দেখো তাহলে...."

গিরিবালা বুক দিয়া বাক্সটা চাপিয়া ধরিলেন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন— "না, থাক্।"

বিপিনবিহারী একটা কঠিন শপথ দিয়া বসিলেন, গিরিবালাকে সরিয়া

দাঁড়াইতে হইল। ডালা খুলিয়া বিপিনবিহারী বলিলেন—"ঐ পড়ে আছে দেখো ; আজ মাসের কুল্যে আট তারিখ।"

গিরিবালা স্বামীর মুখ হইতে দৃষ্টিটা বাক্সর দিকে একটুও বাঁকাইলেন না, প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"আমি সে ভেবে খুলতে যাইনি।"

এ আসরে কি ভোজের কথা তোলা চলে? গিরিবালা আবার নিস্পন্দ নির্বাক্ হইয়া রহিলেন।

বিপিনবিহারী একটু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর—"নাও, বন্ধ করে দাও।" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এবার গিরিবালাই শপথ দিলেন—"আমার মাথা খাও, তুমিই বন্ধ করে দাও।"—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

তুহিনের মতন শীতল দারিদ্র্যের বাতাস, আনন্দের অঙ্কুরও সে পারে না সহ্য করিতে।....আর কেহই জানে না, স্বামীও আর কিছু বলিলেন না, তবু সমস্ত বাড়ির বাতাসটা যেন গ্লানিতে বিষাক্ত হইয়া রহিল। বিকাশ দাদাকে লেখা উচ্ছ্বাসময় চিঠিটা যেন অদৃশ্য কাহার বিদ্রূপের নিকট হইতেই লুকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া রাখিলেন, তাহার পর অন্ধকার একটু ঘন হইয়া আসিতে যেন একটা আশ্রয় পাইয়া নিজের ঘরের জানালাটির কাছে দাঁড়াইলেন। হু-হু করিয়া চোখে বন্যা নামিল—যত বার মোছেন, স্রোতের মুখ যেন আরও খুলিয়া যায়, অস্ফুট স্বরে কয়েক বারই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"কেন আসে এরা পেটে?—কিসের আশায় আসে?...."

বিপিনবিহারী এ-সময়টা বেড়াইতে যান। আজ মনটা বড়ই ভার হইয়া আছে, তিনিও আজ বাহির হন নাই। কি মনে করিয়া একবার ভিতরে আসিয়া দেখেন তাঁহার ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। তাহার পরই একটা টানা শব্দ কানে গেল—অনেকখানি কান্নার পর কে যেন ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন গিরিবালা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"কাঁদছিলে তুমি?"

গিরিবালা আর একটি কান্নার বেগকে মাঝপথে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিনবিহারী একটু অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কেন যে বাক্স খুলতে

যাচ্ছিলে তুমি বোধ হয় আমায় কখনও বলবে না, তবে আমি কতকটা আন্দাজ করেছি…”

বোধ হয় গিরিবালা বলিতে পারেন এই আশায় একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“আন্দাজটা আমার এই যে তুমি শশাঙ্কর পাসের জন্য কিছু মানৎ-টানৎ করেছিলে, দেখছিলে কিছু আছে কি না বাক্সয়—তাহলে চাইতে। আমার কি মনে হয় জান?—ভগবানের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা, যারা আমার মতন অবস্থায় তাদের মনে বড় একটা আশা সাঁদ করিয়ে দেওয়া,—দিয়ে দেখা সেটা ধরে রাখতে পারি কি না। বাবার আশীর্বাদের জোরে আমি কোন পরীক্ষাতেই এ-পর্যন্ত হারিনি, এতেও হারব না। শুধু তাই নয়, আমি আরও বড় দুঃখের মধ্যে এই পরীক্ষা দোব তুমি যদি না মুশড়ে পড়…”

গিরিবালা একটু থামিয়া বলিলেন—“মুশড়ে পড়তে হয় ওদের দেখেই, নিজের কথা কি ভাবি?”

উত্তরটা বিপিনবিহারীর কানে গেল না ঠিক মতো; বোধ হয় উত্তর কোন আশাও করেন নাই। স্ত্রীকে ভালো রকমেই চেনেন, জানেন তাঁহার অন্য রকম উত্তর নাই। আবেগের ঘোরে এক দিকে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন—“কি মানৎ করেছ জানি না, তবে আমি মানৎ মানে বুঝি তাঁর দেওয়া আশাকে পুষ্ট করা, জীবনে ফলিয়ে তোলা; তিনি যা দিয়েছেন সেইটেকে সার্থক করা,—এই তো তাঁর পূজো। তোমার মানৎ কি জানি না, তবে পাসের খবর পাওয়ার পর থেকে আমি তো সবই মানৎ করে বসেছি।”

গিরিবালা বিস্মিত কৌতুহলে মুখ ফিরাইয়া চাহিতে বলিলেন—“পাণ্ডুলের ক্ষেতটুকু তো আছে—মোটা ভাতটা জুটে যাচ্ছে—”

গিরিবালা কতকটা ভীত দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করিলেন—“বেচে দেবে?”

বিপিনবিহারী একটু হাসিয়া বলিলেন—“এই তো শুনেই মুশড়ে গেলে তুমি, যা ভয় করছিলাম।”

গিরিবালা তখনকার উত্তরটাই আবার হাজির করিলেন, বলিলেন—“নিজের জন্যেই কি বলছি? এক মুঠো ভাতের সংস্থানও গেলে ওরা যাবে কোথায়?”

“ঠিক এই কথাটির উত্তর আপাততঃ আমার কাছে নেই। সব কিছু না পারি, অনেক কিছুই তো ভগবানের উপর ছাড়তে হয়?—এটুকুও তাঁর হাতেই রইল। নিজের জন্যে তুমি মুশড়ে পড়বে একথা বলছি না, গা হাত খালি হয়ে এসেছে কি করে তার ইতিহাস তো জানি। তবে ওদের মুখ চেয়েই ওদের কষ্টের কথা ভুলতে হবে—বাপ-মায়ের পক্ষে সেইটেই তো বেশি শক্ত।”

গিরিবালা যেন স্বামীর কথাগুলা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না, আগেকার মতো ব্যাকুল কণ্ঠেই বলিলেন—"কিন্তু যদি দু'বেলার ভাতের ব্যবস্থাটুকুও নষ্ট হয়! সাধ-আহ্লাদ তো জীবনে নেই-ই কিছু।"

বিপিনবিহারী একটু যেন নিরাশ হইলেন। তঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যে-স্তরের তাহার তুলনায় এ যেন অনেক নিচু স্তরের মনোভাব। তাঁহার বরাবর একটা বিশ্বাস ছিল—অনেকবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন—যে, স্ত্রীর মনের খুব একটা প্রসার আছে, তিনি যত উঁচু কথাই ভাবুন, বরাবরই এই মনের সাহচর্য পাইবেন। আজ এই প্রথম নিরাশ হইলেন—হইলেনও যখন সব চেয়ে বেশি দরকার সে-সাহচর্যের; বলিলেন—"দেখো ভেবে, আজই যে করছি বিক্রি এমন নয়।"

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

নিস্তারিণী দেবী বাড়িতে ছিলেন না, ননীবালাদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলেন; গিরিবালা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানালার ধারটিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি চলচ্চিত্রের মতো সমস্ত দিকের ঘটনাগুলি চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেল।...সকাল বেলা শশাঙ্ক পাসের খবর দিল—মুখে কী দীপ্ত শ্রী! কখনও দেখেন নাই অমন। সমস্ত বাড়িতে যেন আলো ছড়াইয়া পড়িল—সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণেরই আলো....খোকাকে খাওয়াইতেছিলেন শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিল।...."আমার এঁটো হাত, দাঁড়া।"...."হ্যাঁ, মার আবার এঁটো হাত।.... ঠাকুরমা কোথায়?"....পূজোর ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হরেন, পূর্ণেন্দুও আসিয়া একটা আনন্দের তরঙ্গ তুলিল।....স্বামীর আনন্দটা চাপা—চিরকালই ঐ রকম—শুধু মুখটা রাঙা হইয়া ওঠে—আজ যেন আরও অদ্ভুত ভাবে রাঙা। গিরিবালাই খবর দিলেন—"শুনেছ?—শশাঙ্ক পাস করেছে।" অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোমার সন্দেহ ছিল বলে মনে হচ্ছে।"....গিরিবালা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সন্দেহ না থাকলেও শুনে খুশী হতে নেই?....তোমার যেন সব বাহাদুরি!"

এই রকম ভাবেই গেছে ওদিকটা—হালকা ভাবে অনেক জল্পনা-কল্পনাও। তাহার পর সেই চিত্রেরই সন্ধ্যায় এই রূপ! শুধু অভাবের ছায়াতেই সব বর্ণ বিকৃত। আবার এই অভাবকেই স্বামী বাড়াইয়া তুলিতে চান! কেন—এ কী সর্বনাশা জিদ? ধরো, চাল সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া সময়ে ভাত হয় নাই,

টিফিনের সময় আসিয়া ছেলেরা খাইতে বসিল ; চার জনেই বা উহাদের মধ্যে কেহ এক জন বলিল—"আজ বেশি ক্ষিদে মা, দেরিতে খেতে বসেছি...."

—শ্বশুর যেমন একদিন তাঁহার মা, অর্থাৎ গিরিবালার দিদিশাশুড়িকে বলিয়াছিলেন—"আর দুটি ভাত আছে মা ?—আজ ক্ষিদেটা বেশি পেয়েছে ".... দিদিশাশুড়ির মুখের সেই নিদারুণ লজ্জা কত বৎসরের পথ বাহিয়া আসিয়া আজ গিরিবালার মনটাকেও আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এইখানেই গিরিবালার চিন্তার মোড় ফিরিল,—দারিদ্রের মধ্যে সেই প্রসন্ন লক্ষ্মীরূপ। সন্তানদের খাওয়াইয়া যেদিন কিছু থাকিত না, পানে মুখটি রাঙা করিয়া প্রতিবেশিনীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শ্বশুর গল্প প্রসঙ্গে বলিতেন—"মা ছিলেন পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে আমুদে ; লক্ষ্মী যদি দরিদ্র হতেন তো যেমন হোতেন আর কি..."

একটা অদ্ভুত ধরণের শক্তি আসে গিরিবালার মনে ; মনে হয়, স্বামী তো ভুল বলেন নাই ; এই বংশের এই তো শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—ছেলে বড় হইবে, বিদ্যায়, চরিত্রে, তার জন্য মাকে খালি পেটে, মুখে শুধু পানের প্রবঞ্চনা সাজাইয়া হাসিমুখে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে। গিরিবালা অবশ্য স্বামীকে নিজের কষ্টের কথা বলেন নাই, তবে দিদিশাশুড়ির এ-রূপের কথাও তাঁহার মনে পড়ে নাই তখন। এখন পরম আশীর্বাদের মতো এই স্মৃতিই যেন তাঁহাকে নূতন ব্রতের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিল।

ছেলেদের কষ্টের কথা।—সেখানেও দিদিশাশুড়ির স্মৃতি আজ নূতন আলোকে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেখা দিল। দিনের পর দিন তিনি দু'টি পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া গেছেন,—যাহা কল্পনা করিতেও গিরিবালার বুক কাঁপিয়া ওঠে ; কেন ? না, একদিন তাহারা মানুষ হইবে। বিপিনবিহারী তো মিথ্যা বলেন নাই,—মায়ের পক্ষে এই তো সব চেয়ে কঠিন ব্রত। ওদের মুখ চাহিয়াই ওদের কথা ভুলিতে হইবে, আবছা আবছা মনে পড়ে বিকাশ দাদার কাছে শোনা কত মায়ের কাহিনী। ভাবিতে ভাবিতেই গিরিবালার মনে একটা শক্তি আসিল—মায়ের এ সখের ব্রত নয়,—এ অনিবার্য, ছেলের কল্যাণের জন্যই একে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। মায়ের এই অদৃষ্টলিপি !

সেদিন আর কিছু বলিলেন না। ভালো করিয়া ভাবিবার জন্য সেই রাত্রি আর পরের সমস্ত দিনটা লইলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত গিরিবালা মনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এমন সময় তিনি নিজেই একটু হন্তদন্ত

হইয়া প্রবেশ করিলেন, বাড়ির অপর দিকটায় একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া একটু চাপা গলায়ই প্রশ্ন করিলেন—"তোমার ননী ঠাকুরঝি এসেছে?"

"না তো।"

"আসবে,—এক্ষুনি বা একটু পরে। এই টাকা ক'টা রাখো।"

পনেরটি টাকা। অতিশয় বিমূঢ় ভাবে হাতে লইয়া গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কি হবে? এলো কোথা থেকে?"

বিপিনবিহারী একটু ত্বরিত ভাবেই বলিলেন—ননীবালা শশাঙ্কর পাসের জন্যে মিষ্টি খেতে চাইলে এই থেকে কিছু আনিয়া দিও। বাকি টাকাটা থাক হাতে, আরও যদি কেউ চায়। তা ভিন্ন তোমার মানৎ...."

গিরিবালা শুধু প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ?"

"বিকেলে ওদের বাড়ি গেছলাম, ওর দাদার কাছে। দোরের আড়াল থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—শশাঙ্কর পাসের মিষ্টি চাই। শশাঙ্ককে ভালবেসে যে ছোট বোনের মতন আমার কাছে এ আবদারটা করলে, তার মুখ রাখতেই হবে, তাই ...."

গিরিবালার হঠাৎ স্বামীর অনামিকায় দৃষ্টি পড়িল, শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"তোমার আংটি?"

বাহিরে নহরের পুলের ওদিকে কণ্ঠ শোনা গেল—"আমরা সবাই এলাম গো পাস-করা ছেলের মা!"

বিপিনবিহারী অন্য দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"শশাঙ্ক হীরের আংটি গড়িয়ে দেবে।"

৯

সুখের দিনে গিরিবালা এইসব দুঃখের ব্যাপারগুলা একটি প্রীতিমণ্ডিত কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখিতেন, ছেলেদের কাছে গল্প করিতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। বলিতেন—"ঐ যে ঠিক করলাম অভাবে কষ্টে তোদের মুখ চুণ হলেও মনকে কড়া করে রাখব, তার পর আমার যেন একটা বাই দাঁড়িয়ে গেল কেবলই লক্ষ্য করা তোদের মুখ চুণ হোল কি না। তোরা টের পেতিস না, তবে আমি কেবলই আড়-চোখে তোদের মুখের পানে চাইতাম। শুধু কি তাই? এমন রোগ দাঁড়াল যে বারান্দায় তোদের খেতে দিয়ে, আমি রান্নাঘরের দরজার জোড়ের কাছে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম তোদের

মুখের ভাব কিছু বদলাল কি না। শেষ পর্যন্ত এমন হোল, মনমরা হোতে না দেখে,—তোদের ফুর্তি, তোদের মুখের হাসি দেখেই আমার মুখ যেন শুকিয়ে যেত লাগল; ভাবি, নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে কষ্ট হচ্ছে বলে এরা ওপরে ওপরে মুখটা হাসি-হাসি করে রাখে। সে আরও জ্বালা, মন কড়া করব কি সর্বদাই প্রাণটা যেন আইঢাই করতে থাকে। শেষে হরেনকে ডেকে একদিন চুপি চুপি বললাম—'হ্যাঁ রে হরু, একটা কথা জিগ্যেস করব, লুকুবি নি?' "

'না।'

'গা ছুঁয়ে আছিস।'

'বলছি তো লুকুব না।'

'হ্যাঁ রে, সত্যি বলবি, শশাঙ্ক কলেজে পড়ছে, তোদের বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

গিরিবালা জোরে হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"ভেতরে ভেতরে ভয়ে সন্দেহে মনটা এমন হয়ে রয়েছে যে কি করে সে গুছিয়ে বলব সে হুঁসও নেই। হরু ঠিক ধরেছে, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে—'বা রে কথা তোমার!—দাদা কলেজে পড়ছে তাই কষ্ট হবে আমার!—শত্রু না কি?"

এ আবার উল্টে উৎপত্তি? বললাম—'সে কষ্ট নয় রে, খাওয়া-পরার কষ্ট,—শশাঙ্ককে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হচ্ছে তো?'

ও তো আরও এ-সব ব্যাপার গ্রাহ্য করত না কথাগুলোও একটু কাঠখোট্টা গোছের ছিল, আর তেমনি ছিল চঞ্চল,—'বা রে, বন্ধ করে দিলে তার কষ্ট হবে না?—কি রকম একচোকো তুমি মা?'—বলে খেলতে না কোথায় যাচ্ছিল, হন হন করে বেরিয়ে গেল।

গিরিবালা আবার হাসিতে থাকেন—"মুখ চুণ না দেখতে পেয়ে সন্দেহের ওপর সে যে কী সব দিনই কেটেছিল! অমন বিপরীত কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি, উঃ!"

এ সব স্মৃতির কথা। সুখ উদার, তাই সুখের দিনে অতীতের দুঃখের ছবি প্রসন্ন অনুকম্পার দৃষ্টিতে যায় দেখা, কিন্তু সত্যই দুঃখ যখন ছিল, সেটা নিদারুণ হইয়াই ছিল।

অন্ধকারটা চারি দিক্ দিয়াই যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। অদৃষ্টের পরিহাস

যে এই অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিবার জন্যই গোড়ার কয়েকটা দিন হঠাৎ আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—শশাঙ্ক পাস করিল, ক্ষেত বিক্রয় করিয়া হাতে একটা মোটা টাকা আসিল। হাতে টাকা থাকিলে যা হয়,—হাজার টানিয়া খরচ করিলেও খানিকটা স্বচ্ছলতা আসিয়া যায়ই সংসারে, একটু শ্রী ফিরিল; তাহার পর আরও একটু শুভ যোগাযোগ হইল, একটি বাঙালী ভদ্রলোক কয়লার ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার পরামর্শে এবং আনুকূল্যে বিপিনবিহারী টাকাটা ফেলিয়া না রাখিয়া একটা মোটা অংশ কয়লার কারবারে খাটাইলেন। বেশ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইল; অনেক বছর পরে একটা উপার্জনের পথ আবিষ্কার হওয়ায় গৃহস্থালীর মধ্যে একটি সাহসের হাওয়া বহিল, স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল, স্বামী-স্ত্রীর অনেক দিনের ছোট-খাট সাধ-আহ্লাদও মিটাইয়া লইলেন দুই জনে—ছেলেদের কিছু পোষাকী জামা-কাপড়, দু'-একখানা আসবাব—সহরে এ-বাড়িতে সে-বাড়িতে দেখিয়া সাধ যায় মনে; আর দু'-এক মাস দেখিয়া গিরিবালার একখানা নূতন গহনার কল্পনাও উঠিল স্বামীর মনে, স্ত্রীকে বলিলেনও।

নিস্তারিণী দেবীকেও বলিলেন—'এবার শীতটা পড়লে তুমি কাছে-পিঠে দু'-একটা তীর্থ সেরে এসো না মা, ক্রমেই অথর্ব হয়ে পড়ছ তো? চণ্ডীকে লিখব পাসের জন্যে, শুধু এদিক্‌কার খরচটুকু তো?"

আরও আলো আনিল নিতান্ত দৈবাধীনই একটি ব্যাপার। এই সময় শশাঙ্করা সাতটি ভাই। পুত্রবান দম্পতির কন্যা-মুখ দর্শনের একটি নিবিড় আকুতি থাকে, ভগবান সেটিও পূর্ণ করিলেন। এর সঙ্গে নিশ্চয় সমৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, তবু কেমন মনে হইল—এ একটা শুভ লক্ষণ—সব চেয়ে বড় শুভ লক্ষণ; বিধাতা নিশ্চয় মুখ তুলিলেন। দুঃখের দিনে কেবলই লক্ষণ মিলাইয়া আশায় আশায় থাকা একটা অভ্যাস হইয়া পড়ে যে।

বিধাতা দয়াবান কি নির্দয়—এ-প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই, তবে একটা কথা ঠিক, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী; সুখকে ফোটান্ দুঃখের পাশে রাখিয়া, যখন দুঃখকেই নিবিড় করা হয় প্রয়োজন, তাহার আগে দেন সুখের একটি উজ্জ্বল রেখা টানিয়া।

শীতের ক'টা মাস এই করিয়া কাটিল।

তাহার পর আশা যখন চরমের পাশে ঠেলিয়া উঠিতেছে, হঠাৎ সব ওলট-পালট হইয়া গেল। শীতের শেষে দেখা দিল প্লেগ। দু'-এক বৎসর হইতে এই সময়টা হইতেছে একটু আধটু—দূরে দূরে, যে দিক্‌টা বেশি ঘিঞ্জি। কিছু ইঁদুর পড়ে, লোকও মরে দু'-এক জন, তাহার পর আবার তাতটা পড়িতেই

ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এবারে যেন একেবারে একটা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল। রোগটার চিকিৎসা নাই, যদি বাঁচিতে চাও তো বাড়ি ছাড়িয়া পালাও। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুতে গৃহ-ত্যাগে সমস্ত সহরটা খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল।

এদিকে করাল হইলেও অসুখটার ধর্মজ্ঞান আছে,—পূরাপূরি আসিয়া পড়িবার আগে একটা নোটিস্ দেয়, ঘরে ইঁদুর মরে—স্ফীত, গায়ের রোঁয়াগুলা খাড়া হইয়া গেছে—দেখিলেই বোঝা যায় এ মৃত্যু দূতের বিশিষ্টতা আছে।

শীতের শেষে আসে, একটু গরম পড়িলেই চলিয়া যায়। এবার কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা দিল।

শীত গেল, ক্রমে পশ্চিমা হাওয়াটা অল্পে অল্পে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কষ্টকর, কিন্তু নীরোগ, সবাই আশা লইয়া এরই দিকে থাকে চাহিয়া। বসন্তে যে সব কণ্ঠ থাকে আতঙ্কে রুদ্ধ, 'চৈতী'র সুরে পায় মুক্তি, মানুষ আবার নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে জীবনের পানে চায়। এবার কিন্তু গরম যতই বাড়িতে লাগিল, রোগ যেন ততই হিংস্র মূর্তিতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মনে হইল যেন মরণের দূত তাহার প্রবল শত্রুটাকে বশে আনিয়া তাহারই স্কন্ধে চড়িয়া বিজয়ের দুর্বার অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধূলায় আকাশ আরক্তিম হইয়া ওঠে, দিগন্ত যায় ডুবিয়া, সহরের জনহীন পথে ছোটে চৈতালী ঘূর্ণির স্তম্ভ—সেই সঙ্গে এ-পথ ও-পথ দিয়া কচিৎ শ্মশানযাত্রীর দল—স্তব্ধ, নিরুপায়, শঙ্কিত।... এর পরে কার পালা কে জানে?....হঠাৎ বাজারের দিকে কোথায় হাহাকার উঠিল—যেন মনে হয় এই আর্ত কণ্ঠস্বরই পশ্চিমা হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া কোন অদৃশ্য দানবের অট্টহাস হইয়া উঠিয়াছে....

কী অসহায় অবস্থা! একটি অহির শোকেই অতো, আর এ যে সব হারাইতে বসা! ছেলেরা কেহ পড়ে, কেহ ঘুমায়, কেহ খেলা করে, মুখ দেখিলে মনে হয়, তাঁহারই উপরে সব দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সবাই নিশ্চিন্ত আছে। সবার উপর চক্ষু বুলাইয়া গিরিবালা জানালার কাছে গিয়া রুদ্র মধ্যাহ্নের দিকে চাহিয়া থাকেন—কি হবে?—কি হবে?—কাকে বলি?—এ নতুন রোগের কে দেবতা তুমি, চিনি না ঃ যেই হও, রক্ষে করো—ওরা কিছু জানে না— সব অপরাধ আমার···

বুক আই-ঢাই করে, শাশুড়ির কাছে যান, কোলে একটি পা তুলিয়া লন, হাত বুলান, প্রশ্ন করেন—"মা ঘুমুলে?"

"কি বৌমা?"

"কি হবে মা?"

শাশুড়ি ভালো ভাবেই জাগিয়া ওঠেন।

"ছিঃ, অত ব্যাকুল হলে চলে মা ? ভগবান রয়েছেন।"

—কোথায় তিনি ? গিরিবালা যেন আরও দেখিতে পান না তাঁহাকে আজকাল। আগে অন্ততঃ পূজার সময়টা একটু আনন্দ থাকিত, এক একবার মনে হইত অন্তরে যেন ক্ষণিক বিকাশে কাহাকে পাওয়া গেল। আজকাল সব অবস্থায়, সব সময় একটি মাত্র চেতনা—ভয়। সব যেন অন্ধকার করিয়া রাখে।

যেন ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিবার চেষ্টা করেন—"হ্যাঁ, তিনিই তো ভরসা গরীবদের।"

তাহার পর আবার সেই ভয়।—

"আজ মা এই একটু জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—তুমি বারণ করেছ, আর দাঁড়াই-ই না—তা ঐটুকুর মধ্যে চার-চারটেকে নিয়ে গেল, আমার তো..."

শাশুড়ি একটু ধমকের সুরে বলেন—"আবার তুমি দাঁড়িয়েছিলে—বৌমা ? না বাছা....এবার শুনলে আমি সত্যিই রাগ করব বাপু! কি করবে—হাত-পা আছড়ে কোন ফল আছে ? শুধু মা-শেতলাকে ডাকো...."

শাশুড়ি এক সময় আবার তন্দ্রালস হইয়া পড়েন, হয়তো কোথাও একটা অটল বিশ্বাস আছে, না হয় বার্ধক্যের শিথিলতায় ভয়-উৎকণ্ঠার বেগটাও আসিয়াছে কমিয়া।...গিরিবালা আস্তে আস্তে পা নামাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসেন। বিপিনবিহারী নিদ্রা হইতে জাগিয়া নিজের বিছানাতেই শুইয়া আছেন, হাতে একটা হিসাবের খাতা। গিরিবালা প্রয়োজন না থাকিলেও আনলা হইতে একটা কাপড় লইয়া ভালো করিয়া কোঁচাইতে লাগিলেন। স্বামীর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই যেন নিজের মনে বলিলেন—"ক'দিন যে আর চলবে এ রকম করে।"

এমন অর্ধোচ্চারণে বলিলেন, বিপিনবিহারীকে প্রশ্ন করিতেই হইল—"আমায় কিছু বললে ?"

"না তোমায় নয়...বলছিলাম, আর কত দিন ভয়ে-ভয়ে এ-রকম ভাবে থাকতে হবে ? ঘরে গরম, খেয়ে-দেয়ে জানালার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, ওর মধ্যেই চার-চারটে ..."

"এ দিকটা ভালো আছে।"

"যখন তুললেই কথাটা বাপু, ভালো থাকতে থাকতেই সরে যাওয়া ঠিক ;

না, তুমি করো একটা ব্যবস্থা ; এ যেন সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা—কখন্ কি হয়, কখন্ কি হয়...”

বিপিনবিহারী হিসাবের খাতাটা রাখিয়া দিলেন। একটু রুষ্ট ভাবেই বলিলেন—“একটু ভগবানের ওপর না ছেড়ে দিলে চলে? কত বারই তো তোমায় বুঝিয়ে বলেছি—এখন বাড়ি ছেড়ে গেলে সব তছ-নছ হয়ে যাবে। প্রথমত খড়ের ঘর করতে এক-কাঁড়ি খরচ—কোথা থেকে আসবে? খড় একেবারে অগ্নিমূল্য—তা ভিন্ন জায়গার ভাড়া আছে। এর ওপর আলাদা করে নতুন সংসার পাতবার খরচ আছে। সব চেয়ে বড় বিপদ—নতুন কাজটার যে একটু পোড়াপত্তন হচ্ছে, যার ওপর ভবিষ্যৎ, সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, সমস্ত টাকা যাবে ডুবে। আর এ অবস্থায় এ সম্বলটুকু গেলে কী যে হবে বোধ হয় বুঝতেই পাচ্ছ—শশাঙ্কটা পড়ছে, শৈলেনও আসছে বছর স্কুল ছেড়ে বেরুবে —ক্ষেত নেই আর যে...পড়ানো দূরের কথা, অন্ন জোটানোই ভার হবে—তার জন্যেই বোধ হয় বাড়িটির ওপর হাত পড়বে।....ভেবে বলো....”

হাতে গড়গড়ার নল ছিল, কয়েক বার টান দিয়া অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠেই বলিলেন—“তা বলে বলছি না ছেলেদের প্রাণের কাছে এ-সব কিছু....। ভগবানের একটু দয়া আছে বৈ কি, অস্বীকার করলে পাপের ভাগী হতে হবে। প্রথমত দেখো, এমন একটি জায়গা পেয়েছি যা সহরের মধ্যে হয়েও সহরের বাইরে। অনেকখানিই নিশ্চিন্দি আছি তো? ক’বছর থেকে ব্যারামটা হচ্ছে, একটা ইঁদুর পর্যন্ত পড়েনি বাড়িতে - দয়া আছে বলেই তো তাঁর?....রোগটার সব খারাপ, শুধু এইটুকু ভালো, বাড়ি খারাপ হলে আগে ইঁদুর মরবেই....”

বাহিরে ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—“চিট্‌ঠি হায়।”

শৈলেন একটা খাম আনিয়া বিপিনবিহারীর হাতে দিল। বিপিনবিহারী এইটারই প্রত্যাশায় ছিলেন, ব্যগ্র হস্তে ছিঁড়িয়া একটি হলদে কাগজ বাহির করিলেন, মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বলিলেন—“দু’গাড়ি কয়লার” রেলওয়ে চালানিটাও এসে গেল। কত বড় একটা সুবিধে—প্রায় সমস্ত ব্যবসাদারই সহর ছেড়ে পালিয়েছে ; এ সময় যদি শুধু ভয়ে বাড়ি ছেড়ে....”

শশাঙ্ক, শৈলেন ভিতরের এ-প্রান্তটায় পড়িতেছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে জড়াজড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই কয়েক পা আসিতেই কি রকম হইয়া গেছে, মুখ

শুক্‌ন, ভয়ে চোখ দুইটা ঠেলিয়া আসিয়াছে, জড়াজড়ি করিয়া বলিল—ইঁদুর!! —ঠাকুরমার ঘরের সামনে! শীগ্‌গির এসে!...'

দুই জনে তাড়াতাড়ি গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন; তাড়াতাড়ি কিন্তু সমস্ত শরীর যেন ঝিম-ঝিম করিতেছে। বিপিনবিহারী ভীতি-কর্কশ স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"মা, খাট থেকে নেমো না, ইঁদুর পড়েছে! খবরদার নেমো না!"

অতি সামান্যই একটা ইঁদুর, নিতান্তই ঘরোয়া, কিন্তু কী বিকৃত দৃশ্য! ফুলিয়া প্রায় দেড়া হইয়া গেছে, রোঁয়াগুলা সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। একটা বৃত্ত লইয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে—নীরব যন্ত্রণা—সামনে স্পষ্ট দেখা যায় মৃত্যুর আবর্ত।....একটা নৌকা যেন নিতান্ত অসহায় ভাবেই দয়ের কেন্দ্রের চারি দিকে পাক দিতেছে—ডুবিবেই, কোন উপায় নাই।....ক্রমে বৃত্তটা আরও ছোট হইয়া আসিল—আরও ছোট, গতিও মন্থর হইয়া আসিল ইঁদুরটার, তাহার পর কয়েকটা দ্রুত আক্ষেপের পরই সব শেষ।

প্লেগের ধর্মজ্ঞান আছে, গৃহস্থকে নোটিস দিল!

১০

আরও দুইটা বৎসর কাটিল। "এই ভাবে" বলা ভুল হইবে, কেন না অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই যে প্লেগের ছত্রভঙ্গ—তাহার পর কারবারটা যে কোথা দিয়ে কি হইল যেন হিসাবই পাওয়া গেল না। ঠিক যাহা ভয় করিয়াছিলেন বিপিনবিহারী।....দুঃখের দিনে শুভ লক্ষণগুলো ফলে না, ভয় কিন্তু ফলে অক্ষরে অক্ষরে।....সামলাইতে সামলাইতেও প্রায় বারো আনা গেল ডুবিয়া। বাকী যে চার আনা তাহারই উপর রহিল সব—সংসারের ষোল আনা,—শশাঙ্কর কলেজের খরচ, সংসার, শৈলেনদের স্কুলের খরচ।

অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিবার জন্যই বিধাতা আর একটি আলোর রেখা দিলেন টানিয়া। পরবৎসর শৈলেনও পাস করিয়া স্কুল ছাড়িল।

আবার আশা জাগে, উদ্যম জাগে। বিপিনবিহারী শৈলেনকে পড়ানোর প্রস্তাব তোলেন, গিরিবালা সাহসে বুক বাঁধেন, নূতন করিয়া দিদিশাশুড়িকে স্মরণ করেন, আশীর্বাদ চান।

শশাঙ্ক যে সাধ বাড়াইতেছে। এবার সামনের যা জীবন তা তো ওদের

লইয়াই ক্রমে আরও বেশি করিয়া। বাপ-মা সন্তানদের আনে জগতে, তাহার পর ওদের মধ্যেই যায় মিলাইয়া, ওদের মধ্যে দিয়া এক নূতন জগতকে দেখে।···· শশাঙ্ক যখন ছুটি-ছাটাতে আসে, একটি নূতন জগতকে সঙ্গে করিয়া আনে। কলেজের গল্প—কত জায়গায় কত রকম ছেলে—প্রফেসারদের গল্প—কাহার কি রকম অভ্যাস, কি মুদ্রাদোষ সেটুকু পর্যন্ত—রাজধানী সহর, সেখানে কত কী যে হয়····

শশাঙ্ককে দেখিতেও হইয়াছে আরও সুন্দর। নূতন বয়স, তাহার উপর পড়িয়াছে বড় সহরের চাকচিক্য। মনে হয় এই যে একটা বৃহত্তর পরিমণ্ডল, শশাঙ্ক যেন চারিদিক দিয়াই তাহার উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। গৌরবে মন পূর্ণ হইয়া ওঠে গিরিবালার, এক একবার একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি আসে ;—শশাঙ্ক গল্প করিতেছে—কখনও হাসিতে কখনও বা আবেগে মুখটা রাঙা হইয়া উঠিতেছে—গিরিবালার কাছে সবই মুছিয়া যায়, মনে হয় যেন নিজেই সন্তানে রূপান্তরিত হইয়া গেছি, নূতন জগতে নিয়াছি জন্ম। এত অদ্ভুত আর মিষ্ট যে বেশিক্ষণ থাকিতেই পারে না অনুভূতিটা।—যখন ও আর সামনে থাকে না, মনের অলি-গলিতে সেটাকে খুঁজিয়া ফেরেন গিরিবালা—কি যেন চমৎকার একটা পেয়েছিলাম—জিনিষটা কি? কোথায় গেল?—আর মনে আসছে না কেন? আরও একটা নূতন জগৎ আনিবে শশাঙ্ক, জীবনের পূর্ণতার একটা নূতন দিক, তাহারও সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন পথ,—সন্তানকে অতিক্রম করিয়াও তাহার দূরত্ব যায় দেখা।—বধূ, পৌত্র, পৌত্রী—নিজের জীবনটাই যেন কতদূর প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে—কত যুগ পর্যন্ত যেন নিজের বুকেই স্পন্দন শোনা যায়····

না, শৈলেনও যাক কলেজে। এই রকম সোনা হইয়া ফিরুক। আর দুই তিনটা বৎসর চোখ-কান বুঝিয়া চালান, তাহার পরই শশাঙ্ক কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইবে।····দিদিশাশুড়ির ঠোঁটের তাম্বুল-রেখা অক্ষয়, অপরাজেয় হইয়া থাক। গিরিবালাও পারিবেন সহিতে।

আশ্বিন মাস, পূজার ছুটিতে দুই ভাই দুই দিক হইতে আসিল।

শৈলেনের মনে পড়ে দিনটি। দুপুরের গাড়িতে আসিল। সর্বকনিষ্ঠ ভাই 'খোকার' জন্ম হইয়াছে। মা তাহাকে পাশে একটি পিঁড়িতে শোওয়াইয়া উঠানে একটি মলিন মাদুরে পা ছড়াইয়া রোদ পোহাইতেছেন। পরিধানের বস্ত্রখানি

পরিষ্কার কিন্তু কয়েক জায়গায় ছিন্ন। শৈলেন প্রবেশ করিতে বলিলেন—
"শৈলেন এলি ?—আয়।"

বেশ মনে পড়ে ছবিটি। মাকে এ-মূর্তিতে অনেক বারই দেখিয়াছে। কিন্তু সেদিনকার ছবিটি যেন মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া গেছে। পায়ের গোছের কাছে কাপড়ে একটি গ্রন্থি ছিল, সেটুকু পর্যন্ত আছে মনে। আসল কথা ছেলেবেলায় সেই সাঁতরায় বছর দুয়েকের পরে এই ছিল মা হইতে শৈলেনের প্রথম বিচ্ছেদ, মনটা ব্যাকুল হইয়া ছিলই, তাহার উপর যখন তাঁকে দেখিল তখন একেবারে পূর্ণ মাতৃত্বের মূর্তিতেই দেখিল। কী যে অপূর্ব লাগিয়াছিল, এখন ভাবিয়া কূল পায় না শৈলেন! মা শীর্ণ হইয়া গেছেন, ক্লান্ত, মলিন; এদিকে ছিন্নবাস, দীন শয্যা—যেন চারি দিক্ দিয়াই নিঃস্ব; অথচ যাহার জন্য নিঃস্ব সে ঐ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় পাশে সুপ্তিমগ্ন!···কিন্তু এই সমস্ত নিঃস্বতার মধ্যেও কত বিরাট। মাতৃ-মূর্তির অনেকই তো ছবি দেখিল শৈলেন, মনে হয় শিল্পী মাকে আধ্যাত্মিক স্তর পর্যন্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু এ ছবি কোথায়?—এই সর্বংসহা, সর্বরিক্তা মানবী মায়ের?

শৈলেন প্রণাম করিবার জন্য নত হইতেই ব্যস্ত ভাবে পা দুইটি একটু টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমায় ছুঁসনি, আমি এখনও শুদ্ধ হইনি, দেখছিস কাপড়-বিছানার অবস্থা!...."

শৈলেন পায়ের ধুলা লইয়া হাসিয়া বলিল—"বাড়ি ঢুকলাম, প্রণাম করবার জন্যে আমি এখন শুদ্ধ মা কোথায় খুঁজে বেড়াই?"

এ চিত্রটি এখানেই শেষ হইল।

কয়েক দিন পর শশাঙ্ক আসিল। এবার তাহার পরীক্ষা; সমস্ত ছুটিটা আর এখানে ছিল না, মাত্র শেষের কয়টা দিন কাটাইবে। মা তখনও ঘরে ওঠেন নাই। প্রণাম লইতে ঐ আপত্তিই করিলেন।

মায়ের আপত্তিতে সেও হাসিয়া পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া বলিল—"বেশ তো, এই আমি শুদ্ধ হলাম, আমায় ছুঁয়ে তুমিও হয়ে গেছ শুদ্ধ।" নিস্তারিণী দেবী কাছেই ছিলেন, শশাঙ্ক আগেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে।

গিরিবালা তাঁহাকে সাক্ষী মানিলেন—"শুনলে কথা মা?—ঘর-দোর সব ছোঁবে তো?"

নিস্তারিণী দেবী অল্প হাসিয়া বলিলেন—"কথাটা মোটেই মিথ্যে বলেনি, মা-ধনই তো?—তার চেয়ে আর শুদ্ধ কে আছে জগতে? তবে চিরকাল লোকে একটা মেনে আসছে—একটু না হয় মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে নিক্।"

শশাঙ্ক অতিমাত্র ভয়ের অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল—"সে কি—মার পায়ের ধুলো আছে যে মাথায় !"

দুই মানেই হয় কথাটার, তাহার বলিবার ঢঙে সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যে বড় হয় তাহাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়াই পাঠান ভগবান। এর পর হইতেই কিন্তু শশাঙ্কর হাসি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। মুখটি সর্বদাই একটু বিমর্ষ। হাসিতে গল্পে যোগ দেয়, কিন্তু যেন ওই ভাবটাকে ঢাকিবার জন্যই। ঠাকুরমা, বাবা, মা,—তিন জনেই কারণটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাই আবার প্রশ্ন করিলেন—"পরীক্ষার ভাবনা ?"

শশাঙ্ক বলিল—"হ্যাঁ।"

উঁহারা জবাবদিহিটা মানিয়া লইলেন। বলিলেন—"তাই এত মন-মরা হয়ে থাকতে হবে ? এখনও তো ঢের দেরি।"

একদিন শৈলেনকে একান্তে ডাকিয়া শশাঙ্ক বলিল—"মার শরীরটা দেখছিস এবার ?"

যাহার মন ভাবের দিক্‌টায় আবদ্ধ থাকে, সে বাস্তবকে ঠিক মতো দেখিতে পায় না। দাদার কথাতেই যেন শৈলেনের চৈতন্য হইল, বলিল—"একটু বেশি কাহিল, না ?"

"এত কাহিল হননি কখনও মা। মনু, অবু, খুকির বেলা তো দেখেছি।"

একটু থামিয়া বলিল—"লক্ষ্য করেছিস্ মা আমাদের আই-মা, অর্থাৎ ঠাকুরদাদার মা গল্প করতে বড় ভালোবাসেন ?"

শৈলেন একটু অবুঝ ভাবেই মাথা নাড়িল। শশাঙ্ক বলিল—"ঐ হয়েছে কাল্; মা আমাদের জন্যে নিজেকে মেরে ফেলছেন। খাওয়া দেখেছিস তো ওঁর ?—এখন এই রকম খেলে বাঁচবেন ? একটা পুষ্টিকর কিছু পাতে থাকে না।"

দুই ভাইয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। তাহার পর শশাঙ্কই কথা কহিল, বলিল—"আমি আরও সব কথা শুনেছি শৈল, সে-সব কিন্তু এখন থাক্। এটাও তোকে বলতাম না, বললাম শুধু এই জন্যে যে দেখিস, প্রথম বারেই যেন পাসটা করে যাস্।

ছুটি ফুরাইতে দুই জনে আবার নিজের নিজের কলেজে ফিরিয়া গেল।

তাহার পর আরও একটা মাস কাটিয়া গেল।

অবস্থাটা দ্রুত চরমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ডুবন্ত কারবারের গহ্বর থেকে যে সামান্য কিছু টাকা বাঁচানো গিয়াছিল, সেটা গিয়াও আরও কিছু ঋণ হইয়াছে। ঋণের টাকাও আসিয়াছে ফুরাইয়া, আর এবার অবস্থা এমন যে ঋণ পাইবার যা সম্বল—এক-আধখানি গহনা, তাহাও আর নাই বলিলেই হয়।

এবার আবার সব চেয়ে বিপদ, গিরিবালার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ভগবানের একটা দয়া ছিল, কাহারও স্বাস্থ্য লইয়া কখনও ভাবিতে হয় নাই। খোকা হওয়ার পর সেই যে শরীর ভাঙিয়াছে আর সারিতে চাহিতেছে না। নিস্তারিণী দেবী চিন্তিত থাকেন। অভাবের সংসারে দুশ্চিন্তা—কোন উপায় নাই। চিরকাল ধর্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন—দুর্দিনে তাঁহাকেই ধরেন জড়াইয়া—জলপড়া, মাদুলি, মানৎ; কিন্তু কিছু হয় না। তিনিও যেন কি-রকম হয়ে গেছেন আজকাল। অনেক দিন কোন তীর্থ করিতে পান নাই—উপায়ও নাই। মাঝে মাঝে এক চণ্ডীচরণকে দেখা ছাড়া অন্য কোন সন্তানকেই বহু দিন দেখেন নাই—উপায়ও নাই। বোধ হয় বধূকেও হারাইতে হয়,—এরও যেন উপায় নাই। মনটা এখন শুধু অতীতের স্মৃতি লইয়া খেলা করে, ভিতরে ভিতরে একটু তিক্তও হইয়া উঠিয়াছে।

বিপিনবিহারী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন গিরিবালাকে! গিরিবালা উত্তর দেন—"সেরে আর উঠছি না? তুমি সর্বদাই দেখছ তাই বুঝতে পারছ না। এই তো ঠাকুরপো এসেছিলেন, শরীর খারাপ দেখলে তাঁর নজরে পড়ত না?"

"চণ্ডী তোমায় বলেনি, বোধ হয় ভয় পেয়ে যাবে বলে, আমায় তো বলছিল!"

গিরিবালা বেশ ভালো ভাবেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"ভাই-ই তো, চোখের দৃষ্টি আর কত তফাৎ হবে?"

স্বামীর মনে হয়, হয়ত সত্যও বা। আসলে মনটা তো ওদিকে বেশি নাই, মন রহিয়াছে শশাঙ্কের দিকে—মানুষ করিতে হইবে। কাহার সঙ্গে যেন যুদ্ধ চলিতেছে, ক্রমেই জিদটা যাইতেছে বাড়িয়া।

এক মাস পরের কথা। গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া শুইয়া আছেন। শরীরটা কয়েক দিন থেকে বেশি খারাপ, বিছানায় যাইতে ভালো লাগে না, দুপুরের রোদটুকু বড় মিষ্ট লাগে।

আজ শত কষ্টের মধ্যে গিরিবালার মনে একটা নূতন ধরণের আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছে। আজ দিদিশাশুড়ির দেওয়া ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করিতে বসিয়াছেন।

আজ গিরিবালার মুখে তার সেই দিদিশাশুড়ির পান ; প্রবঞ্চনা। ঠিক যে অন্নের অতটা অভাব হইয়াছে তাহা নয় ; পেটের এক দিকে যে বেদনাটা ছিল, সেটা আজ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে মাঝে মাঝে। আজ আহার করিতে পারিলেন না। কেহ ছিল না সামনে, ভাতটা সরাইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু অসুখ জানিতে দেওয়া হইবে না তো। এ সংসারে চিকিৎসার হাঙ্গাম আনিয়া ফেলিলেই যে শশাঙ্ক-শৈলেনের পড়া যাইবে বন্ধ হইয়া। শেষ পর্যন্ত কি হইতে পারে ?—তা ভগবানই জানেন, আজ তো থাক অজানা।

খুব ঘটা করিয়া একটি পান সাজিয়া শীর্ণ ওষ্ঠাধর ভাল করিয়া রাঙাইয়া গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় শুইয়া রহিলেন।

স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেমন একটু ছমছমে ভাব। প্রশ্ন করিলেন—"খেয়েছ তুমি ?"

গিরিবালা মুখটা তাঁহার দিকে ঘুরাইয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ কেন ?

"না, এমনি...."

তাহার পরের বক্তব্যটা বিপিনবিহারী একটু তাড়াতাড়িই বলিয়া গেলেন, যেন এক নিশ্বাসে।—"ইয়ে, একটা কথা তোমায় জিগ্যেস করতে এসেছি—আমাদের মত ঠিক হয়ে গেলে মাকে বলব... জিগ্যেস করা মানে—ঠিকই করে ফেলেছি, আর কোন উপায় তো নেই। মানে, শশাঙ্ক-শৈলেনদের পড়াতে গেলে—মানুষ করতে গেলে—ওদিকে হরেন-পূর্ণেন্দুও তো এগিয়ে এসেছে—তাই এই ঠিক করে ফেললাম—উপায় তো নেই।....বাড়িটা বন্ধক রাখছি।... তাই জিগ্যেস করছিলাম তুমি কি বল। মানে, লেখাপড়া সব ঠিক হয়ে গেছে,....এইবার লোকটাকে নিয়ে বেরুব কোর্টে রেজেষ্টারি করতে....তুমি অমন করে শুয়ে রয়েছ, শরীরটা খারাপ না কি ?"

"কৈ, না তো।"

যন্ত্রণাটা উঠিয়াছিল, এই মাত্র উপশম হইয়াছে। মুখটা বেশ ভালো ভাবেই স্বামীর পানে ঘুরাইয়া লইলেন গিরিবালা, একটু হাসিলেনও।...স্বামী দেখুন না, যাহার শক্ত অসুখ সে কখনও খাইয়া পান চিবায়, কখনও হাসিতে পারে ?

বলিলেন—"বন্ধক রাখছ, কিন্তু বাড়িটাও গেল...."

তাহার পরই যেন অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"তা রাখো—রাখো—ভাল করে মানুষ হোক ওরা।"

বিপিনবিহারী চলিয়া যাইবার পর প্রায় মিনিট দশ-বারো হইয়াছে অবু ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"মা কে আসছে বলো তো ?—বড়দা !"

শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিয়া একটু ব্যগ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"বাবা চলে গেছেন মা ?"

গিরিবালার তখন বেদনাটা উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিলেন না, সেটাকে চাপিয়া একটু হ্রস্ব শব্দ করিয়া বলিলেন—"হঠাৎ এলি যে ?"

শশাঙ্ক শঙ্কিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও কি ?"

"ও কিছু নয়, একটা ব্যথা, খাবার পরেই উঠল, আজ এই প্রথম। এক্ষুনি সেরে যাবে।....হঠাৎ এলি যে ?"

শশাঙ্ক যে মাকে এত খারাপ অবস্থায় দেখিবে ভাবিতে পারে নাই, বলিল—"বাবা চলে গেছেন—রেজেষ্টারি করতে ?"

বিস্মিত প্রশ্ন হইল—"তুই কি করে টের পেলি ?"

শশাঙ্ক পূর্ণেন্দুর পানে চাহিয়া বলিল—"তুই শীগগির যা, গাড়ির এখনও মিনিট-কুড়ি দেরি আছে, বলবি—বলবি—মার শরীরটা বড় খারাপ···না, থাক, বলবি দাদা পাটনা থেকে এসেছেন—খুবই একটা দরকারী কাজ—তিনি যেন এক্ষুনি ফিরে আসেন।....যা, যদি না আসেন, পা জড়িয়ে ধরবি, পারবি ?"

গিরিবালা হতভম্ব হইয়া গেছেন, বলিলেন—"কথার উত্তর দিলিনি—হঠাৎ এলি যে ? আর টের পেলি কি করে, যে ?....

"পড়া ছেড়ে দিয়ে এলাম মা।"

গিরিবালার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিলেন—"ছেড়ে দিলি ?—কি সর্বনাশ করলি শশাঙ্ক !—কেন ?"

মনের আবেগ চাপিবার চেষ্টায় শশাঙ্ক একটু অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরই ভাঙ্গিয়া পড়িল—"আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই মা ? তোমরা পথে দাঁড়াতে চলেছ—আর দিদিশাশুড়ির ব্রত নিয়ে তিল তিল করে তুমি নিজেকে মেরে ফেলছ—আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই ?....তুমি আজ খাওনি—তোমার মুখের ও পান মিথ্যে—আমাকেও ঠকাবে ? বলো, মিথ্যে নয়—বলো না...."

মায়ের বুকে মুখ ঢাকিয়া শশাঙ্ক হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তৃতীয় পর্যায়

১

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেছে। গিরিবালার জীবনে অনেক কিছুই ঘটিয়া গেল, অনেক পরিবর্তন, অনেক ভাঙা-গড়া। পিতা মারা গেলেন, জেঠাইমা বসন্তকুমারীও; শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবীও নাই। এদিকে আবার তেমনি নূতনেরা আসিয়া জুটিল। নিজের আর একটি কন্যা, ভগবানের শেষ দান। এখন তাহারই বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। শেষ কুড়ানো সন্তান, বড় আদরের, আরও আদরের এই জন্য যে গিরিবালার বিশ্বাস ও মাসি কাত্যায়নী। প্রতিশ্রুতি দেন নাই কাত্যায়নী?—"গিরি, তোর মেয়ে হয়ে জন্মাব, তখন এমনি করে আমায় ধোওয়াবি, মোছাবি, আদর-যত্ন করবি তো?" ....ওর নাম হইল লীনা, বোধ হয় কাত্যায়নী দেবীর মতো অমন করিয়া গিরিবালার মধ্যে আর কেহ লীন হইয়া যায় নাই বলিয়াই।

আরও আসিয়াছে,—পরের মেয়ে নিজের হইয়া। গিরিবালার বেশ মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটি। পরের মেয়ে নিজের হইয়া আসা এতো নিত্যই হইতেছে, তবু নিজের জীবনে যখন ঘটিল, গিরিবালার বড় যেন আশ্চর্য বোধ হইল। মনে হইল বধূরূপে এই যে এ আসিল, এ যেন আরও মধুর,—পরের মেয়ে কি অসীম নির্ভরেই না আসিয়া দাঁড়াইল তাঁহার কাছে।...মায়ার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে একটি কৃতজ্ঞতার ভাব আসে,— ও তাঁহার সন্তানের একটি নূতন রূপ ফুটাইয়াছে। শশাঙ্ককে যেন পূর্ণতর করিয়া আনিয়া দিল।....জীবনে কী সব অপূর্ব অনুভূতি!—কোথায় ছিল এ-সব? এত কষ্ট মা হওয়া, আবার এত আশ্চর্য ভাবে মধুর!

তাহার পর আসিল নব যুগের যাত্রীরা,—গিরিবালার জীবনের ধারা যাহারা ভবিষ্যতের দিকে দিবে প্রসারিত করিয়া,—নাতি-নাতনি। এখন দুইটি সন্তানে তাহারা পাঁচটি।

একদিকে পুরানো যাহা ছিল তাহা গেল ঝরিয়া, এক দিকে নূতন উঠিতেছে গড়িয়া। এক দিকের বেদনা আর এক দিকের এই নূতন আশা-আনন্দের মধ্যে গিরিবালা আছেন এক নূতন রূপে বিকশিত হইয়া। এই রূপকে আরও অপরূপ করিয়া দিয়াছে দ্বারভাঙ্গায় গোড়ার জীবনের দুঃখ-অভাব।...শৈলেনের ডায়েরির এক স্থানে লেখা আছে—"দুঃখ আর কার কাছে কি জানি না, তবে

বাবার জীবনে, মায়ের জীবনে এসেছিল ভগবানের আশীর্বাদরূপে ; ওঁরা যেন তপস্যা আর তীর্থস্নানের পর শান্ত বিশ্বাসে, শান্ত তেজে আর শান্ত মর্যাদায় জীবনের নব পর্যায়ে এসে দাঁড়ালেন।"

শশাঙ্কর বিবাহ হইয়া গেল অল্প বয়সেই, কলেজ ছাড়িবার বছর খানেক পরেই, ওর বয়স যখন বোধ হয় আঠারও হয় নাই। অনেকগুলা কারণ ছিল, সব চেয়ে বড় কারণ বোধ হয় নিস্তারিণী দেবীর নাত বৌয়ের মুখ দেখিয়া মরিবার সাধ, বাঙালী-পরিবারের একটি জরুরী ব্যাপার, যা অনেক ক্ষেত্রেই সংসারের মোড় ফিরাইয়া দেয়। আরও ছিল,—গিরিবালা সংসারে একা পড়িয়া গেছেন। আরও একটা কারণ, ঠিক কারণ না বলিলেও চলে,—এই কারণগুলার পরিপোষক।—

শশাঙ্ক সে শুধু কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছিল এমন নয়, এক রকম চাকরি হাতে করিয়া আসিয়াছিল। সেই যে পূজার ক'টা দিনের জন্য আসিয়াছিল তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল তাহার উচ্চ শিক্ষার মানে হয় সংসারের ধ্বংস ;—শুধু সঙ্গতির দিক দিয়াই নয়,—বাবার বোধ হয় কঠিন পীড়া হইয়া পড়িবে, আর মাকে যে হারাইতে হইবে সেটা একেবারেই সুনিশ্চিত। ইহার পর এক দিন সে নিতান্ত অতর্কিত ভাবেই বিপিনবিহারীর বাড়ি বন্ধক দেওয়ার কথাটা শুনিয়া ফেলিল। সে সময় যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাস দিয়াছে তাহাদেরও অনেক সুবিধা ছিল। তায় সে ভালো ভাবেই পাস দিয়াছে, কয়েকটা আফিসে দরখাস্ত করিয়া দিল। সময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পড়িল। সেই আহ্বানেই সে বাড়ি আসে।

চাকরি হইল, সুতরাং নিস্তারিণী দেবীর সাধ মিটানোর এবং গিরিবালাকে একটি সহায়িকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় কোন বাধা রহিল না।

সব চেয়ে বড়টি নাতনি—বয়স বছর নয়-দশের মধ্যে ; ভাইটি বছর ছয়েকের, ছোটটি মেয়ে,—একেবারে কোলের। গিরিবালা বিপিনবিহারী দু'জনেরই এখন অবসর আছে জীবনে আর সেই সঙ্গে আছে জীবনের প্রতি একটা অনুরাগ—আজকের এই স্বচ্ছলতা, এই স্নিগ্ধতাটুকু সৃষ্টি করিবার জন্যই তো প্রাণপাত করিতে বসিয়াছিলেন দু'জনে, এখন ইচ্ছা করে ওর সমস্ত মধুটুকু কণ্ঠ ভরিয়া পান করি। আর এর যত মাধুর্য কি ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে এই নাতি-নাতনিদের মধ্যে? অবশ্য

গিরিবালার অবসর অত বেশি নয়—তবে বিপিনবিহারীর একেবারে পূর্ণ মুক্তি,—সংসারটা ছাড়িয়া দিয়াছেন স্ত্রীর হাতে, নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন এদের হাতে।

এত বড় ভার পাইবার জন্যই হোক, বা যে জন্যই হোক, বড় নাতনিটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পাকা গৃহিণী। সংসার থেকে সমস্যার টুকরা-টাকরা কথার আমদানি করিয়া ঠাকুরদাদাকে লইয়া তাহার এই নূতন সংসার ভাঙে পড়ে। চালের দর, ডালের দর, পড়ানোর খরচ, কুটুম্বিতার ভাবনা - ঠাকুরদাদার সঙ্গে খুব জোর আলোচনা হয়। অভিমত যা দেয়, তাহার যেমনি ওজন তেমনি দাম।—"এক সময় ছিল যখন টাকায় আট মোণ চাল ছিল, এখন সে জায়গায় আট সের চাল খেয়ে চারিদিক্ সামলানো কম কথা ?—বলো দাদু ?"

আট মণ চালের কথা বিপিনবিহারী বোধ হয় নিজের ঠানদিদির মুখেও শোনেন নাই; একটু ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করে, হাতে হুঁকা বা গড়গড়ার নল থাকিলে খুব গম্ভীর ভাবে টান দিয়া বলেন—"তোমার সেই ছেলেবেলাকার কথা বলছ তো ?"

নাতনি একটু আড়-চোখে চায়,—ঠাট্টা নয় তো ?···সংসারের দিক্‌টাই ছাড়িয়া দিয়া অন্য কথা পাড়ে,—"আজ আবার দাদু মেজকাকা পড়তে ডেকেছিলেন। সময় থাকলে আমি কেনই বা যাব না দাদু ? এইটুকু বোঝেন না। মেজকাকার সবই ভাল দাদু, শুধু বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। কথায় বলে না ভোঁতা বুদ্ধি ?—তাই আর কি।"

"গিয়েছিলে পড়তে তুমি ?"

নাতনি একটু বিরক্তির সহিত মুখটা ভার করিয়া বসে,—সবাইকে আক্কেল খোয়াইতে দেখিলে মুখের অবস্থা যেমন হওয়া স্বাভাবিক। একটু পরে ঠোঁট দুইটা ফুলাইয়া মুখের পানে চাহিয়া বলে—"তুমিও বেশ ভেবে-চিন্তে কথা বল না দাদু, খুব সময় দেখছ আমার !"

গিরিবালার অবসর হয় দুপুরে একটু, আর সন্ধ্যার পর। নাতিটিই একটু বেশি প্রিয়, অন্তত বেশি ঘিরিয়া থাকে সে-ই। তাহার দুশ্চিন্তা অন্য রকম,—একটু নিজেকে কেন্দ্র করিয়া। গিরিবালা কোলেরটিকে লইয়া শুইয়াছেন, খোকন আসিয়া উপস্থিত হইল। ওর প্রায় রোজই এক প্রশ্ন ;—পাশতলা দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিবে—"হ্যাঁ গিন্নি, বৌ এসে মাটিতে পা দেবে ?"

গলাটা বয়সের পক্ষে একটু বেশি মোটা, দুর্ভাবনা আর উৎকণ্ঠার ভাবটা একটু বেশি করিয়াই ফুটিয়া ওঠে।

এক দিকে খুকি, অন্য দিক্‌টা সে দখল করিয়া শোয়। ঐ সূত্র ধরিয়াই গল্প আরম্ভ হইয়া যায়—

গিরিবালা বলেন—"সে কি ভাই, অমন কথা মুখে এনো না। নাতবৌ এসে যদি মাটিতে পা দেয় তো আমাদের দু'জনের বেঁচে ফল কি?—তোমার দাদুর আর আমার কথা বলছি।"

সঙ্গে সঙ্গেই গল্প উঠে জমিয়া। খোকন "হুঁ" দেয়, অর্থাৎ চলুক ঠিক শুনছি।

গিরিবালা বলেন—"যেমনি কি না পালকি এসে গেটের সামনে দাঁড়ালো আমার যত তোলা শাড়ি. তোমার দাদুর যত শাল-আলোয়ান এমুড়ো-ওমুড়ো দেওয়া হবে বিছিয়ে। কি ফলই থেকে যদি নামতে গিয়ে, চলতে গিয়ে নাতবৌয়েরই পায়ে লাগল ধুলো? তার পর সেই শাল-বেনারসীর ওপর দিয়ে ঝমোর ঝমোর করে মল বাজিয়ে···"

কচি কানের কাছে স্বরটি বড় লোভনীয়, খুকি বলে—"ধমোর—ধমোর—ধমোর—"

দাদা অধৈর্য ভাবে ধমক দেয়—"চুপ কর. খুকু, কাজের কথা হচ্ছে।"

অধৈর্য প্রশ্ন হয়—"হুঁ, তার পর গিন্নি?"

তার পর অনেক কথা,—নূতন যুগের নূতন বধূ আসিবে, সে গল্পের কি আর শেষ আছে?

ওদের মা এক এক সময় অনুযোগ করে। হয়তো শ্বশুর-শাশুড়ি দুই জনেই আছেন, বলে—"বাঁদরগুলো আপনাদের বড্ডই ঘেরে ফেলেছে। আবার সেজবৌ আসছে অজুকে নিয়ে। সে শুনছি আবার এর মধ্যেই মহাদিগ্‌গজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার মাসি লিখেছে কি না। ব্যস্, একে তো আমাদের যেন ছেড়েই দিয়েছেন···"

শাশুড়ি বলেন—"ও হিংসে করতে নেই বাছা। আমার ঘর ভরে যাক্····"

বধূ হাসিয়া বলে—ভরার কথা তো হচ্ছে না মা, এমন দখল করে থাকে যে এক একবার যে একটু সুচ্ছন্দে দু'টো কথা জিগ্যেস্ করব তার পর্যন্ত উপায় থাকে না। আর বাবাকে তো আরও টেনে নিয়েছে। ঠাকুরপোরা বলে···"

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলেন—"বাঃ এ যে তোমাদের অন্যায় কথা বৌমা, আমরা এখন নতুন লোক পেয়ে নতুন সংসার পেতেছি; আমাদের ও-বাসি সংসারে টানতে গেলে আমরা আমল দোব কেন?"

২

পাণ্ডুল এখন প্রায় স্মৃতিমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত দিন ক্ষেতটা ছিল, লোকের যাওয়া-আসা ছিল, খবরটা-আসটা পাওয়া যাইত। ক্ষেত গেছেও তো অনেক দিন হইল, প্রায় বারো-তেরো বৎসর, এখন নাতি-নাতনির কাছে গল্পের খোরাক জোগায় পাণ্ডুল; দিক্‌বলয়-লগ্ন সূর্যের মতো দূরে রহিয়াছে বলিয়াই পাণ্ডুলকে এখন একটি রাঙা আভায় যেন ঘিরিয়া থাকে,—নাতি-নাতনিদের কাছে রূপকথার রোমান্স খুব জমে।

গিরিবালা বলেন—"আর পাণ্ডুলে ছিল খজনী, কালো—তা যেমন তেমন কালো নয়, ভাতের হাঁড়ির তলা বলে আমি পদে আছি ; তার ওপর সাদা সাদা বড় বড় দাঁত, গোল গোল চোখ, এই গতর ; ঘুমোলা তো একেবারে কুম্ভকর্ণ, পালের মতন মোটা কাপড় পরে যখন খসখস করে চলত...."

নাতিও গুটিসুটি মারিয়া কাছে ঘেঁসিয়া আসে, বলে—"ভয় করছে গিন্নি !"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"না, ভয় নেই।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া যান, গলাটা কিসের আবেগে স্নিগ্ধ হইয়া আসে, বলেন,—"পাহাড় দেখেছিস্ তো ? এবার দেশে যেতে রেল থেকে দেখালাম, মনে আছে ?"

নাতির বোধ হয় তাড়কা রাক্ষসীর কথা মনে পড়ে, প্রশ্ন করে—"পাহাড়ও উপড়ে ফেলে খজনী ?"

গিরিবালা আবার একটু হাসেন, বলেন—"না, উপড়ে ফেলে না, দেখেছিস তো কি রকম ভয়ঙ্কর দেখতে পাহাড়গুলো ? আমি একবার তীর্থে গিয়ে ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা পাহাড় দেখেছিলাম—গাছপালার নাম-গন্ধ নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো পাথর, বড় বড় ফাটল যেন হাঁ করে গিলতে আসছে, দেখলেই যেন ভয়ে বুক গুরগুরেই ওঠে। সেই পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠে একটা বড় গর্তের মধ্যে দিয়ে খানিকটা ভিতরে গিয়ে পাহাড় কেটেই কী চমৎকার একটা মন্দির ! আর তার ঠিক মাঝখানেতে সাদা পাথরে চমৎকার একটা গঙ্গামূর্তি ! মন্দিরের একটা ফাটল দিয়ে এক জায়গায় ঝির-ঝির করে জল পড়ে একটা নালি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে—বাইরেটা অমন পাহাড়-ফাটা গরম তো ?—ভেতরটা ঠাণ্ডা বরফ, মা যেন নিজেই অবতরণ করছেন...."

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া যান, কি দুইটি জিনিষ যেন মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছেন। তাহার পর বলেন—"খজনী ছিল ঠিক এই রকম, বাইরেটা ছিল ঐ পাহাড়ের মতন কালো কুচ্ছিৎ, দেখলে ভয় করে, কিন্তু তার বুকের

ভেতরটা যে কী মধু ছিল!—একটি নয় তো?—তোর মেজঠানদি থেকে পূর্ণেন্দু পর্যন্ত সবাইকে কোলে নিয়ে খেলিয়েছে—যেটিকে পেত কী মায়া দিয়ে যে জড়িয়ে থাকত! বোধ হয় মায়েও অতটা পারে না....”

কথাগুলা গিরিবালা যে ঠিক নাতির জন্যই সাজাইয়া বলেন এমন নয়, মনের চিন্তাটা যেন আপনি মুখর হইয়া বাহির হইয়া আসে। নাতির পক্ষে বরং বেশ গুরুপাকই হয়; পাহাড়ের মধ্যে ঠাকুরের মূর্তিটি ভালোই বোঝে—চমৎকার একটি রূপকথার মতো, কিন্তু খজনির ভিতর-বাহির লইয়া এর মধ্যে যে রূপকের অংশটুকু সেটা ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে এড়াইয়াই যায়।

চুপ করিয়া থাকিয়া একবার বলে—“আমিও মা গঙ্গাকে দেখব গিন্নি।”

গিরিবালাও খানিকটা চুপ করিয়া থাকেন।...কোথায় গেল খজনী? ছুঁড়িটার জন্য বড় মন কেমন করে এক একবার। অদ্ভুত ধরণের মেয়ে! .. গিরিবালার মনশ্চক্ষু নিজের সংসারের উপর এক একবার দৃষ্টি বুলাইয়া আসে,—এই তো কাম্য—পুত্রকন্যা, শাখা থেকে ভগবান আজ এই প্রশাখা কয়টি পর্যন্ত দিয়াছেন, দয়া হয় আরও দিবেন, তাহার জন্যই তো সাধনা। অথচ খজনী এ সব চাহিলই না!

কেন?....বড় আশ্চর্য লাগে গিরিবালার। কাছে থাকিতে অতটা ভাবিতেন না এ দিক্‌টা; এখন সুখের দিনে, পূর্ণতার দিনে, কথাগুলা আপনিই যেন পথ করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। কেমন একটা ছমছমে ভাব জাগে মনে। সে সব দিনে অত মনে পড়িত না, কিন্তু আজ-কাল খজনীর দু’-একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে, বিশেষ করিয়া যখন সংসারের ভরা-রূপটি চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। খজনী অনেকগুলিকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কিন্তু এখন মিলাইয়া দেখিয়া মনে হয় স্নেহের অন্তরালে খজনীর একটা দারুণ অবিশ্বাস ছিল ছেলে-মেয়েদের উপর। প্রায়ই চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিত—‘না গো দুলহীন্ এদের বিশ্বাস ক’রো না, এরা বড্ড বেইমান, বড্ড বেইমান এরা, বড্ড বেইমান...’

কেন বলিত খজনী এ কথা? কাছে থাকিতে ছিল মাত্র দাসী, অলক্ষ্যে থাকায় এখন তাহাকে মনে হইতেছে মস্ত এক বিদুষী।...অহি অত মায়া বাড়াইয়া গেল চলিয়া; কী বিশ্বাস এদের?...গিরিবালা নাতিকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরেন, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করেন—বাঁচিয়া থাক্।....কিন্তু কীই বা বিশ্বাস?

খজনী কি এই ভয়ে সংসারের পাশ কাটাইয়া গেল?

গিরিবালার আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। খজনীর একটি ছোট ভাই

হইয়া মারা যায়, তাহার পর আর হয় নাই। কথাটা যখন উঠিত, খজনীর মা দাঁত-মুখ খিচাইয়া মেয়েকে দেখাইয়া বলিত—"হবে কোথা থেকে মাইজী? ওই যে ডাইনি বসে আছে আগলে। নিজের যা আশ্রয় করে দিলাম সেখানেও যাবে না, এখানেও আর কাউকে আসতে দেবে না। নৈলে ছেলেটা যখন মারা গেল, ঝাঁটাখাকি ডাইনি স্বচ্ছন্দে বললে কি না—'মা, আর ভাই-টাই হয়ে কাজ নেই মা; হবে না তো?'…নিজের পেটের মেয়ের মুখে এই কথা হুলহীন?—আসতে দেবে ও ডাইনি আর কাউকে?—পেটে থাকতেই খেয়ে ফেলবে…"

কুশ্রী, কদাকার—না, এক এক সময় মনে হয় ভীষণ আকার—খজনী সম্বন্ধে তখন সব কথাই বলা সহজ ছিল, এমন কি বিশ্বাস করাও। আজ স্থান আর কালের ব্যবধানে কথাগুলি নূতন অর্থে আসিয়া দেখা দিয়াছে। খজনীর অবিশ্বাস, খজনীর আতঙ্ক এই লইয়া যে, এরা যখন থাকিবেই না, তখন এদের মিছে আদর করিয়া ডাকিয়া আনা কেন?—যদি নিতান্তই থাকে তাহা হইলেও পদে পদে মায়ায় টান দিয়া, পদে পদে সংসার-বিভ্রম সৃষ্টি করিয়া কাঁদানই যখন এদের উদ্দেশ্য….

শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবী দু'-একবার বলিয়াছিলেন—"অহি যখন যায়, বৌমাকে কাঁদানোই এক দায় হয়ে উঠেছিল; আমি আসার পর উনি যদি তবু কাঁদলেন, খজনী তো একবারও চোখের জল ফেললে না; তার কথা উঠলেই হাঁ করে চেয়ে থাকত পাগলের মতন।"

আজ গিরিবালার কাছে সব একটি অর্থে অর্থবান;—খজনী ভাইয়ের মৃত্যুতে, অহির মৃত্যুতে, বোধ হয় এই রকম আরও সব মৃত্যুতে পিছাইয়া গেল। মা-হওয়ার ভয়েই ও আর মা হইতে চাহিল না। গিরিবালা নিজের মাতৃত্বের আকুতি দিয়া সেই কদাকার মৈথিল শূদ্রাণীর মনের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করেন, যেন থৈ পান না।

হঠাৎ কি মনে হয়, গিরিবালা যেন চেষ্টা করিয়া খজনীর কথা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহেন। হাসিয়া বলেন—"কিন্তু কি কুচ্ছিতই ছিল, বাবাঃ! তোর দাদু কি বলতেন জানিস্?"

"কি গিন্নি, কি বলতেন?" নাতি উল্লসিত হইয়া ওঠে, ভাবে গল্প বুঝি এবার নূতন পথে মোড় ফিরিল।

গিরিবালা বলেন—"বলতেন মেনকা; মেনকা হোল স্বর্গের পরী কি না…."

বেশ জোরেই হাসিয়া ওঠেন।…যথাসাধ্য চেষ্টা—খজনীকে মন থেকে

সরাইতেই হইবে; কোন দোষ নাই, খুবই ভালো খজনী, অথচ মনে কি একটা অস্বস্তি জাগায়,—ওর মনের অমঙ্গল আতঙ্কের আঁচ লাগে যেন।

পাণ্ডুলের রূপকথা অন্য দিক্ দিয়া আরম্ভ করেন,—পাণ্ডুলের যখন সুখের দিন, মধুসূদনের প্রতিপত্তি যখন মধ্যাহ্ন-রেখায়, তখনকার কথা সব। খুব ঘটা করিয়া আরম্ভ করেন গিরিবালা—"তাহলে শোন্, তোর বাপের জন্মের কথা থেকেই আরম্ভ করি...."

নাতিও পিতৃ-জন্মকথা খুব ঘটা করিয়া শুনিবার জন্য নড়িয়া-চড়িয়া শোয়, বলে—"হুঁ বলো। আমার বাবা তো আগে জন্মেছিলেন গিন্নি, না? অজুর বাবা তো তার পর..."

চমৎকার জমিয়া ওঠে, আর চেষ্টা করিয়া হাসিতে হয় না গিরিবালাকে, আপনা হইতেই খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া বলেন—"শোনো কথা বোম্বেটের! এর মধ্যে বাপের জন্ম নিয়ে হিংসে আরম্ভ হয়ে গেছে ভাইয়ে-ভাইয়ে!...আর তোর বাবা যে এদিকে বলে—আমি বড় না হয়ে সব ছোট হয়ে জন্মালে বাঁচতাম?"

"বাবা ছোট-কাকা হয়ে যেতেন গিন্নি?"

"হোত না? তখন কোথায় বা থাকতে? কারই বা হিংসে করতে?"

এ কল্পনাতীত অবস্থা খোকার মাথায় ঢোকে না, আবার ধাঁধায় পড়িয়া একটু চুপ করিয়া থাকে। গিরিবালা বলেন,—"না; ছোট ভাইএর হিংসে করতে নেই। গল্প শোন্ঃ তোর বাবা যখন জন্মাল, সমস্ত পাণ্ডুলে হৈ-হৈ পড়ে গেল, সরকারের প্রথম নাতি হয়েছে, সোজা কথা নয় তো? সামনের অত-বড় বটতলা আর অশথতলা তো একেবারে অষ্টপ্রহর লোক গিজ্-গিজ্ করছে—সামনে উঠোনটায় প্রকাণ্ড সামিয়ানা পড়েছে—ভাট, নটুয়া, বাজনা বাদ্যি—এতটুকুর জন্য বিরাম নেই। বাড়িতে এদিকে তোর বাবার চিৎকার—বড্ড চেঁচাত কি না, কাক-চিল বসবার জো ছিল না—ওদিকে বাইরে ঐ সব। তোর বাবার যিনি ঠাকুর্দা, আমাদের যিনি বাবা আর কি, তাঁর ভেতরে ভেতরে খুব আমোদ হয়েছে; কিন্তু সে কথা তো মানবেন না, তোর বাবার ঠাকুরমাকে বলছেন—'কী এক তোমার নাতি হয়েছে বাবু, বাড়িতেও টেঁকতে দেবে না, বাইরেও টেঁকতে দেবে না...'

বৃদ্ধের এই অসহায় অবস্থায় খোকার মনে কোথায় সুড়সুড়ি লাগে, একেবারে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার পর প্রতিকারের কথা মনে পড়ে, বলে—"নাটুয়াদের কেন তাড়িয়ে দিলেন না গিন্নি? আমি যদি থাকতাম তো..."

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"বটেই তো, বাবা উঠানে শুয়ে ট্যাঁ-ট্যা করছে, সে সময় তোমার না থাকলে মানাবে কেন? কথায় বলে না?—বাবা পেটে, মা হাঁটে, আমি তখন বছর আটে।....নটুয়ারা কি কারুর হুকুমে এসেছে যে তাড়ালেই যাবে চলে? সরকারের নাতি হয়েছে, তারা আমোদ করতে এসেছে, তাদের তাড়ায় কে? গান শোনাবে, বকশিস নেবে, তার পর যাবে।....এদিকে ঐ, এর ওপর ঘোড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে হাতিও আওয়াজ করে উঠছে...."

"পক্ষিরাজ ঘোড়া গিন্নি?"

গিরিবালা খানিকটা বাড়াইয়া বলিতেছিলেনই, নাতির পক্ষে রুচিকর করিয়া তবে তাহার কল্পনা যে আবার এতটা উদ্‌বুদ্ধ হইবে ভাবিতে পারেন নাই। হাসিয়া বলেন—"হ্যাঁ, পক্ষিরাজ বৈকি, তুই কি ভেবেছিস এই ঘোড়া না কি, দুৎ!"

এর পরে আর সুর নামানো যায় না, পাণ্ডুল আপনা-আপনিই রূপকথার রাজ্য হইয়া পড়ে। একে পাণ্ডুল, তায় প্রথম সন্তানের কথা একটি স্বপ্ন-যুগেরই স্মৃতি, গিরিবালার আর একটুও যেন বাধে না। ঘোড়া যেমন পক্ষিরাজ হইয়া যায়, হাতিও তেমনি হইয়া পড়ে ঐরাবৎ। গল্প চলিতে থাকে: শুভ উপলক্ষে অনেকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছিল—কেহ পালকিতে, কেহ ঘোড়ায়; দূর কুঠি থেকে এক-আধ জন বোধ হয় হাতিতেও,—একের জায়গায় পাঁচগুণ করিয়া গিরিবালা গল্প চালাইয়া যান। এমনও কত বিচিত্র কাণ্ড সব হয় যাহার মূলে মোটেই কিছু নাই।...কচি ছেলের কান্না শুনিয়া কোন্ গ্রাম থেকে অপরূপ সুন্দরীর বেশ ধরিয়া কোন্ এক ডাইন আসিতেছিল, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়া কি পরিণামটাই হইল তাহার। আরও সব অনেক কাণ্ড। দুই জনের জগৎ—নাতি আর ঠাকুরমা, তৃতীয় কোন অধিকারীর প্রবেশ নাই সেখানে, তাই কোন প্রশ্ন নাই, কোন সংশয়ের ছায়া নাই—শুধুই কথার আনন্দ, আর শোনার বিস্ময়—দ্বারভাঙ্গার অস্তিত্বই যেন যায় মিটিয়া।

এক সময় নাতি হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আর পরী এলনা গিন্নি?"

গিরিবালা থামিয়া যান, মনে মনে বোধ হয় একটু হাসেন, তবে হারটা একেবারে স্বীকার না করিয়া বলেন—"ওমা, পরী এসেছিল বৈকি, সে কথা বুঝি তোকে বলিনি এতক্ষণ? তোর বাবার জন্মেতে আর পরী আসেনি!"

একটু ভাবিতেই গিরিবালার সমস্ত মনটি আলো করিয়া পরী আসে নামিয়া,—দুলারমন। পাণ্ডুলে তো দু'টো পরীই ছিল,—এক খজনী ছদ্মরূপে, আর এক দুলারমন, রূপের ডালি সাজাইয়া।

নাতির সামনে গিরিবালা প্রিয়সখীকে নিখুঁৎ করিয়া আঁকিয়া তোলেন, এমন পট-ভূমিকায় তাহাকে পাইয়া মনটা উল্লসিত হইয়া ওঠে।

"পরীও এসেছিল। কী তার রং!—সমস্ত পিঠ ছেয়ে কালো চুলের ঢেউ, ভোমরার মতন কালো চোখ, তার ওপর সরু-উ-উ দু'টি ভুরু কে যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; তিল ফুলের মতন নাক; ঠোঁট বলে এবার আমি রক্তে ফেটে পড়ব। আর সে কি দাঁত!—যেন দু'সারি মুক্তো সাজানো, যখন হাসছে, মনে হয়...."

নাতি প্রশ্ন করে—"কে বিয়ে করলে গিন্নি?"

গিরিবালা একেবারেই খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"কেন, মতলবখান কি বলো দিকিন শুনি? তাকে মেরে ধরে কেড়ে নিয়ে আসবে না কি?"

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গম্ভীর হইয়া যান, দুলারমনের প্রসঙ্গে মনে যেন কী একটা জোয়ার আসিয়াছে, বাধা মানে না। বলেন—"শোন্ না, তোর বাবাকে পাশে নিয়ে উঠানে বসে রোদ পোয়াচ্ছি, হঠাৎ যেন সমস্ত উঠোনটা আলো করে পরী এল। কোলের উপর হাত দু'টি জড়ো করে, দাওয়ায় বসে ঠায় তোর বাবার পানে চেয়ে আছে, মুখে মিটি-মিটি হাসি, কি যেন একটা দুষ্টুমির কথা বলব বলব করছে—সর্বদাই হাসি-ঠাট্টা ভালোবাসত কি না; তার পর হঠাৎ বলে উঠল—'দুলহীন, তুমি একটু চোখ বোজ দিকিন।'

জিজ্ঞেস করলাম—"কেন?"

'খোকাকে নিয়ে আমি পালাব, চমৎকারটি হয়েছে।'

আমি হেসে বললাম—"চোখ বোজবার দরকার কি, তুমি এমনিই নিয়ে যেয়ো না দুলারমন।"

নাতি প্রশ্ন করে—"পরীর নাম ছিল গিন্নি?"

গিরিবালা বলেন—"নাম ছিল বৈ কি; সবাই বড় ভালবাসত, তাই নাম হয়েছিল দুলারমন—ওদের ভাষায় দুলার মানে তো আদর করা?...আমি বললাম—"তুমি নিয়েই যাও না, যা কাঁদুনে হয়েছে! তোমার ঠাণ্ডা ছেলে হলে বরং আমায় দিও। তাই শুনে সে কি..."

নাতি বাধা দিয়া প্রশ্ন করে—"পরীদের ছেলে খুব ঠাণ্ডা হয় গিন্নি? একটুও কাঁদে না?"

গিরিবালা বলেন—"এ-পরী যে নিজে বড্ড ঠাণ্ডা ছিল..."

"একটুও কাঁদত না?"

"না, তুলারমন-পরীকে যখনই দেখ, শুধু...."

হঠাৎ যেন মনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, গিরিবালা চুপ করিয়া গেলেন। আজ ঠিক করিয়াছিলেন রূপে, রঙ্গপ্রিয়তায় তুলারমনের যে আনন্দ মূর্তি, নাতির কাছে সেইটিই লোভনীয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন, ভগবানের আশীর্বাদে তিনি যে সুখটুকুর আজ অধিকারী, প্রিয় সহচরীকে মনে মনে যেন তাহার ভাগ দেওয়া,—নাতিকে লইয়া দুই সখীর কৌতুক। নাতির একটি প্রশ্নে সব ওলট-পালট হইয়া গেল, উত্তরটি মুখে আটকাইয়া গেল।

গিরিবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; মন হঠাৎ রূপকথার পাণ্ডুল থেকে বাস্তব পাণ্ডুলে নামিয়া আসিয়াছে। একবার নাতির নিকট উৎসুক তাগাদা খাইয়া তাঁহার ঘোরটা ভাঙিল, বলিল—"অ্যাঁ, কি বলছিলি—কাঁদতো না?....না, হাসিই ছিল মুখে লেগে তার....তবে কাঁদতও....কাঁদত বৈ কি..."

রূপকথায় নাতি এক জন অথরিটি, ঠাকুরমাকে সাহায্য করে—"না কাঁদলে মাণিক ঝরবে কি করে, না গিন্নি? পরীদের তো কাঁদলে মাণিক ঝরে, হাসলে মুক্ত ঝরে...."

গিরিবালা যেন কূল পান—"হ্যাঁ, মাণিকই ঝরত, তার কান্নায় মাণিকই ঝরত বটে—"

নাতি নিজের অভিমতে বোধ হয় গর্ব অনুভব করে, একটু গম্ভীর হইয়া বলে—"আর তুমি বলছিলে কাঁদত না!"

"না কাঁদত—কাঁদত বৈ কি।"—গিরিবালা আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন, কথা হইয়া পড়ে অসংলগ্ন—"কাঁদত, তবে হাসতই বেশি...রো'স্ হয়েছে—এবার মনে পড়েছে—সে হাসি দিয়ে কান্না চেপে রাখত—তাই মুক্তায় মাণিকে জড়াজড়ি হয়ে যেত তাহার হাসিতে...."

নাতির সব জানা,—এক-এক সময় ঠাকুরমার এই রকম কি হয়, ক্রমাগতই তাঁহাকে সাহায্য করিতে হয়, মনে করাইয়া দিতে হয়, গল্প কিন্তু আর কোন মতেই জমে না।...তবু একটু চেষ্টা চলিল।

তাহার পর এক সময় একটা ছুতা করিয়া সে নামিয়া গেল।

তুলারমনের চিন্তা আসিয়া গিরিবালার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল।....কোথায় গেল তুলারমন? শেষ পর্যন্ত হতভাগিনীর জীবনে কি হইল? পাণ্ডুলে নাই, পাণ্ডুলের কেহ দিতে পারে না কোন খবর। কয়েক বৎসর আগে একবার গঙ্গাস্নানের জন্য এই পথ দিয়া মেয়ে-পুরুষের একটি যাত্রিদল যাইতেছিল; একটি আধ-বুড়ি গোছের স্ত্রীলোক 'তুলহীন' বলিয়া আসিয়া পরিচয় দিল, সে পাণ্ডুলের

নিকটবর্তী সাগরপুরের লোক। কিছু কিছু গল্প হইল। তাহার নিকট মাত্র এইটুকু টের পাইয়াছিলেন যে, দুলারমন পাণ্ডুলে নেই, ওদের বাড়িতে মাত্র তাহার ভাই ভাজ আর তাহাদের দুইটি ছেলে আছে। মনে হইল বুড়ি দুলারমন সম্বন্ধে আলোচনাটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই করিতেছে। তাহার পর দলের লোকেরা হঠাৎ ডেরা তুলিয়া যাত্রা করায় আর কথাটা পরিষ্কার হইল না। আরও কয়েক বৎসর পরের কথা—বিপিনবিহারীর একবার মধুবাণীতে দরকার পড়িয়াছিল; গিরিবালা একটু খোঁজ লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। বিপিনবিহারী আসিয়া বলিলেন—"ওদের বসত-বাড়িটা কিনিয়া লইয়া কে এক জন একটা কোঠা-বাড়ি তুলিয়াছে। তাও তালা-বন্ধ ঃ এদিকে গাড়িরও সময় হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর বেশি খোঁজ লইতে পারিলেন না।

এই প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে দুলারমনের মাত্র এইটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে। মাঝে মাঝে এই দুইটি সংবাদ-কণিকার চারি ধারে গিরিবালার মনটা যেন পাক খাইতে থাকে—প্রিয়কে ঘিরিয়া তো থাকে আশঙ্কাই?—গিরিবালার কেবলই মনে হয়, দুলারমনের আলোচনায় সেই বুড়ির মনটা হঠাৎ যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, কেন?

নাতি উঠিয়া গেলে গিরিবালা চুপ করিয়া বিছানাতেই শুইয়া রহিলেন, পাশে নাতনিটি ঘুমাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুলারমন যেন চোখের সামনে মিলাইয়া মিলাইয়া যাইতেছে—প্রথমে সেই হাস্যময়ী নবপরিচিতা কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায় রহস্য,—দুলারমন আসিয়াছে, বাড়ি গুমট যেন সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া গেল। তাহার পর সেই ব্রীড়াময়ী বধূ,—গহনায়, শাড়ি-আংরাখায়, নূতন প্রসাধনে জমজম করিতেছে দুলারমন....গিরিবালা শাশুড়িকে প্রশ্ন করিতেছেন—"মা, সীতাও না কি এই রকম ছিলেন মা?"...আরও পরের কথা, গিরিবালা বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়া আসিলেন, দুলারমন পাণ্ডুলেই, কিন্তু আসে না। বড় ননদ বিরাজমোহিনী জানাইলেন—ওকে শ্বশুরবাড়িতে আর নেয় না।.... অবশেষে অনেক ডাকাডাকির পর এক দিন আসিল দুলারমন। মলিন, ক্লান্ত, অবসন্ন, ফুলটিকে যেন ভিতরে ভিতরে পোকায় কাটিয়াছে, এইবার ঝরিয়া পড়িবে। তবু হাসি-জীবনের অসফলতাকে হাসি দিয়া ঢাকিবার সে কী অমানুষিক চেষ্টা! সেই কথা মনে করিয়াই তো গিরিবালা নাতিকে বলিলেন—"সে হাসি দিয়ে কান্না চেপে রাখত, মুক্তোয় মাণিকে জড়াজড়ি হয়ে যেত তার হাসিতে।...তাহার পর আরও মলিন, আরও মলিন, আরও মলিন—যেন আর চাওয়া যায় না দুলারমনের পানে। এই চিত্রপরম্পরার শেষ চিত্রটি এখনও

চোখে যেন লাগিয়া আছে,—পাণ্ডুল ছাড়িয়া শেষ যাত্রায় চলিয়াছে তাঁহাদের শামপেনি, যতক্ষণ দেখা গেল ভুলারমন বাড়ির চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আঁচলে প্রায় সমস্ত মুখটা ঢাকা, তাহারই উপর দিয়া শামপেনির পানে চাহিয়া আছে—যতক্ষণ দেখা যায়—যত দূর পর্যন্ত।....তাহার সব গেছে, এই বিদেশী পরিবারের দরদ ছিল যেন একটা অবলম্বন, বিধাতা সেটুকুও ঘুচাইলেন।

এর পর আসিল পাণ্ডুল আর মধুবাণীর ঐটুকু খবর।

আজ খুব বেশি করিয়া ডুলারমনকে রঙে আলোয় সাজাইতে গিয়া তাহার চারি দিকের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া গেছে। কেবলই মনে হইতেছে কোথায় গেল ডুলারমন, হতভাগিনীর জীবনের শেষ পরিণাম কি? ডুলারমনের আলোচনায় সেই বৃদ্ধা হঠাৎ অমন হইয়া গেল কেন? আর সহ্য করিতে না পারিয়া ডুলারমন কি শেষে...

চিন্তাটাকে গিরিবালা যেন দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে চান।

৩

যাহাকে হারানো যায়, ঠিক তাহার জায়গাটি অন্য কেহ পূরণ করিতে পারে না, কেন না, প্রত্যেকেই তো একটি আলাদা জগৎ লইয়া আমাদের জীবনে প্রবেশ করে? তবু গিরিবালার এক এক সময় মনে হয় ননীবালা যেন তাঁহার ডুলারমন,—হাস্যময়ী, যেখানে থাকেন, যেখান দিয়া যান, একটি যেন অদৃশ্য আলো বিকিরণ করিতে থাকেন। ওঁর বাপের বাড়ি তো এখানেই, এদিকে আসিয়া স্বামীও এই সহরেই বাড়ি করিলেন, আর তাও গিরিবালাদের বাড়ির কাছেই; মাঝে একটি সরু রাস্তার ব্যবধান, তাহার পর খান দু'য়েক বাড়ি বাদ দিয়াই ননীবালাদের বাড়ি।

বেশ জমে দুই জনে। অবশ্য অনেক দিনের কথা হইয়া গেল, ওঁর বাড়িটিও এখন ছেলে-মেয়ে-দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে ভরা, তবু নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একবার করিয়া আসা চাই-ই। তাহা ভিন্ন কোথায় নূতন কি হইতেছে—থিয়েটার, বাংলা বায়স্কোপ, কি বাংলা দেশ হইতে কথক আসিয়াছে, বা কীর্ত্তন দল—দ্বারভাঙ্গাতেই হোক বা লাহেরিয়াসরাইয়ে—যাওয়া চাই। শুধু ননদ-জায়ে নয়, বৌয়ে-ঝিয়ে একটি বড় দল করিয়া। একটা কিছুর গুজব উঠিলে গিরিবালার মেয়ে-বৌয়েরাও সপ্তাহখানেক পূর্ব থেকে ননীবালারই দরবার শুরু করিয়া দেয়।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে লাহেরিয়াসরাই বারোয়ারী-তলায় একটু বিশেষ ধুমধাম হয়, দ্বারভাঙ্গায় কালীপূজায় যেমন থিয়েটার হয়। দ্বারভাঙ্গার সবাই যে যাইতে পারে এমন নয়, অনেকটা দূর ; তবে ননীবালার একেবারে বাঁধা। গিরিবালার আপত্তি বিশেষ থাকেও না, থাকলেও খাটে না। এবার আবার কাশী থেকে নাচের ছেলে আসিয়াছে, একটু সাড়া পড়িয়া গেছে বেশি। ভিড় হইবে, একটু সকাল সকালই গেছেন।

থিয়েটার আরম্ভ হইবার খানিকটা আগে পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক সময় মেয়েদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; তাঁহারা দেখিয়া-শুনিয়া, আলাপ-পরিচয় করিয়া বেড়ান, পর্দা সে রকম ঢিলা হওয়া এই সেদিন থেকে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ভিন্ন বিশিষ্ট বেহারী পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও আসেন, তাঁহাদের মধ্যে পর্দার কড়াক্কড়ি একটু বেশিই।....এই ঘণ্টাখানেকের সময় পুরুষেরা একটু সরিয়া থাকে ; থিয়েটারের সাজঘরে যা একটু জটলা হয়।

নূতন পরিচয় করার উৎসাহ এবং দক্ষতা দুইটাই কম গিরিবালার। দেবীমণ্ডপের কাছে কয়েক জন পরিচিতার সঙ্গে দেখা হইল, একটু গল্প-গুজব হইল, তার পর মেয়েদের জায়গায় একটু আগের দিকে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ননীবালা হাত-কয়েক দূরে এক জনের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, বলিলেন—"তা'হলে আমাদের জন্যেও খানিকটা জায়গা আগলে রেখো বৌদি, নৈলে ঝগড়া হবে…"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জন মহিলা আসিয়া গিরিবালার পাশে বসিতেছিলেন,—বর্ষীয়সী, প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়স, টকটকে রং, লম্বায় আড়ে দশাসই চেহারা, হাতে একটা মাঝারি সাইজের পানের বাটা ; শরীরের গুরুত্বের জন্যই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ননীবালা কথাটা শেষ না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তা বলে বৌদি তুমি যেন জায়গার জন্যে হুট করে ঝগড়া করতে যেওনা কারুর সঙ্গে, নিজের ওজন না বুঝে...."

বর্ষীয়সীর পানে আড়ে চাহিয়া লইয়া হঠাৎ একটু ভয়ের অভিনয় করিয়া বলার ভঙ্গীতে কাছাকাছি সবাই হাসিয়া উঠিল। গিরিবালাও মুখটা ঘুরাইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিলেন।

বর্ষীয়সী হাসিয়া একটা হাতের ভরে বসিতে বসিতে বলিলেন—"সে তোমার ভয় নেই বাছা, এবার যা সেপাই বসলাম, তোমার জায়গা রক্ষে...."

ননীবালা ঠোঁটে অল্প একটু হাসি লইয়া আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন—

"মাপ করবেন, আমার একটু বলা মুখ, রক্ষে করবার জন্যে সেপাই আর আমার রাখবেন কি? সবটাই তো নিজেই গ্রাস করে নিলেন।"

সকলেই একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বর্ষীয়সী একটু রঙ্গপ্রিয়ই—মোটা লোকে প্রায় হয়ই, নিজেও শরীর দুলাইয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—"না, তুমি যাও। অভয় দিচ্ছি, না কুলোয় ছেড়েই দোব জায়গা, আর কি হবে?"

ননীবালা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"এর চেয়ে ভয়ের কথা কি আছে?"

"কেন গো?"

"আমার ঐ পানবাটাটির ওপর লোভ ছিল, ভেবেছিলাম জায়গায় যে লোকসানটা গেল, পানবাটার মধ্যে থেকে সেটা সুদে-আসলে উসুল করে নোব, তা গেলে তো আর আপনি ওটা ছেড়ে যাবেন না? আমি আসছি শীগ্‌গির"—বলিয়া হাসির মধ্যে ননীবালা সঙ্গিনীকে লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে, গিরিবালা বর্ষীয়সীর সহিত গল্প-সল্প করিতেছেন, ননীবালা আসিয়া আবার উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক, প্রায় এঁদেরই বয়সী, তাহার পিছনটিতে এক পাশে দাঁড়াইয়া একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। ননীবালা স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া গিরিবালাকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই ইনি।"

গিরিবালা একটু বিস্মিত ভাবে নবাগতাকে দেখিয়া লইয়া ননীবালার পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন, ননীবালা বলিলেন—"উনি পাণ্ডুলের বিপিনবাবুর স্ত্রী গিরিবালার খোঁজ করছিলেন, আমি দ্বারভাঙ্গায় থাকি শুনে; তা তুমিই তো?"

স্ত্রীলোকটি অল্প একটু হাসির সঙ্গে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"আপনি একবার উঠবেন দয়া করে?"

গিরিবালার চোখের সামনে একটা পর্দা যেন ওঠা-নামা করিতে করিতে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে—একবার স্মৃতি, আবার তখনই সন্দেহ—তাহার পর তাঁহার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, একবার জিভের একটু জড়তা কাটাইয়া বিস্ময় আর আনন্দের অর্ধস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"দুলারমন না?"

নূতন ধরণের নামে বর্ষীয়সী আর ননীবালা উভয়েই চকিতে একবার স্ত্রীলোকটির মুখের পানে চাহিলেন। কিছু একটা রহস্য আছে সন্দেহ করিয়া ভদ্রতার খাতিরেই ননীবালা বলিলেন—"আমি আসছি বৌদি!—না হয় উনি যখন ডাকছেন, তুমি ওঠ, আমি জায়গা আগলাই, এবার ভিড়টা এদিকেই ঝুঁকবে।"

হঠাৎ বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"এবার আপনি তা'হলে আপনার পান বের করতে পারেন।"

বর্ষীয়সী হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হঁ্যা, এসো ; এতক্ষণ হুকুম না পেয়ে যে কী ছটফটানিটাই ধরেছিল আমার।"

পূজার দালানের পাশে বাহিরের দিকে এক ফালি রক আছে, গিরিবালা আর দুলারমন তাহার এক কোণে একটু নিরিবিলি দেখিয়া দাঁড়াইলেন ; বিস্ময়ে গিরিবালার মুখে যেন কথা সরিতেছে না। একটা মানুষের জীবনে চারি দিক দিয়া এত পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না ; দুলারমনের সাজসজ্জা প্রায় সমস্তই বাঙালী ধরণের—মাথায় বাঙালী ধরণের সাদাসিদে খোঁপা, হাতে একটা করিয়া মৈথিল প্যাটার্ণের হালকা রূপার জশম আর দুই গাছি করিয়া গালার 'লহ্‌টি' বাদে গহনা সমস্তই বাঙালী ; বাঙালী শাড়ি, পরাও বাঙালী ধরণেই, শুধু সামনেটা এদেশী প্রথায় একটু কুঞ্চিত। এদিকে রূপ যেন ধরিতেছে না। বয়স হইয়াছে—প্রায় গিরিবালারই বয়সী তো ?—কিন্তু সেই রং যেন আরও চতুর্গুণ উজ্জ্বল হইয়াছে। একটু মোটা হইয়াছেন, তাহাতে ছেলেবেলার সেই ক্ষীণাঙ্গী দুলারমনের চঞ্চলতাটা যেন ঢাকা পড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু বয়স হিসাবে মানাইয়াছে ভালো।...সর্বোপরি বেশ বোঝা যায় দুলারমন সুখে আছেন, আদরে আছেন, যত্নে আছেন ; গহনা-পরিচ্ছদ বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু ওরই মধ্যে দামি, শরীরের বর্ধিত শ্রীও এর সাক্ষ্য দেয়। মেয়েটি দুলারমনেরই কন্যা মনে হইল ; সায়েবদের মেয়ের মতো গায়ে ফ্রক, মাথার দুই দিকে দুইটি বেণী দুলিতেছে ; আগায় রাঙা ফিতের বো ; আজকাল বাঙালী এবং অবস্থাপন্ন বেহারীর ঘরের ছোট মেয়েরা যেমন সাজিয়া থাকে।

ঐটুকু আসিতে আসিতেই গিরিবালা সব দেখিয়া লইলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য ঠেকিল দুলারমনের বাংলা কথা ; একটু জড়তা নাই, একটু মৈথিল টান নাই। অন্য কোথাও হইলে কেহ পরিচয় দিয়া দিলেও শুধু বাংলা কথার জন্য বিশ্বাস করা শক্ত হইত যে দুলারমন।

মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দুলারমন প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে পারলে চিনতে দুলহীন ? আমি ভেবেছিলাম...."

গিরিবালার বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নাই, বলিলেন—"চিনতে তো পারলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না ; আপনার...."

দুলারমন হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—"আর 'আপনার' থাক্‌, পাতুলের সম্বন্ধটা আর বাড়াবার দরকার নেই, না হয় বয়সই বেড়েছে। আমিও সেই জন্যে

'তুলহীন' বলেই ডাকলাম, আর ডাকবও, তা তুমি যতই গিন্নি-বান্নি হও না কেন।"

হাসিয়া শরীরের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন—"আর, হয়েছও দেখতে পাচ্ছি।"

—আর একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালার জড়তা কাটে নাই ভালো ভাবে, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"এক ভাবে কি থাকা যায় ?"

তুলারমন কি একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"গেলে কিন্তু মন্দ হোত না ; ভেবে দেখো না, পাণ্ডুলের সেই দিনগুলো যদি ধরে রাখা যেত···থাক্····এই দিন পাঁচেক হোল তোমার নন্দাই এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, আর সেই থেকে আমি যে কী ছটফট করছি !"

গিরিবালার দৃষ্টি আরও জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল।

তুলারমন চোখ তুইটা বড় করিয়া বলিলেন—"ও মা, তুমি বুঝি কিছুই জানো না ?"

মেয়েটির দিকে চাহিয়া মৈথিলীতে বলিলেন—"তুই ঠাকুর দেখগে যা রামকিশোরী, আমি ডেকে নোব।"

মেয়েটি চলিয়া গেলে বলিলেন—"কিছুই জানো না বুঝি তুমি—হারাধন যে আবার পাওয়া গেছে।"

গিরিবালা বলিলেন—"তা যেন অনেকটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করে ?"

"হাল ছেড়ে দিয়ে।"—বলিয়া তুলারমন চাপাগলায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"জান তো ?—যতক্ষণ হা-হুতাশ করবে, ততক্ষণ ওঁরা ধরা দেবার পাত্র নয়। শেষে বিরক্ত হয়ে যেই মনে মনে বললাম—"তুত্তোর আর ভাববুই না, অমনি····"

পাণ্ডুলের সেই রহস্য-কৌতুকমণ্ডিত দিনগুলি ফিরাইয়া আনিতেছিলেন তুলারমন। নিজের অজ্ঞাতসারেই গিরিবালার মুখে একটি হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, ওঁর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। তুলারমন একটু থামিয়া বলিলেন—"তুলহীনের বিশ্বাস হচ্ছে না ; হ্যাঁ গো, ভাবনার পাটই দিচ্ছিলাম উঠিয়ে····"

স্বরটা একটু মলিন হইয়া গেল, গিরিবালার মুখেও একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল, কিন্তু সেটা স্পষ্ট হইবার পূর্বেই, বা তাঁহার উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা বাহির হইবার পূর্বেই, তুলারমন কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—"ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে

বাবুর খবর এসে হাজির। ঠাকুরমা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন, আমি তখন মধুবাণীতে তো ?—এক দিন হঠাৎ শ্বশুরের নামে একখানি বড় রেজেষ্টারি খাম এল,—একখানি গেজেট, তাতে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া....”

দুলারমন হঠাৎ থামিয়া গেলেন, বোধ হয় নিজের মুখে নিজের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলা আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, নিজের ভাব ও ভঙ্গী দুই-ই বদলাইয়া বলিয়া উঠিলেন—“না, এবার তুমি আন্দাজ করো দুলহীন, দেখি তোমার সেই হেঁয়ালি ধরবার ক্ষমতাটা আছে কি হারিয়েছে।”

গিরিবালার সহজ ভাবটি ফিরিয়া আসিয়াছে, হাসিয়া বলিলেন—“না তুমিই বলো ; জীবনে অনেকে যেমন হারাধন পান, তেমনি অনেকে আবার পাওয়া-ধন হারায় তো ? আমি হারিয়েছি সে ক্ষমতাটা।”

দুলারমন হাসি মুখেই একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গিরিবালার পানে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—“হুঁ,—কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধিটুকু তো হারাওনি দুলহীন !”

দু’জনেই হাসিয়া উঠিলেন। দুলারমন একটু চুপ করিয়া রহিলেন। প্রিয় সঙ্গিনীর কাছে সংবাদটি দিতে আনন্দে, গরবে, লজ্জায় তাঁহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া প্রকাশ করিবেন সেই লইয়া যেন অস্বস্তিতে পড়িয়া গেছেন, তাহার পর হাত দুইটা পিঠের দিকে করিয়া, ঠাকুরঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়া কতকটা অবহেলার সহিত বলিয়া উঠিলেন—“এমন কিছু নয়,—গেজেটে লাল পেন্সিলে নিজের নামের নীচে দাগ দেওয়া—সাব ডেপুটির পদ পেয়েছেন।”

গিরিবালা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—“সাব ডেপুটি !—সে তো বড় চাকরি ভাই !”

দুলারমনের মুখটা আরও রাঙা হইয়া উঠিল, যেন এদিক্‌কার পাটটা চুকাইয়া দিবার জন্যই বলিলেন—“তেমন আর কি ?—তবে হ্যাঁ, আমাদের নাগালের তো বাইরেই বলতে হবে? ওর মধ্যে ডেপুটি পদটা যা একটু....তা এতদিন পরে সেই পদে এখানে বদলি হয়ে এলেন।

দু’জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। গিরিবালা দুইটি ছবি মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছেন--সেই দুঃখিনী দুলারমন—কথা কহিতে, হাসিতে বুকে টান ধরিতেছে, মুখটা নীল হইয়া উঠিতেছে ; আর এই সুখৈশ্বর্যময়ী !....একটি প্রীতির রসে ওর মন সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, কিছু একটা বলা দরকার এই সময়, দুই দিকেই এই চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তিটা কাটে তাহা হইলে, কিন্তু মনের আনন্দটিকে প্রকাশ করে এমন কথা যোগাইতেছে না। এ সব অবস্থা

কাটাইয়া উঠিতে দুলারমনই যোগ্য বেশি, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—বাঃ আসল কথাই তো জিগ্যেস করলে না দুলহীন—আমি এমন বাংলা শিখলাম কোথায়!"

যেন নিজেরই তাঁহার আশ্চর্য হইবার কথা, এই ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"হ্যাঁ, আমিও তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।"

"মধুবাণী থেকে একেবারে যে চাঁইবাসায় টেনে তুললে গো! চাকরিটা সেইখানেই আরম্ভ হোলো কি না। তার পর এই প্রায় পনের বছর তো সেই দিকেই কাটল—কোথায় ধানবাদ, কোথায় রঘুনাথপুর, কোথায় পুরুলে—সব তো বাংলা দেশই? তোমার নন্দাই আমায় বলেন—"ঠিক হয়েছে, যেমন বাঙালী-বাঙালী করতে...."

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"তা লাগল কেমন?"

দুলারমন কি ভাবিয়া চোখ দুইটা একটু ঘুরাইয়া লইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তোমার এখানে কি রকম লাগছে?"

সেই কথার মারপ্যাঁচ!....গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"মন্দ কি?—এখানে তো বাঙালীও অনেক, অভাবটা বোঝা যায় না।"

দুলারমন বলিলেন—"ওদিকেও কয়েক জায়গায় বেশ কিছু-কিছু মৈথিল আছে, তবে তোমার নন্দাইয়ের কথা বলতে গেলে সব জাত খুইয়ে বাঙালী হয়ে গেছে।"

বাঙালীকে ছোট করিয়া দেওয়ায় দুলারমন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালাও যোগ দিলেন, বিপিনবিহারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"তোমার ভাইয়ের কাছে বলতে বোল না, সাহস থাকে তো বাঙালী-মৈথিলের বোঝাপড়াটা ভালো করে হয়ে যাবে'খন।"

"ও মা, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর নাগাড়ে বাংলায় কাটিয়ে নিজেরই তার জাত আছে না কি?"

বর্ধিত হাসির মধ্যেই গিরিবালা অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"তুমি বুঝি আমাদের ছোট করছ ভাই?"

"আমারই জাত আছে না কি?"—বলিয়া দুলারমন আবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশে-পাশে লোকের জন্য হাসিটা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় দু'জনেরই শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া দুলারমন বলিলেন—"গেরো।.... হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল? হ্যাঁ, আমার তো বেশ ভালোই লাগত ভাই, বেশ মানুষ সব। মানুষ যে ভালো তার নমুনা তো আগেই পেয়েছিলাম পাণ্ডুরো।"

মুখটা একটু আড় করিয়া লইয়া প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গিরিবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রশংসার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই গিরিবালা বলিলেন—"তা তো হোল; কিন্তু চাকরিটা হোল কি করে বললে না তো; বেশ খোঁটার জোর না থাকলে তো হয় না এসব চাকরি।"

দুলারমন আবার যেন একটু ফাঁপরে পড়িলেন। ঘরছাড়া, নিঃসহায় একটি যুবক নিজের অন্তরের প্রেরণায় সামাজিক কুসংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া শুধু নিজের উদ্যম আর অধ্যবসায়ের জোরে কি করিয়া জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল,—কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত হীনতা, কত নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়া এই বিজয় অভিযান—সে ইতিহাস তো শোনাইবারই মতো, বিশেষ করিয়া নিজের মনের মানুষকে; কিন্তু বড় লজ্জা করে। দুলারমন চুপ করিয়া একটু যেন ভাবিলেন, তাহার পর মুখটা তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে হবে'খন আর এক দিন, দুলারমন খালি বকে যাক, আর উনি শুনে যান, বা রে, কী চালাক?....এবার তোমাদের খবর বলো,—বিপিন ভাইয়া কেমন আছেন, কি ছেলেপুলে...."

"উনি ভালোই আছেন। ছেলেপুলে...."

—বলিয়া গিরিবালা আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দুলারমনের প্রথম জীবনের কথা, একটু কুণ্ঠিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, আগে তোমার কি ছেলেপুলে বলো, অন্য কথা না হয় পরেই শুনব। ঐ তো একটি মেয়ে...."

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটি বুঝিলেন দুলারমন; এমনি কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ ভাবেই জবাব দিতেন, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পারিলেন না; সেই পুরাণো দিনের কথা সব মনে পড়িয়া গেল,—সেই দুঃখে, তাপে, গঞ্জনায়, অত্যাচারে না-পাইতেই হারাণোর কথা,—মুখটা যেন কি-রকম হইয়া গেল, গিরিবালার মুখের পানে যেন চাহিতে পারিতেছেন না; শেষে চোখ দুইটি পর্যন্ত ছল-ছল করিয়া উঠিল, ধরা গলায় বলিলেন—"দুলহীন, ছেলেরা বড্ড অভিমানী হয় যে,—একবার এসে আদরের ঘটা দেখে আর...."

মুখটা ঘুরাইয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইলেন।

গিরিবালা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"চুপ করো ভাই, আমারই ভুল হয়ে গেছে...."

মুস্কিল হইল এর পরেই নিজের সন্তানের প্রসঙ্গটা তোলা,—ভগবানের অসীম দয়া আর যাই হোক, অন্ততঃ এদিক দিয়া তাঁহাকে যে সমৃদ্ধই করিয়াছেন। অস্বস্তিতে পড়িয়া একটু চুপ করিয়াই থাকিতে হইল, তাহার পর

সামলাইয়া লইলেন দুলারমনই। নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছেন, মুখটা ফিরাইয়া একটু হাসিয়াই বলিলেন—"এত বাজে কথাও মনে পড়ে যায়!....ঠিক কথা, তোমার বড় ছেলের তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা দুলহীন? শশাঙ্ক নাম ছিল না?"

গিরিবালা যেন বাঁচিলেন, বলিলেন—"হয়ে গেছে বিয়ে তার।"

দুলারমনের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—"সত্যি! বৌকে এনেছ না কি থিয়েটার দেখতে, না, আপনি নাপিয়ে এসেছ?"

"না, এসেছেন বৈ কি, দেখবেখন, সেজ বৌমাও এসেছেন।"

"সেজ?...দাঁড়াও, হরেন নাম ছিল তো? দেখো, আমার ঠিক মনে আছে, একটু দুরন্ত ছিল বেশি...."

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আজকাল ঠাণ্ডা হয়েছে।"

"শোন কথা দুলহীনের! চিরকালটাই না কি এক ভাবে থাকে গা? যে যত দুষ্টু সে আবার তত ঠাণ্ডা হয় পরের কালে....আর মেজ বৌমা? মেজ ছেলের নাম শৈলেন ছিল না? একটু যেন..."

গিরিবালার মুখের পানে চাহিয়া দুলারমনের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; মুখটা তাঁহার একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া গেছে। একেবারে চরমতম আশঙ্কার সহিত যেন সম্মোহিত ভাবেই দুলারমন মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিরিবালা বলিলেন—"মেজটি বিয়ে করতে চাইলেন না তখন ভাই, সে দুঃখের কথা আর বোল না।"

দুলারমন রুদ্ধশ্বাসটা ধীরে ধীরে মোচন করিয়া দিলেন। ভয়টা একেবারে উগ্রতম হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনটা তাঁহার এত হালকা হইয়া উঠিল যে, এই নৈরাশ্যটুকু গায়েই মাখিলেন না; হাসিয়াই বলিলেন—চাইলে না তো?—আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি, মেজ ছেলে যে!—ভোগাবে। আমি অনেক মিলিয়ে দেখেছি যে; তোমাদের নন্দাইও বাপ-মায়ের মেজ ছেলে....নাকের জলে চোখের জলে করবে...."

হাসিয়া আঙুল নাড়িয়া দৈবজ্ঞের মতো বলার ভঙ্গীতে গিরিবালাও হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কিন্তু এই এখন আবার রাজি হয়েছে, সেজ ছেলের ন' ছেলের হয়ে গেল বিয়ে, পরেরটির কথাবার্তা চলছে, এত দিন পরে এখন বলছে...."

দুলারমন একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ঠিক হয়েছে, ঐ ওষুধ ওদের। একেবারে গা ক'রো না। ইস্, ব্যাটারা আমার সব

ভীষ্মদেব হবেন, সংসার আর থেকে কাজ নেই !...এবার ধমকে বলবে—'যা বিয়ে করবি তো নিজের বৌ দেখে নিগে যা, আমরা আর ও-সবের মধ্যে নেই ; দেখো না, কি রকম কেঁচোটি হয়ে—"

মুখে আঁচল দিয়া দু'জনে দুলিয়া-দুলিয়া হাসিতেছেন, ননীবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত গম্ভীর ভাবে চাহিয়া বলিলেন—"ও মা, আর আমি ওদিকে জায়গা রাখবার জন্যে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি !"

গিরিবালা হাসিতে হাসিতেই দুলারমনকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"আর আমাদেরও তো এখানে ঝগড়ার কথাই হচ্ছিল, না ভাই ?"

দুলারমন ননীবালার গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, এবার গুটি-গুটি চলো, নৈলে কি হয় বলা যায় না ; ঝগড়ারই হাওয়া উঠেছে এখানে,—ইনিও যে শান্তির জল ছিটোতে এসেছেন এমন মনে হয় না ।"

আর একটা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া তিন জনে প্রেক্ষাগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন ।

৪

মনে হইল জীবন যেন পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হইয়া আসিতেছে। দুলারমনকে এতদিন পরে ফিরিয়া পাওয়া তাও আবার এই রকম অদ্ভুত পরিবর্তনের মধ্যে—সবটুকু মিলিয়া গিরিবালাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। দুলারমনের এই সুখ—এও যেন তাঁহার সুখেরই পূর্ণতা ঃ কোথায় একটু খালি ছিল, ভগবান যেন সেইটুকু পূরাইয়া দিলেন। এই রকমই তো হয় মনে ; শুধু নিজের সংসারটুকু লইয়াই তো জীবন নয় ; সুখের দিনে মনে হয় যাহাকে যাহাকে জীবনে ভালবাসিয়াছি, সবাইকেই সুখী দেখি। ঠিক এই সময়টিতে আনন্দকে গ্রহণ করিবার জন্য গিরিবালার মনটা প্রস্তুতও ছিল বেশি করিয়া, —মেজ ছেলে এত দিন পরে বলিয়াছে বিবাহ করিবে, বহু দিনের একটা ভার নামিয়া গিয়া মনটা হাল্‌কাও ছিল ; দুলারমনঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

দেরি করিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু ঘুমটা ভোরেই ভাঙিয়া গেল। বাড়িতে কিছু একটা উৎসব থাকিলে, কিম্বা কিছু একটা নূতন জিনিষ পাইলে যেমন একটা প্রসন্ন চাঞ্চল্যে শিশুদের মনটা ভরিয়া থাকে—ঘুমাইতে দেয় না, কতকটা

সেইরূপ। আকাশে টুকরা টুকরা মেঘ, সূর্যোদয় হইবে, হাল্কা গাঢ় কত রকম রঙের পূর্বাভাস লাগিয়াছে, আর সবগুলাই ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। পূর্বদিকের জানালার কাছটিতে গিরিবালা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ প্রত্যেকটি জিনিষই লাগিতেছে মিষ্ট, অতি সামান্য ঘটনাটুকুও জীবনের মধু নিংড়াইয়া দিতেছে।....কখন্ এক সময় মনটা দিনের প্রভাত থেকে জীবনের প্রভাতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই খেলাঘরের দিনগুলি—এক একটা ছবি এখনও বেশ স্পষ্ট—কামিনীতলায় ভাঙা পুতুল লইয়া খেলা, মা ভাত খাইবার জন্য তাগাদা দিতেছেন রান্নাঘর থেকে।.... আজ গিরিবালার নাতি-নাতনীরা জীবনের ঐ পর্যায়ে ; বড় আশ্চর্য লাগে।.... তাহার পর বিবাহ,—সাঁতরা, পাণ্ডুল আর দ্বারভাঙ্গারও প্রথম জীবন। কত বৈচিত্রের মধ্যে দিয়া জীবনের গতি। তাহার মধ্যে পাণ্ডুল আর দ্বারভাঙ্গার নিদারুণ দুঃখের দিনগুলাও আছে। কিন্তু কৈ, তবুও তো জীবনকে মন্দ লাগে না। দুঃখও জীবনকে দেয় পূর্ণতা,—ছেলেদের মধ্যে কে যেন সেদিন কথাটা বলিল। সত্যই তো, অসুখ লুকাইবার জন্য গিরিবালা সুস্থতার ভান করিলেন, স্বামী প্রবঞ্চিত হইলেন, কিন্তু শশাঙ্ক তো ঠিক ধরিয়া ফেলিল, মাকে বাঁচাইবার জন্য জীবনের সব উচ্চাশা ছাড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিল। দুঃখের এ-দান গিরিবালা কি কখনও ভুলিতে পারিবেন ? মা হওয়ার এই গৌরবটুকু পাওয়ার জন্য সে জন্ম জন্ম ধরিয়া দুঃখের সাধনা করা চলে।

প্রভাত আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ শুধু আলোর খেলা ছিল, একটু একটু করিয়া শব্দও জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার পর নূতন জাগিয়া-ওঠা মানুষের কণ্ঠ—গিরিবালার ছোট নাতিটির গলাও শোনা যাইতেছে—সেজ বধূ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলেন—"সেই রাত তিনটে থেকে উঠে সমস্ত বিছানাটায় দৌরাত্মি করে বেড়ায় মা, একটুও যদি চোখ বুজতে দেয় !...."

আপনি আপনি গিরিবালার মুখে একটি স্মিত হাস্য ফুটিয়া উঠিল,—ওদের সবই তো এমনি করিয়া হয় দিয়া দিতে,—আপনার বলিয়া কিছু কি রাখিতে দেয় ওরা ? তবু যে ওদের চাই-ই। দুলারমনের আপশোষ তো এত পাইয়াও গেল না,—অভাব শুধু এইটুকুরই তো ?

রাস্তার ওধারে আম গাছটির পিছনে ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল। শাখা-পল্লব-কিশলয়-মুকুলে সমস্ত গাছটিকে মনে হইতেছে যেন একখানি সংসার, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে কোথায় একটি বেশ মিল আছে ; এই নূতন সূর্যের আলো আসিয়া পড়িল, ওটুকু যেন কেমন করিয়া কোথা দিয়া

তাঁহাদের সংসারেও আসিয়া পড়িয়াছে।…বোধ হয় কবি-পিতার উত্তরাধিকারেই খুব দুঃখ কিম্বা খুব সুখের সময় এই রকম গোছের এক একটা অস্পষ্ট অনুভূতি গিরিবালার মনে আসিয়া পড়ে, অনুরূপ শিক্ষার অভাবেই সেটাকে রূপ দিতে পারেন না, স্থিরদৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া থাকেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া গিরিবালার ভিতরটা যেন হাসিতে উচ্ছল হইয়া উঠিল,—দুলারমন বেশ বলিয়াছে—"একেবারে গা কোর না দুলহীন, এবার ধমকে বলবে—বিয়ে করতে হয় তো যা নিজের বৌ খুঁজে নিগে যা, আমরা আর ও সবের মধ্যে নেই…."

আনন্দকেই একটু কৌতুক-রসে মিশাইয়া লইলে যেন আরও মজে, মনটা ক্রমাগতই দুলারমনের কথা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল, আর ততই বুকে হাসি যেন গুর-গুর করিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ যখন সুনিশ্চিত, একবার যদি বলা যাইত শৈলেনকে এ-কথাগুলা!…নিজের দ্বারা হইবে না অবশ্য, মায়ের মুখে শুনিলে কি হইতে কি হয়, ঐ তো ছেলে। তবে বলিবার লোক আছে—ননীবালা,—সে আরও একটু অম্লরস মিশাইয়া কথাটিকে এমন সরস করিয়া তুলিবে যে বিয়ের বাড়িতে একটা উপভোগ্য জিনিষ হইয়া থাকিবে।….তাহার পর গিরিবালার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দুলারমনের কথা, —ঠিক তো, সে তো আসিবেই, তাহাকেই দুষ্টামি করিয়া টিপিয়া দিন না— বলিবার অমন লোক তো আর পাওয়া যাইবে না।…কৌতুকরসে গিরিবালার মনটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; একটি দৃশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—দুলারমন আসিয়াছে—শৈলেনকে ডাকিয়া গিরিবালা দুলারমনকে পরিচিত করিয়া দিলেন —প্রণাম করিয়া শৈলেন সামনেই একটু জবুথবু হইয়া দাঁড়াইতেই—যেমন সে দাঁড়ায়—দুলারমন আশীর্বাদের পর অল্প হাসি মুখে লইয়া বলিতেছে—উঃ!— এই শৈলেন? সেই এতটুকু দেখেছিলাম পাণ্ডুলে।….শুনলাম তোমার সব ভালো, কিন্তু এ-দুর্মতি কোথা থেকে সেঁধুল মাথায়,—বিয়ে করব না?…আমি বাবা খুব রাগ করেছি—তোমার মাকে বলছিলাম—থাক্, তোমরা আর এর মধ্যে থাকতে যেও না, বেটা আমার সায়েবের জামাই, নিজের ক'নে নিজেই বেছে নিক গে।"

—সঙ্গে সঙ্গে কথার সব গুরুত্ব ছিন্নভিন্ন করিয়া পাণ্ডুলের সেই হাসি….

বড় মেয়ে খুকি আসিয়া একটু যেন কিরকম ভাবে প্রশ্ন করিল—"মা, মেজ দাদার আজ সকালের ট্রেনে কোথাও যাবার কথা ছিল না কি ?"

গিরিবালার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"কৈ না···মানে, জানি না তো।"

এর পরেই একটু চুপ করিয়া গেলেন, অর্থাৎ কন্যা কেন এ প্রশ্ন করিল এটা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে না। বুকের ধুকধুকুনিটা হঠাৎ অতিরিক্ত বাড়িয়া গেছে। একটু থামিয়া কণ্ঠস্বর আরও নিশ্চিন্ত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন রে ? ও কথা জিগ্যেস করলি যে ?"

কন্যা বলিল—"না, খুব ভোরে—অল্প অন্ধকার রয়েছে তখনও—একবার উঠেছিলাম—মনে হোল মেজ দাদার মতন ঐ মোড় ঘুরে স্টেশনের রাস্তা ধরে কে যেন চলে গেল—একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে যেন দেখলেও। মেজ দাদা তো বেড়ানও না সকালে, তাও আবার অত সকালে···"

গিরিবালার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে, প্রতিটি কথার সঙ্গে বুকের ধুকধুকুনি যাইতেছে বাড়িয়া—শব্দটা যেন বাহির হইতে শোনা যায়। তবু প্রাণপণে সহজ ভাবটা ধরিয়া আছেন ; তবে মুখে প্রশ্ন আর জোগাইতেছে না। কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—"কাউকে বলব—বাইরের ঘরটা একবার দেখতে ?"

গিরিবালা হঠাৎ একটু ধমকের সুরেই বলিলেন—"কেন ?"

তাহার পরই আবার খুব সহজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কে না কে যাচ্ছিল। রাস্তা দিয়ে লোক চলবে না ?···তুই যা, খোকা উঠেছে মনে হচ্ছে।"

কন্যা চলিয়া গেল।

গিরিবালা যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিরটা যেমন অচপল, ভিতরটা তেমনি আছাড়ি পাছাড়ি খাইতেছে ঃ শৈলেন চলিয়া গেছে বাড়ি ছাড়িয়া, নিশ্চয়—অতি নিশ্চয় একেবারে—জননীর অন্তর দিয়া গিরিবালা জানেন ওর ভিতরে একটা বিক্ষোভ আছে ; একটা দুরন্ত ঘূর্ণি, যা ওকে কখনই স্থিতু হইতে দিবে না, ঘর বাঁধিতে দিবে না—সমস্ত আশার পাশে পাশে এ নিত্য আশঙ্কা।···· শৈলেন গেছেই বাড়ি ছাড়িয়া, এতটুকু সন্দেহ নাই গিরিবালার—তবু মায়ের প্রাণ, একেবারে নির্ভুল প্রমাণের সামনা সামনি হইতে পারিতেছে না।···· সেই প্রভাত আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু একেবারে মলিন। কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের ভয় জাগিতেছে মনে—যে প্রমাণগুলাকে, অর্থাৎ নিশ্চিতের

যে-রূপকে গিরিবালা এড়াইতে চাহিতেছেন, একটু পরেই সবাই জাগিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।....যে-দিনটাকে এই কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত এত আশ্চর্য রকম মিষ্ট বোধ হইতেছিল, সেটা আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন রকমে পরিত্রাণ নাই এর হাত থেকে? বাড়ির প্রত্যেক মানুষটিকে, এতটুকু ছেলেকে পর্যন্ত ভয় হইতেছে—কে কখন আসিয়া কি ভাবে খবরটা দিবে; আর অবিশ্বাস করিবার, আর সহজ অবহেলার কণ্ঠে উত্তর দিবার কোন উপায়ই থাকিবে না।

গিরিবালা জানালাটির সামনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সংসারটা চারি দিক্ দিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল—কর্মে-কলরবে। শৈলেন দেরি করিয়া ওঠে, এদিকে খুকি নিজের শিশুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সংবাদটা আর এক চোট চাপা রহিল কিছুক্ষণ ধরিয়া। তাহার পর বাহিরে হঠাৎ নূতন করিয়া যেন চাঞ্চল্য উঠিল—কতকগুলা উৎসুক প্রশ্ন, কতকগুলা এলো-মেলো উত্তর—সবগুলাতেই একটা ভয়ের, উৎকণ্ঠার ছাপ। এক সময় ছোট ছেলে খোকা আসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া খবর দিল—"মা, মেজদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন!"

—ছেলেমানুষ, যতটা কল্পনায় আসে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানানসই করিয়াই দিল খবরটা, নিজেদের বাড়ির এত বড় একটা সংবাদ।

গিরিবালা ঘাড় ফিরাইয়া সহজ অবিশ্বাসের গলায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার আগেই স্বয়ং বিপিনবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; গম্ভীর, অনাসক্ত; হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট, গিরিবালার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন—"নাও, বিয়ে—বিয়ে, এই পড়ো ছেলের চিঠি।"

গিরিবালা প্রাণপণে সত্যটাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—শেষ পর্যন্ত;—"কে?—কি চিঠি?...কার কথা?"

হাতে চিরকুটটা লইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সেটার পানে চাহিয়া রহিলেন, অক্ষরগুলায় যেন চোখ বসিতেছে না, তাহার পর এক সময় পড়িলেন। লেখা আছে—"চাকরিটি ছাড়িয়াই যাইতেছি, অতটা অন্যায় সহ্য হইল না। বিবাহের কথাটাও থাক, অযথা সমস্যা বাড়াইয়া ফল কি? চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবু কিন্তু তোমাদের কষ্টের কারণ হইয়াও থাকিতে হইল। এই আমার অদৃষ্ট, কি করি?"

গিরিবালা স্বামীর মুখের প্পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ভাবনা গিয়া আশঙ্কায় দাঁড়াইয়াছে, কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করিবেন তিনি?—অন্য কথা বাদ দিলেও, বিবাহের কথাবার্তা যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেছে,

নিরাশা, লজ্জা, অপরের কাছে সম্ভ্রমহানি, ছেলের অভিশপ্ত জীবনের উপর পিতারও অভিশাপ আসিয়া পড়িবে না তো? যে ভাবে—যে অসহ্য অবস্থার মধ্যে অসীম সহিষ্ণুতায় এদের সবাইকে মানুষ করা, এতটা অকৃতজ্ঞতা কি সহ্য করিতে পারিবেন তিনি?···মায়ের কথা আলাদা, মায়ের সবই সয়।

গিরিবালার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এক সময় বলিলেন—"ছেলেমানুষ না বুঝে···"

বিপিনবিহারীর মুখের একটি রেখারও কোথাও পরিবর্তন নাই; বলিলেন—"সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে।"

গিরিবালা আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, অসহায় ভাবে একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া একটা মস্ত বড় যুক্তির কথা মনে পড়িয়া গেছে এই ভাবে বলিলেন—"সাতাশ হলেই কি বুদ্ধি হয়? বেটাছেলে···"

অদ্ভুত যুক্তিতে বিপিনবিহারীর ওষ্ঠাধর অল্প একটু কুঞ্চিত হইল, বলিলেন—"বাইশ বছরে আমি একটা পূরো সংসার ঘাড়ে করেছিলাম।"

গিরিবালা এবার ভীত হইয়া পড়িলেন। বেশ খানিকক্ষণই ওঁর মুখে কোন কথাই জোগাইল না; একটা অনিশ্চিত ভয়ে একবার স্বামীর মুখের পানে, একবার নিচে, একবার এদিকে, একবার ওদিকে চাহিলেন। তাহার পর হঠাৎ একটা বিসদৃশ কথা বলিয়া বসিলেন—"ত্যজ্যপুত্র করবে না তো? না, করো না।"

তর্কে কুলাইল না, এবার ভিক্ষা। সৃষ্টির আদি থেকে সন্তান লইয়া পিতা বিচারক মাতা করুণার ভিখারিণী। গিরিবালার দৃষ্টিতে ভয়, ব্যাকুলতা, মিনতি সব একসঙ্গে আসিয়া জমা হইয়াছে।

বিপিনবিহারী এবার বেশ স্পষ্ট ভাবেই হাসিলেন, বলিলেন—"বেশ বলেছ, সমস্ত জীবন ধরে মস্ত বড় সম্পত্তি গড়েছি—ত্যজ্যপুত্র করে তাই থেকে ওকে বঞ্চিত করব!"

একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"অনেক আশা করে ভেবেছিলাম—এরাই আমার এক-একটা সম্পত্তি; সে ভুলটা ভাঙল—"

গিরিবালা যেন প্রাণপণে একটা ভাঙনই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এই ভাবে গভীর মিনতির কণ্ঠে বলিলেন—"আবার ফিরে আসবে। একটা খেয়ালের মাথায় গেছে চলে—ছেলেমানুষ···"

বিপিনবিহারী একথার উপর মন্তব্য করিলেন না, নিজের কথার জের ধরিয়াই কহিলেন—"ভুল মানুষের যত শীগ্‌গির ভাঙে ততই মঙ্গল।"

আর কিছু না বলিয়া, কোন উত্তর না লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

৫

দীর্ঘ একটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এমন কিছু অনুর্বর বৎসরও নয় ; সেজ ছেলে দূর বিদেশে কাজ লইয়াছিল, ছাড়িয়া-ছুড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিয়াছে। স্বাধীন ভাবে কাজ করিতেছে, উন্নতিও হইতেছে। একটি ছেলে সরকারি চাকরিতে পাকা হইল, একটি ছেলের ভালো চাকরি হইল। এক বৎসরের ফসল হিসাবে মন্দ কি ?

কিন্তু সুখের চেয়ে দুঃখই গভীরতর রেখাপাত করে। শৈলেনের অনুপস্থিতির কথাটাই মনে যেন সব চেয়ে বড় হইয়া থাকে অষ্টপ্রহর, বরং যখন একটা আনন্দের কথা হয়, মনের আলোটা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে—এই বিষাদের কৃষ্ণ রেখাটি হইয়া ওঠে সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট।

একটা বৎসর শৈলেনের দেখা নাই, চিঠি নাই। বিপিনবিহারীর মনটা যেন দিন-দিন সংসার থেকে উঠিয়া যাইতেছে ; ঠিক গায়ে মাখিয়া সংসারী হইয়া থাকাটা উঁহার আর ছিলই না এদিকে, কিন্তু সেটা ছিল অন্য ধরণের ব্যাপার, কৃতজ্ঞ প্রসন্নতায় ধীরে ধীরে নিজেকে আলাদা করিয়া লইয়া এই সমস্ত দানের যিনি দাতা তাঁহার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ছেলে-বৌয়েরা অনুযোগ করিলে হাসিয়া বলিতেন—"আমি এখন ভগবানের পেনশন ভোগ করছি ; সামান্য যে গবর্ণমেণ্ট সে-ও এ অবস্থায় খাটতে দেয় না, আর আমি তাঁর দয়ার অমর্যাদা করব ? এখন আমার কাজ মাঝে-মাঝে দাতার দরবারে গিয়ে সেলাম ঠোকা। নৈলে আবার পেনসন বাতিল হবার ভয় আছে তো ?"

এখন অন্য রকম ভাব ঃ সে তৃপ্ত ঔদাসীন্য নয়, নৈরাশ্যের বৈরাগ্য,—একটা অবিশ্বাস, একটা সুগভীর বিশ্বাস যে এত যত্ন করিয়া গড়া সবই এক মুহূর্তে নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে, যতক্ষণ আছে, যেখানে যে ভাবে আছে, থাক্, বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিবার দরকার নাই ; অনেক আশা করিয়া জড়াইতে গেলেই ফাঁকি,—দেখা যাইবে হাতটা শূন্যকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু পুরুষকে যা সংসার থেকে আলাদা করে—বৈরাগ্য আনিয়া, মেয়েদের সেইটাই সংসারে টানে, নিবিড়তর মমতায়। গিরিবালা যেন আরও বুক দিয়া পড়িয়াছেন। সুখেরই দিন, চারটি ভাই একসঙ্গে হইয়া রোজগার করিতেছে—কিন্তু বুক দিয়া যে সুখের মধুটুকু আহরণ করিতেছেন এমন নয়, শুধু একটা আকুলি-বিকুলি—সব বজায় থাক্,—কি করিয়া যে সব বজায় থাকিবে!—ঐ যে একটা অশান্তি, ওটা বাড়ির কোথাও স্থায়ী অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে না তো ?—মায়ের ব্যথা বুকে গোপন করিয়া শুধু খুঁজিয়া বেড়ানো মুখে হাসিটুকু

বজায় রাখিয়া।...হাসি যে সংসারের আলো,—নিজের মেদ জ্বালাইয়াও তাহাকে সজীব রাখিতে হইবে।

সংসারের বাইরেও এই আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। ছেলে নিরুদ্দেশ, চিঠি দেয় না, এর লজ্জা যে কত গভীর, যার লজ্জা সেই জানে। অথচ মানের বড়াই করিতে হয়, মা হওয়ার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা চাই তো? বাহিরের কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া প্রশ্ন করিলে গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"বাবার—মানে, ওর ঠাকুরদাদার ধাত পেয়েছে যে, এক জায়গায় পাকা হয়ে না বসে চিঠি দেবে? বাবার কথা হলেই কান পেতে শুনত—ছেলেবেলা থেকেই, তখন কি জানি পেটে-পেটে এই সব মতলব জমছে?"

—যেন নিতান্তই হাসিয়া তর্কটা উড়াইয়া দেবার জিনিষ, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি হাসি টানিয়া আনেন, যে-মা অসময়েও এত হাসিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করেন।

এদিকে যেখানে নিতান্তই একা সেখানে অবিরাম হাহাকার চলিতেছে—এত অকৃতজ্ঞ—চিঠি পর্যন্ত দিল না! এত অবহেলা।...

গিরিবালা জানালাটির ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই জানালার ধারে যেখানে গভীরতম দুঃখের দিনের প্রভাতটি আর সব দিনের চেয়ে মোহময় হইয়া বিকশিত হইয়াছিল। অন্ধকারই লন বাছিয়া—দুঃখে, অভিমানে চক্ষু সজল হইয়া ওঠে, তাড়াতাড়ি মুছিয়া চিন্তার গতি রুদ্ধ করেন—না, এতটুকু অভিমান করা চলিবে না, এতটুকু ক্ষোভ নয়। মায়ের অদৃষ্ট, প্রসন্ন মনে সহিয়া যাইতে হইবে, হ্যাঁ, প্রসন্ন মনেই; মুখের হাসি যেন মনের গভীরে পর্যন্ত প্রবেশ করে—মায়ের অভিমানে, মায়ের ক্ষোভে যে বিষ আছে—ছেলে প্রবাসে, আরও বেশি হাসি দিয়া সহিয়া যাইতে হইবে—এই অভিনয়ের জন্যই মাকে এত আলাদা করিয়া গড়িয়াছেন যে বিধাতা।

স্বামীর অভিমানেও ভয় হয়; নিজের অন্তর দিয়াই তো বোঝেন সেটা কত গভীর। চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে। এক দিন বেশ লঘু ভাবেই বলিয়াছিলেন—"তোমার যেন আবার একটু বাড়াবাড়ি ভাবনা, মেয়েছেলে হয়েও তো আমি কৈ অতটা করি না। স্পষ্ট দেখছি বাবার ধাত পেয়েছে। যেমন গেছে তেমনি হঠাৎ এক দিন...."

মাঝ-পথেই থামিয়া যাইতে হইয়াছিল; বিপিনবিহারী বেশ একটু আপত্তির সহিতই স্ত্রীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন—"আর যা করো, বাবার সঙ্গে তুলনা করো না, বাবা বীরের মতন সংসারে ঝাঁপিয়ে

পড়েছিলেন, কাপুরুষের মতন এড়িয়ে যাননি। স্নেহের জন্যে ছেলের মর্যাদা বাড়াতে চাও অন্য ভাবে বাড়াও, বাবার মর্যাদা ছোট করে নয়।"

ঠিক এক বৎসর নয় মাস পরে শৈলেন বাড়ি ফিরিল। হিসাবটা গিরিবালারই; অনেক দিন পরে এক দিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—"ঠিক এক বছর ন'মাস পরে তুই এলি, একটা দিন বেশি হয়েছিল।"

শৈলেন একটু অপ্রতিভ হইল, মাথাটা একটু নুইয়াও পড়িল, তবে সেই সঙ্গে একটু গর্ব যে না হইল, এমন নয়, দুঃখ দিয়াও এই যে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা জাগাইয়া রাখা মনে—সন্তানের এই যে অধিকার—এ গর্বের বৈ কি। তবুও অপ্রতিভ ভাবটা কাটাইবার জন্য হাসিয়া বলিল—"বাবাঃ, মা যেন পাঁজি হাতে করে বসে দিন গুণছিলেন—কবে ফিরবে, ভালো করে খোঁটা দোব!"

শৈলেনের জীবনের যে ব্যর্থতা, এ কাহিনীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অল্পই, অর্থাৎ ততটুকুই, গিরিবালার জীবনে তাহা যে পরিমাণে ব্যর্থতা সঞ্চার করিয়া রাখিল। কে জানে?—হয় তো মায়ের জীবনকে পূর্ণ ভাবে বিকশিত করিতে এটুকুর দরকার ছিল; এই যে নিবিড় বেদনার প্রতিদানে ক্ষমা—এই যে অভিশাপকে আশীর্বাদ—এ-অমৃত মায়ের হৃদয় মন্থন না করিয়া ভগবান আর কোথায় তুলিতে পারিতেন?

এক কথায় এই যুগের যা ট্র্যাজেডি, শৈলেনের জীবনেও এই ট্রাজেডি, অর্থাৎ প্রতি পদে জীবনকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অগ্রসর হওয়া বা হওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এত প্রশ্ন জীবন সহ্য করিতে পারে না। তাই যে করে প্রশ্ন তাহাকে দূরে ঠেলিয়াই রাখে। জীবন বলে—আলো-ছায়ায় আমার রূপের পূর্ণতা; আজই নয়, এই আমার যুগ-যুগের ইতিহাস; আমায় গ্রহণ করিবে তো সেই পূর্ণতায় গ্রহণ করো; পূর্ণ সাহসে; নয় তো আমাদের পথ আলাদা—নয় তো আদর্শের আলেয়ার পিছনে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দাও গিয়া।...শৈলেনের জীবনে এই ট্র্যাজেডি। এই প্রায় দুই বৎসরের কাহিনী সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই, শুধু শেষ দিনের কথাটুকু বলিলেই চলিবে।

আলেয়ার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সত্যই শৈলেন নিঃশেষিত হইয়া গেল। প্রথমটা চিঠি দিল না বিবাহ ভঙ্গ করিয়া আসিবার জন্যই, ঘুণাক্ষরেও সন্ধান পাইলে নিজের দিকের এঁরা, আবার ওদিক্ থেকে কন্যাপক্ষ আসিয়া কোন রকমে জোয়াল চাপাইয়াই দিবেন ঘাড়ে। অজ্ঞাত প্রবাসই চলুক। যত দিনে বিবাহের

বিপদটা কাটিল, তত দিনে এদিকে অপরাধের গ্লানিটা গেছে বাড়িয়া, তাহার সঙ্গে আসিয়াছে নৈরাশ্যের অবসাদ। পিতামহ মধুসূদনের আদর্শটা সামনে ছিল; আশা ছিল, মানুষের মতো হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার অপরাধটা পৌরুষে ক্ষালন করিয়া আবার সংসারে গিয়া দাঁড়াইবে। দুই বৎসরের ঘুরাঘুরিতে কিছুই হইল না। কেন বলা সহজ নহে;—হয় তো পিতামহের সে-যুগ নাই, হয় তো সে-সাহস নাই, হয় তো সে-অদৃষ্টই নয়। দু'-এক জায়গায় চাকুরি হইল, কিন্তু বড় আদর্শ ধরিয়া থাকার জন্য তাহার গ্লানিটাই যেন চোখের উপর উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। পৃষ্ঠভঙ্গ। অন্য ভাবেও জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিল—যেখানে গ্লানি নাই সেখানে নিজেরই অক্ষমতা আছে, সেটা স্বীকার না করিলেও পরিণামে তাই দাঁড়ায়। আবার পৃষ্ঠভঙ্গ। বেশ বোঝা যায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, মানুষের মতো মানুষ হওয়া দূরের কথা, মনুষ্যত্বের যাহা শেষ সম্বল—আশা আর একটু বিশ্বাসের রেশ—সেটুকুও বোধ হয় যায় মুছিয়া।...এক সময়ে মুছিয়া গেলও, শৈলেন সত্যই নিঃশেষিত হইয়া জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই দিনটির কথাই বলা যাক্।—গঙ্গার একটা পার-ঘাট। শৈলেন ট্রেনে করিয়া আসিয়া পৌঁছিল,—ওপারে গিয়া গাড়ি ধরিয়া একটা জায়গায় যাইবে। একটা নূতন আশা পাইয়াছে, তাহারই আলোক লক্ষ্য করিয়া যাত্রা। গাড়িটা বেলা চারিটার সময় পৌঁছাবার কথা, পৌঁছিল সাড়ে পাঁচটায়; নামিয়া শুনিল ষ্টিমার ছাড়িয়া দিয়াছে।

আজ-কাল অল্পেই মনের প্রসন্নতা নষ্ট হইয়া যায়, যেটুকু বা আছে। অল্পেই মনে হয় তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকেই একটা চক্রান্ত চলিয়াছে। শৈলেন প্ল্যাটফরমে একটা বেঞ্চে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। এর পরের ষ্টিমার রাত প্রায় আটটায়। উল্টা দিক থেকে একটা গাড়ি আসিল, খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল! শৈলেন অসাড় ভাবে চাহিয়া রহিল খানিক; এই আসা-যাওয়া, খোঁজা-পাওয়া, হাঁক-ডাক, ছুটাছুটি, মনে একটা স্পন্দন জাগায় অন্য সময়, আজ যেন কোন অর্থ গ্রহণই হইতেছে না। গাড়িটা চলিয়া গেল, স্টেশনটা আবার শান্ত হইল। গরম পড়িয়াছে, তায় আজ নাওয়া-খাওয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই, একটু হাওয়ার আশায় শৈলেন প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি, কয়েকটা বর্ষা হইয়া গেছে, গঙ্গা কোল ছাড়িয়া বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, গৈরিক জলস্রোতে কল্লোল জাগিয়াছে।

একটু-একটু হাওয়া আছে, কিন্তু দুইটা ট্রেনের লোক, অসহ্য ভিড়; অত মুক্ত হাওয়ার মধ্যেও যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। শুধু কি ভিড়?—অসম্ভব

নোংরামি। গ্লানিতে মনটা আরও তিক্ত হইয়া ওঠে, মনে হয় ঐ গাড়িটার আসা আর এই অপরিচ্ছন্ন জনরাশি ঢালিয়া দেওয়া, এ-ও সেই কূট চক্রান্তের মধ্যে। এ জায়গাটা ছাড়িয়া শৈলেন গঙ্গার তীর ধরিয়া স্রোতের উল্টা দিকে অগ্রসর হইল। ছোট ঝোঁপ-ঝাড়, ভুট্টা-জনেরার মধ্যে দিয়া একটা সরু গুণটানা পথ চলিয়া গিয়াছে, সেইটা ধরিয়া বরাবর চলিল। অপ্রসন্নতাটুকু ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার জায়গায় ধীরে ধীরে কী যে একটা অদ্ভুত ভাবে মনটা ভরিয়া যাইতেছে, ঠিক যেন ধরা যাইতেছে না। শুধু এইটুকু বোঝা যাইতেছে, সেটা ঠিক প্রসন্নতা নয়, একটা যেন পাঁচমিশালি অনুভূতি, জীবনে এর আগে কখনও এর সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না,—একটা অব্যক্ত বিষাদ, খানিকটা ঔদাসীন্য, তাহার সঙ্গে একটা অদ্ভুত শূন্যতা।

পাশেই নিচে বর্ষাস্ফীত গঙ্গার কলতান। সামনে একটা বড় চড়া; কিছু একটা আবদ্ধ আছে, মত্ত স্রোত সেটাকে যেন চারিদিক থেকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আজ চিন্তার বেশ স্পষ্টতা নাই শৈলেনের, দু'-একটা এই সব দৃশ্য মাঝে মাঝে আরও অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছে। চরের উপর দু'-একটা খড়ের ঘর, তীরে দু'একখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, একটু ত্রস্ত-চাঞ্চল্যে কয়েক জন কুটীর থেকে কি সব জিনিষপত্র আনিয়া তাহাতে তুলিতেছে। সূর্য রাঙা হইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে কলমুখর জলরাশি, তাহার মধ্যে এই অভিশপ্ত চরে জীবনের এই স্পন্দন-টুকু বড় অদ্ভুত লাগিল। শৈলেন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, বেশ অনেকক্ষণ তাহার পর অগ্রসর হইল।....এক-এক জায়গায় তীরের খানিকটা করিয়া ধ্বসিয়া গেছে, একেবারে সিধা, প্রায় দুই তলা নিচে গঙ্গা— ছোট মেয়ের মত পাঁক ঘোলাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে...শৈলেন একবার ফিরিয়া দেখিল, অনেক দূরে ষ্টেশন, মাইল খানেকের উপরই হইবে। সেই ভিড়টা—জীবন যেন জট পাকাইয়া গেছে। একটু দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বিতৃষ্ণায় মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—শৈলেন বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কেন এর আগে লোক-সমাগম তো তাহার বরাবর ভালই লাগিয়া আসিয়াছে! হঠাৎ এ বিতৃষ্ণার কারণটা ঠিক বোঝা গেল না! শৈলেন আবার আগাইয়া চলিল।....সামনে সূর্য আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল, না ফেরা যাক, অনেক দুর আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ষ্টিমার তো সেই আটটায়। আগাইয়া চলিল—এক সময় ষ্টেশনের দূরত্ব, ষ্টিমারের বিলম্বের কথাও মন থেকে যেন মুছিয়া গেল, চলাটাই লাগিতেছে ভালো, তাই চলিতে লাগিল—মনে হইল যেন একটা পরিত্রাণ—চারিদিকের শান্তির মধ্যে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে—সামনের

ছায়া এই শান্তিটিকে যেন একটা স্পষ্ট রূপ দিতেছে অদৃশ্য তুলির টানে।...এক সময় হঠাৎ একটু চমকিত এবং আতঙ্কিত হইয়া শৈলেন দেখিল গুণটানা রাস্তাটা আর নাই। হঠাৎ একটা বিপদের সামনে আসিয়া সম্বিতটা ফিরিয়া আসিল, নূতন রাস্তা খুঁজিতে হইবে, এই চিন্তাতেই সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগিয়া উঠিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাহার জন্য জাগা, অর্থাৎ পথ খোঁজা বা নূতন পথ সৃষ্টি করা—সেই দিকেই গেল না বুদ্ধিটা, হঠাৎ এক নূতন পরিস্থিতির সামনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সামনেই একটা গহ্বর, একটা বেশ বড় পুকুর, পথটা এই বড় গহ্বরের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে।...গঙ্গার একটা বড় ধস, এত-বড় ধস বড় একটা চোখে পড়ে না, রাস্তাটা স্বাভাবিক পরিণতিতে শেষ হয় নাই, এই ধসের মধ্যেই কবলিত হইয়াছে।....বড় আশ্চর্য বোধ হইল শৈলেনের – একটা পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, একটা গতি গন্তব্যের আগেই আবেগ ফুরাইয়া বসিল!... জীবনও তো পথ, জীবনও তো গতি; এই আকস্মিক বিলোপ তো তাহারও হইতে পারে;—যখন হিসাব চলিতেছে—জীবনের আরও তিন ভাগ বাকি—আরও অর্ধেক, তখন হঠাৎ দেখা গেল—একেবারে শেষ।....ধসটা নিজের বিপুল ভারেই একটা দ'য়ে দাঁড়াইয়াছে; শৈলেন সম্মোহিতের মতো স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মাঝখানে একটা বিরাট চক্র—ত্রস্ত, কুটিল,—একটা যেন বিকৃত আনন্দে নিজের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া আবর্তিত হইতেছে। এ এক বিকৃত আনন্দ—সমস্ত চক্রটাই নিজের সৃষ্ট গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ছিন্নমস্তার মতো নিজের সৃষ্ট মৃত্যুর সঙ্গেই এই উন্মাদ ক্রীড়ার সামনে শৈলেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উন্মাদের চাপা হাসির মতোই খল-খল করিয়া মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট শব্দ হইতেছে।....ঐ ঘূর্ণির রেখাটা—ঐ একটা কুটা—ঐ একটা কিসের ডাল—একটা কি শস্যের গুচ্ছ, প্রাণের পূর্ণতায় সবুজ—একে একে টানের মধ্যে পড়িয়া, গতিবেগ বাড়িয়া বাড়িয়া একেবারে নিরুদ্দেশ। একটা কি সরীসৃপ, বড় গিরগিটি গোছের—পরিত্রাণের কী অসম্ভব চেষ্টা! ঘূর্ণির মুখের কাছে বার দুয়েক উঠিলও ঠেলিয়া, তাহার পর ক্ষুদ্রতম কুটাটির মতোই অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু কী দরকার এই পরিত্রাণের চেষ্টার? কি-ই বা ক্ষতি এই বিলুপ্তিতে?....শৈলেনের মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, এই আবর্তের মতোই একটা ঘূর্ণি জাগিয়া উঠিতেছে মাথার মধ্যে। দ' থেকে দৃষ্টি সরাইয়া প্রশস্ত গঙ্গার উপর রাখিল। স্রোতকে বলে জীবন, সরীসৃপটা ঐ আবর্তিত মৃত্যু থেকে

এই জীবনকেই জড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিল।....কিন্তু এই অমোঘ, অনিশ্চিত স্রোত সত্যই কি জীবন ?—খুব বেশি তো বিলম্বিত মৃত্যুই নয় কি ?....শৈলেন পিছন ফিরিয়া দেখিল—জনতাকীর্ণ স্টেশনটা নিতান্ত অস্পষ্ট, মনে হইল বহু দূরে ছাড়িয়া আসা জীবন যেন। চরটার উপর নজর পড়িল, নৌকা দু'টা পাড়ি দিয়াছে। উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে চমৎকার একটা অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছে।....খেয়া —একটা অভিশপ্ত জীবন ছাড়িয়া একটা নিরাপদ জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ! শৈলেনের মাথায় যেন হঠাৎ উল্লাসের একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল ; বাঃ, বেশ তো —একটা নূতন, নিরাপদ জীবনের জন্য এই তীর ছাড়া !....কী আনন্দ, ছাড়া যাক না খেয়ার নৌকা ঐ আবর্তের পথে ! জীবনের নামে এই যে এতবৎসর-ব্যাপী অভিশাপ, কেন মায়া তাহার জন্য ?....সূর্যাস্ত হইতেছে—বেশ চমৎকার লগ্ন, এত চমৎকার লগ্ন জীবনে আর না-ও আসিতে পারে। সমস্ত জীবন ধরিয়া এত সৌন্দর্যের সাধনা করিল কেন শৈলেন, যদি এই বিরাট সৌন্দর্যকেই সে ব্যর্থ হইতে দেয় ?....না আর দ্বিধা নয়।

একটু পাশে আরও খানিকটা ফাটল ধরিয়াছে, একটা মাঝারি গাং-ঝাউয়ের গাছ, ঝিরঝিরে বেগুনে ফুলে ভরা, নিজের আয়ুর ইতিহাস জানিয়াও যেন অবিচল ধৈর্যে দাঁড়াইয়া আছে।....না, ঝাঁপ দেওয়া নয়, —বড় গদ্যময় মৃত্যু সে, এই মহেন্দ্র লগ্নের উপযোগী নয় ; এমন চমৎকার আবেষ্টনীর যোগ্য নয় অমন নির্ভয় মৃত্যু-সাথীর অমর্যাদা....

শৈলেন ধীর পদে গিয়া সেই ফাটলধরা জমিটার উপর দাঁড়াইল, ফাটলটা আর একটু ফাঁকা হইয়া গেল—নোঙ্গরের কাছিতে টান পড়িয়াছে, শৈলেন বন-ঝাউটার আরও কাছে সরিয়া গেল, তাহার পর কি ভাবিয়া ঝাউয়ের একটি পুষ্পিত শাখা ডান হাত দিয়া নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিল !....চলো বন্ধু, এবার আমাদের তরী তীর ছাড়ুক...

পৃথিবী যেন অবলুপ্ত হইয়া গেছে। তাহার পরেই একটা নিতান্ত অভাবিত দৃশ্য চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। একেবারে বিদায়ের শেষ ক্ষণে একেবারে অবলুপ্ত চেতনা থেকে এই রকম এক-একটি ছবি মনের পর্দায় আলোর রঙে ক্ষণিকের জন্য ওঠে ফুটিয়া ; কবে দেখিয়াছিল, বড় ভালো লাগিয়াছিল, তাহার পর আবার কি করিয়া স্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর হিম স্পর্শে আবার ওঠে জাগিয়া।....ছবিটা এমন কিছুই নয়; এই রকম একটি সন্ধ্যায় মা

আঁচলে প্রদীপ ঢাকিয়া তুলসী-মঞ্চের পানে যাইতেছেন, আলোর আভায় আঁচলের রাঙা পাড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখও উজ্জ্বল, তবে শুধু আলোর প্রভায়ই নয়, আরও যেন একটা কিসের প্রভা আছে জগতের কোন আলোতেই যাহার আভাস পাওয়া যায় না।

সমস্ত পৃথিবী যেন এই একটি ছবিতে রূপান্তরিত হইয়া গেছে। ....শৈলেন স্থির নেত্রে শূন্যবদ্ধ ছবিটির পানে চাহিয়া রহিল—বেশ খানিকক্ষণ; দুই বিন্দু অশ্রু চোখের পাতা ঠেলিয়া উঠিয়াছে; তাহার পর মনে পড়িল সে একটা ফাটলের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গঙ্গার ধার, বর্ষার গঙ্গা, ফাটলটা ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণতর হইতেছে....

সন্তর্পণে পা ফেলিয়া ফাটল ডিঙাইয়া নিরাপদ ডাঙায় আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর স্টেশনের দিকে পা বাড়াইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একটা শব্দে ফিরিয়া চাহিতে দেখিল—পুষ্পিত বন-ঝাউ সমেত ফাট-ধরা জমিটা দ'য়ের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে।

শৈলেনের সেদিনকার ডায়েরীতে লেখা আছে: আমি আবার ফিরে এলাম মা। তোমায় চরম আঘাত দিতে গিয়ে আমার হুঁস হোলো—তুমি থাকতে আমার যাবার অধিকার নেই, আমার সাধ্যও নেই।

৬

মৃত্যুর দিক্ থেকে মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, সে কিন্তু ঘুরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; মা কেমন আছেন? এই দুই বৎসরের বিচ্ছেদ যত আশঙ্কা এক মুহূর্তে তার পুঞ্জীভূত তীব্রতায় শৈলেনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আর ঐ একটি প্রশ্ন আশ্রয় করিয়া মৃত্যু যেন শত শত রূপে, শত বিভীষিকায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মা কি রকম আছেন?....আছেন তো? যদি না থাকেন!.... সর্বনাশ, এ কি হইয়া গেল!...দুই বৎসরের মধ্যে শৈলেন এত অসম্ভব কথা সব ভাবিয়াছে—এত অসম্ভব আশা, এত অসম্ভব কল্পনা—আর এই সব চেয়ে বড় সম্ভাবনার কথাটাই ভাবে নাই।

গতিটা আপনিই দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, যেন এখনই পৌঁছিতে হইবে, এমনও তো হইতে পারে যে, এই আজ পর্যন্ত ছিলেন মা, কিম্বা আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত থাকিবেন, তার পর....

শৈলেন এর পরে আর নিজেকে ভাবিতে দেয় না, জোর করিয়া চিন্তার গতি রোধ করিয়া রাখে। সেই রুদ্ধ বেগই যেন পায়ে আসে নামিয়া, পদক্ষেপ আরও যায় ক্ষিপ্র হইয়া। মনটা বেশ প্রকৃতিস্থ নাই ই আজ, এক সময় মাত্র একটি চিন্তাই মনকে চাপিয়া ধরিতে চায়, এই একটু আগে ছিল যাইতে হইবে, এইবার দাঁড়াইয়াছে ফিরিতে হইবে ; স্থান, কাল, অবস্থার চেতনা সব গেছে মন থেকে মুছিয়া।

সেটা ফিরিয়া আসিল স্টেশনে আসিয়া। মা আর তাহার মাঝে এখনও যে বহু দূরের ব্যবধান! আপাততঃ সম্বল ষ্টীমার, তাহার এখনও অন্তত দুই ঘণ্টা দেরী!

শৈলেন জলে নামিয়া বেশ ভালো করিয়া মুখ-হাত ধুইল ; বেশ গুছাইয়া ভাবিবার ক্ষমতাটা অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে। আজ সমস্ত দিনের ঘটনাগুলা আদ্যোপান্ত একবার ভাবিয়া দেখিল। গঙ্গার দ'য়ে আসিয়া চিন্তাটা যেন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল—অনেকক্ষণ ঃ সেই কেন্দ্রমুখী আবর্ত, তাহার উপর গাঢ় অন্ধকার নামিয়াছে এখন। মৃত্যু যেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া জীবন-স্রোত থেকে সন্দেহলেশহীনদের নিজের গহ্বরে টানিয়া টানিয়া লইতেছে—কুটাকুটি, সবুজ ডাল, সবুজ শস্য, জীয়ন্ত গাছ ; কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ।....কোথায়?....শৈলেন এতক্ষণে—কত আগেই না সে-প্রশ্নের উত্তর পাইয়া যাইত! মনটি বিষণ্ণ হইয়া আসে। জীবনে আবার প্রত্যাবর্তন করিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাণের স্বভাবত যে সন্দিগ্ধ আতঙ্ক সেটা কি আবার ফিরিয়া আসিতেছে?

রাত বারোটার পর শৈলেন দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিল। নিতান্ত নিরুপায় হওয়ার জন্যই মা-লইয়া যে উদ্বেগটা কতক চাপা ছিল সেটা আবার উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, কি দেখিতে হইবে?—কি শুনিবে?...কাছেই বাড়ি, কিন্তু ঐটুকুতেই পা যেন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বাড়ির কাছে আসিয়া আর যেন উঠিতে চায় না।

বাহিরে কেহ নাই, শুধু শশাঙ্ক একখানি ডেক-চেয়ারে গা ঢালিয়া খালের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। একটা গুমট গরম যাইতেছে, এদিকে গাঢ় অন্ধকার।

কে আসিতেছে দেখিয়া শশাঙ্ক সোজা হইয়া বসিলেন। শৈলেন পায়ের

ধূলা লইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না, গলাও গেছে শুকাইয়া। শশাঙ্কই প্রথমে কথা কহিলেন, উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"শৈলেন?"

"হ্যাঁ দাদা; মা কি রকম....মার কোন রকম...মানে, মার...."

শশাঙ্ক বলিলেন—"ভালোই আছেন মা—আর সবাইও; ভেতরে চল্।"

মেয়েদের এই একটু আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে, গিরিবালা শয়ন করিতে যাইতেছিলেন, শশাঙ্ক ডাকিয়া বলিলেন—"মা, শৈলেন এসেছে।"

"কে?"—বলিয়া গিরিবালা চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইলেন; শৈলেন গিয়া প্রণাম করিল।

আশীর্বাদ করিতে গিরিবালার একটু সময় লাগে; কপালের মাঝখানে চারিটি আঙুল বুলাইয়া বুলাইয়া একটু কি বলেন মনে মনে, হাজার তাড়া-হুড়া আবেগ-উদ্বেগের মধ্যেও এই শান্তিটুকু তাঁহার অবিচলিত থাকেই। বাড়িতেও সবার অভ্যাস, আশীর্বাদ গ্রহণের এই সময়টুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন—"এই গাড়িতে এলি?"

শৈলেন উত্তর করিল—"হ্যাঁ, এই বারোটার গাড়িতে।"

গিরিবালা এক দৃষ্টিতেই শৈলেনের সমস্তখানি যেন দেখিতেছেন, তবে তাহাতে না আছে চেষ্টা, না আছে চাঞ্চল্য। প্রশ্ন করিলেন—"খাওয়া হয়নি নিশ্চয়?"

ছেলেদের যাহারা জাগিয়াছিল উঠিয়া আসিয়াছে, দুইটি পুত্র-বধূও আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে। শৈলেনকে প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া এক জন বৌকে খাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন, কতকটা আত্মগত ভাবে বলিলেন—"ওকে তো কত দিন খাওয়া হয়নি তাই জিগ্যেস করলেই ভালো হয়।"

প্রবাস লইয়া কিন্তু অনুযোগের কথা আর কিছু বলিলেন না। আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিয়া দেয়, এটা শশাঙ্কেরও মনঃপূত নয়, এদিক্-ওদিক্ দু'-একটা কথাবার্তার পর বলিলেন—"আর কাউকে তুলে কাজ নেই এখন, বাবাকেও নয়। তুইও কাপড়-চোপড় ছেড়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে যা শৈলেন; বেশ ক্লান্ত হয়ে রয়েছিস্।"

বোধ হয় আর সবাইকে উদাহরণ দেখানো হিসাবেই নিজেও শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

সবাই চলিয়া গেলে মুখ-হাত ধুইয়া শৈলেন বলিল—"চলো মা, ছাতে গিয়ে একটু বসা যাক চলো, বড্ড গরম, আর গাড়িতে যা ভিড় ছিল..."

ছাতে গিয়া বসিয়াছে, ছোট বোন লীনা আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রণাম করিয়া মায়ের পাশে বসিতে বসিতে বলিল—"বেশ যা হোক! ধন্যি।"

বোধ হয় অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখটা ফিরাইয়া লইল। এই জিনিষটাকেই অনেক কষ্টে এতক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে, আর বোধ হয় সম্ভব হইত না, কিন্তু এই সময় শশাঙ্কর বড় মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কাকার প্রিয় বলিয়া তাহার মা-ই বোধ হয় উঠাইয়া দিয়াছে—বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে টপ করিয়া একটা ফাঁস পরাইয়া দেওয়াই নিরাপদ। "মেজকা'!"—বলিয়াই কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহার পর মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"আমার জন্যে কি এনেছ?"

"এই যাঃ, ভুলে গেছি! দাঁড়া আবার যাই।"—শৈলেন তাড়াতাড়ি উঠিবার ভাণ করিতেই সে অত্যন্ত ভীত ভাবে হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"না—না—না, তুমি বড্ড পালাও!"

তিন জনের মধ্যে হাসি পড়িয়া গিয়া উদ্যত অশ্রুটা চাপাই পড়িয়া গেল। এর পরে প্রবাসের কথাটাই সহজে আসিয়া পড়িল। লীনা প্রশ্ন করিয়া মাঝে-মাঝে মন্তব্য গুঁজিয়া দিয়া কাহিনীটি বাহির করিয়া লইতে লাগিল—কোথায় কোথায় গেল শৈলেন, কি কি করিল।...."মা গোঃ, চিঠিও দিতে হয়—দু'-দুটো বছর! সত্যি তোমায় ধন্যি বলতে হয় মেজদা'।....নয় কি মা?"

গিরিবালার গলায় উত্তরটা একটু আটকাইয়া গেল, ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—"জানছি, যেখানে আছে, ভালোই আছে..."

একটু ভয়ও হয়, অথচ এ-সব কথা তুলিতে লীনাকে সোজাসুজি বারণও করিতে পারেন না; কতকটা যেন শৈলেনেরই পক্ষ লইয়া বলিলেন—"আর, চিঠিপত্র, মারাও যায় বড্ড আজকাল বাপু, এই তো সেদিন খুকি লিখলে দু'-দুখানাও চিঠি দিয়েছিল অথচ...."

"আমি কিন্তু একখানাও চিঠি দিইনি মা"—বলিয়া শৈলেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এঁরা দুই জনেও হাসিয়া উঠিলেন, লীনা আরও বাড়াইয়া দিল হাসিটা, বলিল—"ঐ নাও, আসামীর সঙ্গেই তার উকিলের মিল নেই।"

সেজবৌ লুচি ভাজিয়া লইয়া আসিল; শৈলেন রেকাবিটা টানিয়া লইয়া বলিল—"এবার এখানকার কথা বলো মা, আমার গল্প এত মিষ্টি নয় যে লুচির সঙ্গে চালাতে পারব, কি বল্ লীনা?"

লীনা হাসিয়া বলিল—"ফিরে এসেছ, এখন মন্দ লাগছে না ; কাহিনীতে দাঁড়িয়েছে কি না।"

গিরিবালা বলিলেন—"আর কাহিনীতে কাজ নেই বাবা, রক্ষে করো।.... এখানকার খবর?—ও! তোকে আসল খবরটাই বলা হয়নি—মোনুর চাকরি হয়েছে—ঐ ডুলারমনের বর এখন যা তাই আর কি।"

যে পরিবারকে একেবারেই নিচে থেকে আরম্ভ করিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে খবরটা বেশই বড়, শৈলেন মুখে হাত তুলিতেছিল, অনুচ্ছ্বসিত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ডেপুটিগিরি?"

উত্তরটা লীনাই দিল, মায়ের মুখ থেকে একরকম কাড়িয়াই, একটু আবেগের সহিতই বলিল—"হ্যাঁ, ডেপুটিগিরি। আর সেই কথাটা মা—বলো না।"

মাকে অবসর না দিয়া নিজেই বলিল—"এখানকার জজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে রাঙাদা'র।"

শৈলেন হাসিমুখে একটু বিস্ময়ের সহিত মায়ের মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ মা?"

ভিতরের আনন্দে গিরিবালার মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন—"হ্যাঁ, তাঁর বৌয়ের মোনুকে না কি বড্ড পছন্দ হয়েছে। এদিকে আবার মুন্সেফ বাবুর বোনের সঙ্গে অবুর বিয়ের কথা হচ্ছে, শশাঙ্ককে ধরেছেন তিনি। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি বাবা, সত্যি কথা বলতে কি। সব নিজেদের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে গেরস্থ-ঘরের মেয়ে এনেছি, বেশ মিশ খেয়েছে, এর মধ্যে বড়লোকের মেয়ে এনে ফেলা—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাদের নিয়ে আমার ভয়, সেই বৌমারাই আবার জিদ ধরে বসেছেন বিয়ের জন্যে, একটু উভয়-সঙ্কট নয়?"

লীনা তর্ক জুড়িয়া দিল—"বাঃ, এই তো সেজ বৌদিও বড় এক জন উকিলের মেয়ে, মিশ খায়নি?"

গিরিবালা বলিলেন—"কি জানি বাছা, আমার তো মনে হয় উকিলরা, ডাক্তাররা যেন আমাদেরই দলের—হাজারই বড় হোক ; বড় চাকরিওয়ালা হলেই মনে হয় যেন আলাদা।"

লীনা বলিল—"তা ওঁর বাবা তো উকিল থেকেই জজ হয়েছেন।"

গিরিবালা হাসিয়া উঠিলেন, শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঐ শোন্, এই সব তর্ক সবার মুখে মুখে ঘুরছে—বৌমাদেরও। তা বেশ তো বাছা, তোদের সবার মুখ চেয়েই তো বলা, তোদের মনে হয় বেমানান হবে না,

মিলে-মিশে থাকতে পারবি, আমি আপত্তি করতে যাব কেন?…আসল কথা শৈল, বংশটি ভালো হওয়া দরকার, গরীবও বুঝি না, বড়-মানুষও বুঝি না, সৎ-বংশের মেয়ে যেখানে যাবে মানিয়ে নেবে। তবে কথা হচ্ছে অবস্থার খুব বেশি তারতম্য থাকলে বংশের পরিচয় পাওয়াও একটু মুশকিল হয়…."

লীনা উৎসুক ভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে, চেষ্টা, একটু সংশয়জনক হইলেই মতটা তাড়াতাড়ি নিজেদের দিকে ফিরাইয়া লওয়া। বলিল—"আর ওরাও আট ভাই, দুই বোন, মেজদা' ঠিক আমাদেরই মতন…."

গিরিবালা এবার জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ঐ যে, আর একটা তর্কের নমুনা! কী জ্বালা বাবা! এই রকম সব ঘট্‌কী হলেই হয়েছে!—দু'দিকেই আট ভাই দুই বোন তো আর বিয়ের কোন আটক নেই!….আর যদি এর পরে ওদের ভাই-বোন হয়?…."

লীনা বলিল—"বয়ে গেল, তখন তো কাজ হয়ে গেছে…"

আদাড়ে তর্কে এবার শৈলেন পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওরা ছাড়বে না মা, তোমায় রাজি করাবেই…."

আসিয়া অবধিই শৈলেনের মনটা সমস্ত হাসি-গল্পের মধ্যে একটি জিনিষ খুঁজিতেছে, অবশ্য খুব সূক্ষ্মভাবেই—তাহার এই দীর্ঘ প্রবাসটা মায়ের দেহ-মনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এদিকে গল্পটা মা আর লীনা চালাইয়া যাওয়ায় লক্ষ্য করিবার একটু সুবিধাও হইয়াছে। শুনিতেছে, হাসিতেছে, মন্তব্যও করিতেছে এক-আধটা, কিন্তু চিন্তার একটি অন্তঃস্রোত একেবারেই অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছে। গিরিবালা শরীরে যে একটু শুকাইয়া গেছেন তাহা অতি সামান্যই, যে-কোন কারণেই তাহা হইতে পারে, মনের প্রফুল্লতাও যে নষ্ট হইয়াছিল তাহারও বেশি প্রমাণ কোথায়? অবশ্য আজ—এই এখন যে প্রফুল্লতা সেটা শৈলেনের ফিরিয়া আসার জন্যই; কিন্তু মা যে এর আগে বিষণ্ণই ছিলেন তাহার প্রমাণ কৈ? যে মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষণ্ণ থাকে, বিষাদের কারণটা অপসৃত হইলে সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না?—বিশেষ করিয়া সেই অপসারণ যখন এত আকস্মিক।…গিরিবালার কিন্তু এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই, প্রশ্ন করিলেন যেন—দুই বৎসর নয়, এই দু'দিন আগে শৈলেন কোথায় গিয়াছিল, এই গাড়িতে নামিয়াছে।

কিন্তু মায়ের সন্তান সম্বন্ধে যেমন একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, সন্তানেরও মায়ের সম্বন্ধে ঠিক তেমনই একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে—মা আর সন্তান একটা বিষয়েরই দুই দিক তো? সন্তান যেমন মাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না, মায়েরও তেমনি

সন্তানের কাছে প্রবঞ্চনা খাটে না। মায়ের অমন প্রফুল্লতার মধ্যে কোথায় যে খাদ মিশিয়াছে শৈলেনের সেটা দৃষ্টি এড়াইল না। মনের গভীর নিভৃতে একটা অপরিসীম ক্লান্তি আসিয়াছে মায়ের,—সেটা চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি, মুখের কথা—সবেতেই অতি সূক্ষ্ম একটা প্রবঞ্চনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। বেদনা যেখানে স্পষ্ট সেখানে এটা হয় না, সেখানে হাসির জায়গায় হাসি থাকে, অশ্রুর জায়গায় অশ্রু। তাহার মানে এই দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া মা প্রফুল্লতার প্রলেপে বিষাদটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—যাহারা আছে তাহাদের মুখ চাহিয়া। দুইটি বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত মাকে এই অভিনয় করিয়া আসিতে হইয়াছে—ভিতরে ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ; বাহিরে যেন এমন কিছুই হয় নাই, শৈলেনের ওটা নিরুদ্দেশ হওয়া নয়, চিঠি না পাওয়ার উদ্বেগ আর অপমানটা প্রতিনিয়তই উঁহাকে যেন শেলের মতই বিদ্ধ করিতেছে না। ঢাকা দিবার অমানুষিক চেষ্টায় গিরিবালা বুঝিতেই পারেন নাই কখন যে তাঁহার প্রসন্নতার মধ্যে বিষাদের বিষ অল্পে অল্পে গেছে মিশিয়া। এখনও সেই অভিনয়ই চলিতেছে। কী করিল শৈলেন!—মায়ের সেই রূপ আবার কবে ফিরিয়া পাইবে?—কখনও আর পাইবে কি?

ওদিকে গল্প চলিয়াছে। শৈলেনের কথায় গিরিবালা বলিলেন—"ছাড়া-ছাড়ির কথা তো নয়, ভেবে দেখবার কথা। রাজি হব না এমনও তো ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসিনি আমি, না আমার বড়-মানুষের সঙ্গে শত্রুতা আছে, সেটা তো হিংসে শৈল। আমি চাই বিয়ের ব্যাপার যেখানে, সেখানে যেন মিলটা ভালো হয়।"

লীনা বলিল—"জজের জামাই ডেপুটি—মন্দ মিল হোল?"

গিরিবালা বলিলেন—"কিন্তু সেই ডিপুটি যে গরীবের ছেলে—সেটা দেখতে হবে না?"

লীনার মুখটা একটু মলিন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, বেশ একটা কথা মনে পড়ে গেল,—বড়্দা সেদিন বলছিলেন আমরা দশটি ভাই-বোনে মার পায়ের দশটি আঙুল...."

গিরিবালা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"নাও, তর্কে এঁটে উঠতে পারলে না, শেষকালে খোসামোদ।"

তাহার পর কন্যাকে একটু সমস্যায় ফেলিবার জন্যই হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন—"বেশ বুঝলাম—দশটা আঙুল ; তা কি হয়েছে?"

লীনা একটু হকচকিয়া গেল, তাহার পর ভাবিবার জন্য দু'-একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া লইয়া বলিল—"বাঃ, দশটি আঙুল তোমার যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে সেদিকে যেতে হবে না তোমায়—মানে, সমস্ত শরীরটাকে ?...."

খোসামোদকে এরকম জবরদস্তিতে পরিণত হইতে দেখিয়া শৈলেন সুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। রাত অনেকখানি হইয়াছে, শৈলেনেরও খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, এক সময় সবাই নিচে চলিয়া গেলেন।

৭

শয্যা যেন শৈলেনের কাছে কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। যে চিন্তাটাই আরম্ভ করিতেছে সেইটাই কেমন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মায়ের হাসির পিছনে যে ক্লান্তি সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া এক সময় উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিক্ এটা, সরু হাঁসুলির মতো চাঁদ উঠিল। সেটা রাস্তার ওধারে আমগাছগুলার উপর আসিয়া দাঁড়াইতে খুব একটা পাৎলা জ্যোৎস্নায় চারি দিক্ ছাইয়া গেল। শৈলেন ঘরের বাহিরে আসিল।

তখন অন্ধকার ছিল বলিয়া দেখিতে পায় নাই, অল্প হইলেও জ্যোৎস্নার জন্য এইবার সমস্ত বাড়িটার একটা আবছায়া মূর্তি চোখে পড়িল। বাড়িটাতে বেশ খানিকটা উন্নতি হইয়াছে; ছিল একতলা এখন উপরে কয়েকখানা ঘর, টানা রেলিং-দেওয়া বারান্দা, তাহার মাথায় নূতন ফ্যাসানে কংক্রিটের ঢালাই জাফরি। হঠাৎ চোখে পড়ার জন্যই যেন ভালো করিয়া বিশ্বাস করা যাইতেছে না, মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্নপুরী। অন্যত্রও খানিকটা খানিকটা করিয়া পরিবর্তন হইয়াছে, এরই সঙ্গে ছন্দ মিশাইয়া। বিপিনবিহারীর বাগানের শখ, বাহিরের উঠানের পাশে খানিকটা জায়গা লইয়া একটা বাগানের আদল দেখা যায়, খুব মৃদু হাসনাহানার গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আছে। শৈলেন উঠান, বারান্দা, ছাত সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়িটা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল—কোথায় আগে কি রকমটা ছিল, এখন কি রকম হইয়াছে, সব মিলাইয়া মিলাইয়া। যেন একটা অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, মায়ার আকর্ষণে মাটির সঙ্গে লিপ্ত হইয়া ঘুরিতেছে। এক সময় আস্তে আস্তে দুয়ারটা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

চাঁদটা আরও খানিকটা উঠিয়া আসায় জ্যোৎস্না আরও একটু স্বচ্ছ হইয়াছে। খালটা পার হইয়া রাস্তা পর্যন্ত গেল। সেখান থেকে সমস্ত বাড়িটি

বড় অপূর্ব দেখাইতেছে। বাহিরের হাওয়ায় শরীরের গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে মনের গ্লানিও অনেকটা কাটিয়া গেছে, শৈলেন আসিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। গেটের উপর একটা জেস্‌মিনের ঝাড়, প্রবেশ করিতে তাহার গন্ধের খানিকটা যেন সর্বাঙ্গে লেপিয়া গেল।

আবেষ্টনীর প্রভাবে মাঝে মাঝে যে একটি স্নিগ্ধতার ভাব আসিতেছে, সেটা কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। কেবলই মা'র মুখটি মনে পড়িতেছে; আশ্চর্য, হাসির দিক্‌টা যেন চোখেই পড়িতেছে না, চোখে পড়িতেছে শুধু বেদনার দিকটা।

—এই প্রায় দু'টি বৎসর মায়ের জীবনকে একটি নবতর সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া তুলিবার কথা। মায়ের জীবনের বিকাশে যে কয়েকটি ধাপ—মায়ের মুখে শোনা গল্প থেকেই শৈলেন যা করিয়া নির্ণয় লইয়াছে—সিমুরের প্রথম জীবন, তাহার পর সাঁতরার গঙ্গাতীর, তাহার পর পাণ্ডুলের প্রথম জীবন—শশাঙ্ক—বড় সমাজের মধ্যে দ্বারভাঙ্গার প্রথম জীবন—এই সবের সুরে সুর মেলানো মায়ের জীবনের এই দুইটি বৎসরও। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের পর বড় ছেলের চাকরির সঙ্গে যে সচ্ছলতার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই দুই বৎসরে যে সেটুকু সমৃদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে চারিদিকেই তাহার প্রমাণ সুস্ফুট। এটুকুকেও আবার পূর্ণতা দিয়াছে ঐ দু'টি বিবাহের প্রস্তাব। মা যাহাই বলুন, অন্তরে অন্তরে তিনি এ যোগাযোগের বিপক্ষে নহেন। ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব এমন বিরাট কিছু নয়, তবুও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য; আর গৌরবের বৈ কি,—বাবা-মা তো এর জন্য প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই, প্রস্তাব ওদিক থেকেই। সন্তানের মধ্যে দিয়া এও তো জীবনের একটা পরিণতি, মায়ের জীবন আরও সন্তানাশ্রয়ী বলিয়া তাঁহার জীবনে এ একটা বড় সার্থকতা। মনে মনে মা যে হৃষ্ট, এটা বেশ বোঝা যায়,—আশা করিয়া আছেন যেন বংশের দিক্ দিয়াও বেশ মিল হয়, ঐ দু'টি কন্যাই বধূ হইয়া আসে এ বাড়িতে।

—এই এমন দুইটি বৎসরের আনন্দ মলিন করিয়া রাখিয়াছে শৈলেন। শশাঙ্কর পর তাহারই উপর আশা।...চিঠি পর্যন্ত না দিল কেন?

অত ক্লান্তির পর সমস্ত রাত ঘুম নাই, তাহার পর অক্টোপাসের মতো এই অপরাধের চিন্তাটা মনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে; মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে। শৈলেন আবার উঠিয়া খালের ওধারে দ্বীপের মতো জমিটুকুর এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।...চাঁদটা অনেক উঠিয়া গেছে, আমগাছের মাথার ঠিক উপরে

শুকতারাটা দপ-দপ করিতেছে। অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ ঐটুকু জমির উপর পায়চারি করিল!....শুকতারাটা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। নিচে, দিক্‌-রেখার উপরে একটা খুব হালকা আলোর আভাস—দিনের প্রথম সূচনা। সমস্ত রাত্রিটি নিদ্রাহীন কাটিল; দুই বৎসর আগে যখন বাড়ি ছাড়িয়া যায় তখনও ঠিক এই রকম একটি রাত্রি,—বিনিদ্র, অপরাধ-ক্লিন্ন।....হে ভগবান, জীবনে আর কত এমন অভিশপ্ত রজনী আসিবে?

ঊষার বিকাশটি ভালো লাগিতেছে, শৈলেন সামনে চাহিয়া রহিল। নিপুণ হাতে কে যেন খুব হাল্‌কা এক-একটা তুলির টান দিয়া যাইতেছে- একটু আলো, তাহার পর আর একটু, তাহার পর আরও একটু...

এইবার একটু পরে বাবা উঠিবেন, তাঁহার সঙ্গে প্রথমেই এই ভাবে দেখা হওয়াটা ঠিক হইবে না। শৈলেন ঘুরিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঘরের বাইরের বারান্দায় নজর পড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখে, পূব দিকে মুখ করিয়া বারান্দার রেলিং ঘেঁসিয়া মা দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁদারার কাছে একটা কামিনী ফুলের গাছ, তাহাতে একটা অপরাজিতার লতা উঠিয়াছে, শৈলেন এদের হালকা জাফরির আড়ালে ছিল, তাহা ভিন্ন বেশ খানিকটা দূরেও,—মা দেখিতে পান নাই। শৈলেন আবার সেই জাফরির আড়ালে সরিয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ এক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, চোখ দুইটি পূব আকাশের দিকে একটু তোলা, মুখে এই ঊষার মতোই একটি সুগভীর শান্তি। শৈলেনের মনে হইল, কালকের রাত্রের সেই যে ক্লান্তির ছায়া তাহার লেশমাত্রও কোথাও নাই আর,—যে-দীপ্তিতে মুখটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—বেশ বোঝা যায় বাইরে এই নূতন দিনের আলোর চেয়ে অন্তরের আলোই তাহাতে বেশি। একটি রাত্রির শান্তিতে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন হইয়াছে মায়ের মধ্যে, মা শুধু নিরাময় হন নাই, যেন পূর্ণতর হইয়াছেন। মাকে সুখে-দুঃখে কত রূপেই দেখিল, সবই মহিমময়—কিন্তু আজ মনে হইতেছে তিনি যেন আরও কিছু—একটি পরম রহস্য। সমস্ত আবেষ্টনীর সঙ্গে শৈলেন তাঁকে মিলাইয়া দেখিল—মনে হয় এই নূতন ঊষা, ঐ শুকতারা, আর মা—রহস্যময়ী এই ত্রয়ী, রজনী-শেষের এই নিবিড় প্রশান্তির মধ্যে কোন্ এক শাশ্বত অসীমের সামনা-সামনি হইয়া বিনম্র স্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া আছেন।

দেখিয়া দেখিয়া শৈলেনের মনটা উদ্বেল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল গিয়া একটি প্রণাম করে,—তাহা হইলেই পুঞ্জীভূত অপরাধের বোঝা হাল্‌কা হইয়া

যাইবে ; এই উপযুক্ত সময়। কিন্তু প্রকৃতিটাই এই রকম যে নিজের অনুভূতির প্রকাশে অল্প কিছুও আড়ম্বর আনিয়া ফেলিতে বাধে।....আড়ালে থাকিয়া বাহির হইতেছে এই রকম যাহাতে মনে না হয় সেই জন্য অল্প একটু ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এত ভোরে উঠেছিস্ যে ?—ঘুম হয়নি রাত্তিরে ?"

শৈলেন আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না ; গলায় কি ঠেলিয়া আসিতেছে, রগ দুইটা টন-টন করিতেছে, চোখ দুইটাও আর শুষ্ক রাখা যায় না। এগুলাকে চাপিবার জন্যই মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"কি করে ঘুম আর আসবে মা ?"

"কেন ?"—বলিয়াই গিরিবালা থামিয়া গেলেন ; হাসির মধ্যেই শৈলেনের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিয়াছে। একটু মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া গিরিবালা কি যেন একটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ও !"

শৈলেন সিঁড়ির এক ধাপ নিচে ছিল, গিরিবালা একটু সরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে একটা হাত দিলেন, বলিলেন—"কি এমন দোষ করেছিস্ শৈল যে...."

শৈলেন গলাটাকে সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দোষের মধ্যে যেগুলো বড় সেগুলোর কথা ছেড়ে দিই মা, যেটা দেখতে সব চেয়ে ছোট সেটার ভারও আমি সইতে পারছি না। তোমার কষ্ট..."

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্নেহের অভ্যাসবশেই হাতটি ধীরে ধীরে শৈলেনের কাঁধে সঞ্চারিত হইতেছে। একটু পরে বলিলেন—"আমাদের সব চেয়ে বড় কষ্ট, তোদের জন্যে ভাবনা, তা এসেই তো গেছিস্। আর দোষের কথা—এই ক'টা মাসে আমি ওটা ভেবে দেখেছি শৈলেন। তুই যেটাকে দোষ বলছিস্ সেটা কি আমাদের ভুলের একটা দিক্ নয় ? এই কথাটাই আমি ভেবেছি এই ক'টা মাস। আমার মনে হয়েছে নিজের কথা ভেবে আমরা তোদের জীবন নষ্ট করতে বসি এক এক সময়। এই ধর্ আজকের দিনটি,—সব দিক দিয়েই তো কালকের মতন ; কিন্তু অন্তত এইখানেই তো তফাৎ যে কালকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ? তোদের যুগ, তোদের জীবনও তেমনি ; তোরা যে নতুন করে গড়বি তোদের জীবন তার জন্যে তোদের ইচ্ছামত চলতে দেওয়া দরকার তো ? একটা সময় ছিল যখন যত ইচ্ছে বিয়ে করে কত মেয়ের জীবন বিষ করে তুলত। এখন কেউ যদি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নাই চায় বিয়ে করতে তো কোন দোষই না হবার কথা তো

তার। তবে হ্যাঁ, একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। আমি ভগবানকে সেই কথা বলি—তুই যদি এমনি থাকিস্ তো তার মধ্যে যেন একটা সৎ উদ্দেশ্য থাকে—তা'হলে আর আমাদের কোন আপশোষই থাকবে না।"

চুপ করিলেন, হাতটা অভ্যাসের বশে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে।

খুব বড় কথা একটু অস্বস্তি জাগায়ই মনে। একটু হালকা ভাব আনিয়া ফেলিবার জন্যই শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল—"ক্ষমা করবার জন্যেই তুমি যেন কথাগুলো ভেবে ভেবে সাজিয়ে রেখেছ মা। আমি জানতাম ক্ষমা চাইবার দায়িত্বটাই বেশি—ছেলের দিক্ থেকে ঃ তোমার দিক্ থেকে ক্ষমা করবার দায়িত্বটাকেই তুমি যেন তার চেয়ে বড় করে তুলেছ।"

একটু অপ্রতিভ ভাবেই গিরিবালার মুখে একটা হাসি ফুটিল, কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিপিনবিহারী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

শৈলেন দুই জনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে প্রশ্ন করিলেন—"ভোরের গাড়িতে এলে?"

"আজ্ঞে না, রাত্তিরের গাড়িতে।"

বিপিনবিহারীর স্বভাবের মধ্যে কি আছে, এক যুগের গ্লানি এক মুহূর্তে কাটিয়া গিয়া মনটা উৎসাহদীপ্ত হইয়া ওঠে, যদিও বাহিরে আরও বেশি সংযতই থাকেন। গিরিবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুললে না কেন? এত কি ঘুম-কাতুরে আমি?"

শেষ পর্যায়

১

আরও কত বৎসর গেল কাটিয়া।

জীবনের যেটা সৃষ্টির অংশ সেটা ধীরে ধীরে অতীত হইয়া গেল। এখন গিরিবালার এদিক দিয়া ছুটি, বুকের উত্তাপ দিয়া এক দিন যাহা সৃজন করিয়াছেন —সুখে দুঃখে—একটি নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়া ফেরা, জীবন মানে এখন এই দাঁড়াইয়াছে। সবার ভাগ্যে এ তৃপ্তিটুকু জোটেনা, কেন না, জীবনের এই সন্ধিক্ষণে পুরাতনের পাশে যে নূতন আসিয়া দাঁড়ায় তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই ঘটে বিরোধ—পুরাতন মনে করে তাহার অধিকারের মধ্যে নূতনের এটা অনধিকার প্রবেশ। বোধহয় কবিপিতার কন্যা বলিয়াই গিরিবালার মনটা এদিক দিয়া একেবারে মুক্ত; সমস্ত জীবনটাকে আলো-ছায়া, নূতন-পুরাতনের বৈচিত্রময় সমগ্রতায় দেখিতে অভ্যস্ত। নূতন আচার, নূতন-সজ্জা সমস্ত জীবনটার প্রতিই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—ছেলে মেয়ে-বধূদের মধ্যে দিয়া, পরে আবার নাতি-নাতনিদের মধ্যে দিয়া নূতনকে ছাড়াইয়া আরও নূতন—সমস্তকেই গিরিবালা নিজের পাশটিতে টানিয়া লন।·· মেয়ে-স্কুলের অভাবে আজকাল দু'টি নাতনি ভাইদের স্কুলেই যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির মাষ্টার মশাইয়ের নিকট হইতে পড়িয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া মুখে কোন রকমে এক মুঠা ভাত গুঁজিয়া লয়, তাহার পর বব্ করিয়া ছাঁটা চুলে তাড়াতাড়ি চিরুনির গোটাকতক টান দিয়া, খাটো ফ্রক আর অল্প গোড়ালি উঁচু ষ্ট্র্যাপ সু পরিয়া ক্ষিপ্র-পদে ভাইয়েদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে,—চোখে-মুখে রাজ্যের উদ্বেগ। গিরিবালার অনভ্যস্ত চোখে একটু অদ্ভুত লাগে বৈ কি; মুখে একটু হাসি লইয়া চাহিয়া থাকেন। ঠাট্টা করিবার লোক আছে,—বড় নাতি নাতনির দল,—বলে— "গিন্নি, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে হিংসে হচ্ছে তোমার, মনে মনে বলছ এ-জন্মে তো হোলনা, আসছে জন্মে যেন ঐ রকম করে আমিও যেতে পারি ইস্কুলে।"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"ঠিক হিংসের মতন এমন কিছু না হলেও মন্দ কি?—বেঁচে আছি বলেই তো দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কালে এই বয়েসটায় পুণ্যি-পুকুর, সেঁজুতি এই সব নিয়ে থাকতাম, আজ বৌমারা যেমন দেরির জন্যে এদের তাড়া দিচ্ছেন, তখন নাইতে, ফুল তুলে আনতে দেরি হলে মা-জেঠাইমারা আমাদের সেই রকম তাড়া দিতেন···"

ওদের মধ্যে থেকে দুষ্টামির প্রশ্ন হয়—"কোন্‌টা ভালো গিন্নি ?"

গিরিবালার দৃষ্টি একটু স্বপ্নালু হইয়া আসে, বলেন—"ভালো মন্দের বিচার করা শক্ত, তবে আমার তো মনে হয়ই যে, আবার যদি জন্মাতেই হয় তো যেন বেলেতেজপুরের মতন কোন জায়গায় এই বয়েসটার পুণ্যি-পুকুর, সেঁজুতি নিয়েই থাকি ! সে যে আবার কি ছিল তোদের বোনেরা তো জানতে পারছে না।"

কথাটা মিথ্যা নয়, এমন কি বাড়াইয়াও বলা নয়, কেন না, নিজের অতীতের মতো এত মিষ্ট আর কিছুই লাগে না মানুষের কাছে। কিন্তু এ ধরণের দৃশ্যগুলিও গিরিবালা সম্পূর্ণ প্রীতির চক্ষেই দেখেন। শুধু প্রীতিই নয়, চোখে লাগিয়া থাকে একটা বিস্ময়।....ও-পাড়ায় মিত্তিরদের বড় ছেলের বিবাহ হইল, বউটি বি-এ পাস। 'বিবি বউ বিবি বউ'—সহরে একটা রব পড়িয়া গেল। একদিন গিয়া দেখিয়া আসিলেন। আজ-কাল বিয়ের কনের বয়স হইয়া যাইতেছে—গিরিবালার চোখে একটু একটু করিয়া সহিয়া আসিতেছে, তবে ওঁদের সে-যুগের পক্ষে তো কল্পনাতীতই। এ-মেয়েটি যেন আরও বড়, বছর কুড়ি তো বটেই। ঘোমটাটানা বউয়ের জড়ানে-জড়ানে ভাব অবশ্য মোটেই নাই—ওঠা-বসা-চলা সব তা'তেই একটা সপ্রতিভ স্বচ্ছন্দতা, কিন্তু, কৈ, বিবিয়ানা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার ধার দিয়াও তো যায় না, বাড়ির মধ্যে তো এতটুকু বে-মানান নয়। বেশই তো লাগিল গিরিবালার, এই নূতন যুগটিই যেন চারি দিক দিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে মেয়েটিকে। তাঁহার সম্ভ্রম এতটুকু নষ্ট করিল না, নিজের হায়ায় এতটুকু অপচয় হইতে দিল না, অথচ দিব্য মানানসই করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া গেল, এতটুকু বাচালতা না করিয়া অনেক রকমই গল্প করিল। বেশ অনেক কিছু জানে, তবে জানে যে এটা জানাইবার এতটুকু চেষ্টা নাই। সব চেয়ে গিরিবালার মিষ্ট লাগিল মেয়েটি ওঁর ছেলের লেখা বই পড়িয়াছে ; যাহার বই পড়িয়াছে তাহারই মায়ের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে—এর আনন্দটুকুর যেন থৈই পাইতেছে না মেয়েটি, এই বিস্ময়টুকু শেষ পর্যন্ত যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

মনে বেশ একটি মিষ্ট স্বাদ লইয়া ফিরিলেন গিরিবালা। বিশেষ করিয়া ছেলের লেখা লইয়া যে ব্যাপারটুকু সেটা লাগিল বড় চমৎকার। মানুষের একটা অহমিকা থাকেই, মেয়েটি বড় কোমল একটি স্পর্শ দিয়াছে তাহাতে ; গিরিবালা ভাবেন—এরা শিখিয়াছে, পাঁচ রকম পড়িয়াছে, বোঝে, তাই তো এদের কাছে তাঁহার এই মর্যাদা।... বাড়িতে আসিয়া নিজেই এক সময় ওপর-পড়া হইয়া প্রসঙ্গটা তুলিলেন, নিজেদের যুগটাকে একটু খাটো করিয়া দিয়াই

বলিলেন—"তা যখনকার যেটা দোষ সেটা বলতে হবে বৈ কি—আগেকার বউ দেখা সে যেন একটা একঘেয়ে কাণ্ড ছিল বাপু, এক ফোঁট্টা একটি মেয়ে কলের পুতুলের মতন চোখ বুজে বসে আছে, জবুথবু ঘোমটাটি তুলিয়ে 'বাঃ বেশ, দিব্যিটি' বলে গোটা কতক বাঁধা বুলি আওড়ে যাও, না কোন কথা, না কিছু। তার চেয়ে এ একটা মানুষের মতন কাছে এসে বসল, পাঁচটা কথার উত্তর দিলে, নিজেও পাঁচটা ভাল-মন্দ কথা তুললে, দিব্যি হাসি-হাসি ভাব, অথচ যে বেহায়াপনা বলব তাও নয়, আমার তো বেশ লাগল বাপু, চমৎকারটি···"

সত্যই বউটি এই নূতন যুগেও যেন একটি নূতন আলোক-সম্পাৎ করিয়াছে। গিরিবালার মনটা চিরদিনই দেশ-কালের সব রকম সঙ্কীর্ণতার ওপরে। কোথাকার মেয়ে, কোথায় বধূ হইয়া আসিলেন, কোথায় আবার জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে চলিয়াছে,—এ-ধরণের মানুষ জীবনকে ছোট ছোট গণ্ডি দিয়া মাপিয়া চলিতে শেখে না ; তবুও মেয়েটি এ যুগের ওপর বিশেষ করিয়া একটা নূতন শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছে। ভাষা দিয়া ঠিক মতো প্রকাশ করিতে পারেন না, তবে বোঝেন ভাষা এদের এবং প্রসঙ্গ উঠিলে চেষ্টাও করেন নিজের অনুভূতিটাকে গুছাইয়া সামনে ধরিতে। মেয়েদের লেখাপড়ার এই বাড়াবাড়ি লইয়াই এক দিন শশাঙ্ক বলিলেন—"জীবন যদি মাটির ঢেলার মতন এক জায়গায় পড়ে থাকবার জিনিষ হোত তো তোমাদের সময় যা ছিল আজও তাই হোত মা ; কিন্তু জীবন যে সচল, চলবার জন্যেই তাকে নতুন সময়ের মতন করে নতুন পথ সৃষ্টি করতে হবে।"

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া যেন মনে মনে কি মিলাইয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন—"সে তো বটেই। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানিস ? —রাস্তাটা যাতে শুধু চলবার যুগ্যিই না হয়ে খানিকটা সুন্দরও হয় সেদিকে আজকালকার সবার নজর একটু বেশি। ভুল-ভ্রান্তি যে না হচ্ছে এমন নয়···· কিন্তু ভুল-ভ্রান্তিই তো বড় ক'রে ধ'রে থাকবার জিনিষ নয়···"

নব-যুগের চিন্তাধারার আরও নূতন নূতন গতিপথ আছে :

মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই। ছেলেবেলায় যে-ইংরাজের অত গুণগান শুনিতেন, পাণ্ডুলের যুগেও যাহারা অপযশের মধ্যেও একটা সম্ভ্রমই জাগাইয়া গেছে, নবযুগের যাচাইয়ে তাহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে শত্রু। দ্বারভাঙ্গা-বাসের প্রথম অংশে বাংলায় যে হাওয়াটা উঠিল সেটা এখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।··· কত অত্যাচার, কত আত্মবলি ! অন্তঃপুরে এক-আধটু যা' ঢেউ আসে তাহাতে ভয়ই হয়, যদিও হয়তো কৌতূহল মিশ্রিত একটা প্রশংসাও থাকে। ভয়,—এত

কষ্ট করিয়া ছেলেদের মানুষ করা—কখন কাহার গায়ে এ বাতাসের ঢেউ লাগে কি বলা যায় ?····এই সময়ই এক দিন হঠাৎ খবর আসিল হরেন কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। এম্, এস্-সি পড়িতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই প্রথম ছেলে যে এম্, এস্-সি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল, গিরিবালা মস্ত বড় একটা আশা পোষণ করিয়াছিলেন, খুব রূঢ় আঘাতই পাইলেন। শৈলেনের পর ছেলের কাছ থেকে এই দ্বিতীয় আশাভঙ্গ।····বিপিনবিহারী বাড়ি ছিলেন না, শশাঙ্ক শৈলেনও কর্মস্থান থেকে ফিরিল সন্ধ্যার সময়। তাহাদের ভয় মায়ের জন্যই বেশি ; গিরিবালা কিন্তু ততক্ষণে দুঃখ-দুর্ভাবনার পালা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, শশাঙ্ক প্রসঙ্গটা তুলিলে তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"ভুল করে ফেলেছে ছেলেমানুষ—চাকরি-পড়া-ছাড়ার কেমন একটা ঢো উঠেছে···" একটু হাসিয়া বলিলেন—" তোরা দু'জনে এ ভুল না করলেই হোল।"

শশাঙ্ক বিরক্ত হইয়াছিলেন, কি ভাবে বুকের রক্ত দিয়া গড়া সংসার বাবা-মা'র পর এক তিনিই জানেন, বলিলেন—"আমরা চাকরি ছাড়লে আর ও বাবুর হুজুগে মাতবার অবসর হবে কোথা থেকে মা ?"

এ-কথাটুকু বাহির করা দরকার ছিল, গিরিবালা নিশ্চিন্ত হইলেন ; বলিলেন —"কড়া করে কিছু তারে লিখিস্‌নি যেন বাবা। উঠেছে একটা হাওয়া, যদি না-ই চায় আর পড়তে ও। আমার মন কি বলছে জানিস্ ?—ওর ভাল হবে।"

শশাঙ্ক একটু বিস্মিতই হইলেন। তিনি তো এই ধরণের একটা কিছু আশঙ্কাই করিতেছিলেন, মনটা কতক প্রস্তুত ছিল ; মা'রই বরং ভাঙিয়া পড়িবার কথা। বলিলেন –"ভাল হয়, ভালোই। কিন্তু মন তোমার এমন অদ্ভুত কথা বলে কি করে বুঝি না তো মা।···দু'টো মাস গেলে পাস করে বেরুত ও।"

এত বড় আশার উৎস যে কোথায় সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাধে গিরিবালার ; একেবারে মর্মস্থলের বস্তু, গোপনেই রাখিতে ইচ্ছা করে। খবর-টুকুর প্রথম আঘাত কাটাইয়া উঠিবার পর থেকেই গিরিবালা বিকাশ দাদার কথাই ভাবিয়াছেন মনে মনে। রাজনীতি, সমাজনীতি অত কিছু না বুঝুন, এটা বুঝিতে পারেন হরেন যাহা করিয়াছে তাহার সঙ্গে বিকাশ দাদার আদর্শের একটা মিল আছে। বিকাশ দাদা সে যুগের বি-এ ছিলেন, ভালো চাকরির সুযোগ আসিয়াছিল কয়েক বারই, কলিকাতার বড় সওদাগরী আফিসে, কিন্তু যান নাই। একবারকার কথা মনে আছে, বলিলেন—"গিরি, ওরা বেণে হয়ে এসেই যে ধাপ্পাবাজি করে আমাদের দেশটা হাতে করেছে এ-আক্রোশ আমার

যাবার নয়, আমি বেণে-ইংরেজের গোলামি করতে পারব না।" ওই কথাটাকেই আজ এরা ফলাও করিয়া বলিতেছে—স্কুল-কলেজের নাম দিয়াছে গোলাম তৈয়ার করিবার কারখানা। যদি দিয়াই থাকে ছাড়িয়া হরেন তো এমন কি হইয়াছে তাহাতে ?....বিকাশ দাদা উপর থেকে আশীর্বাদ করিবেন।....ভয়ও হয় হরেন যদি আরও মাতামাতি করে, জেলে যায়! গিরিবালার মনে যে সুরটুকু ধ্বনিত হইয়াছে সেটা অত উদাত্ত হইয়া উঠিতে পারে না, বাঙালী গৃহস্থ-জননীর মনই তো। তবু ভয়টুকু যে একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন না এমন নয়, পরিণামটা আরও ঊর্ধ্বে এক জনের হাতে ছাড়িয়া দেন, মনে মনে বলেন—"যায় তখন ভগবান আছেন, করছিই বা কি আর ?"

এই এখন গিরিবালার জীবন; নিজে আছেন নিজের পুরাতন আসনটিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেখানে থাকিয়াই দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিয়া গেছেন।....শৈলেন এক দিন লীনাকে চিঠিতে মায়ের কথার প্রসঙ্গে লিখিল—"সব চেয়ে অপূর্ব জিনিষ যা মায়ের মধ্যে এখন দেখছি লীনা, তা এই যে মা আমাদের সবাইকে যে বিস্ময় আর আনন্দের মধ্যে বুকে তুলে নিয়েছেন, আজ পরিবর্তিত জগতের যত নূতন আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা সেগুলোকেও ঠিক সেই বিস্ময় আর আনন্দেই মনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। ভেবে কূল পাই না কি করে সম্ভব হোল এটা। মা শিক্ষিতা নন যে-অর্থে তোরা শিক্ষিতা; তাহ'লে কি মায়ের জীবনের গতিরই এইটে স্বাভাবিক পরিণতি? সেই গতির মধ্যেই বা এমন কি বিশেষত্ব ছিল?—মায়ের মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিষ যা আমার চোখে পড়েছে তা হচ্ছে তাঁর প্রসন্নতা। তার গভীরতায় এত শক্তিই কি লুকানো থাকতে পারে ?

আমি দেখছি যতই দিন যাচ্ছে মা যেন আরও বড় করে মা হয়ে উঠছেন! আগে, জীবনের এক স্তরে ছিলেন মাত্র আমাদের জননী, এখন নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস—অর্থাৎ মানুষের মনের যত নবজাতক—সে সবকেও কোল দিয়ে মা যেন ছোট মাতৃত্ব ছাড়িয়ে আর একটা বড় মাতৃত্বে পরিণত হয়ে চলেছেন। মায়ের যত অনুপ্রেরণা সব বিকাশমামার কাছ থেকে পাওয়া—তা তুই জানিস্; কিন্তু মনে হয় তিনিও কখন এ-পরিণতি কল্পনায় আনতে পারেননি।"

২

একটি তৃপ্ত নির্বিরোধ জীবন-প্রবাহ; নিজের অটুট শান্তিতে সংসারের উপর দিয়া যেন একটি আশীর্বাদের মতো বহিয়া চলিয়াছে।

এই তৃপ্তি, এই শান্তির গোড়ায় গিরিবালার জীবনের গঠন-বৈশিষ্ট্য ছাড়া কিন্তু আরও একটা বড় কথা আছে—তিনি উত্তর-জীবনে কোন অতি-রূঢ় আঘাত পান নাই। দুঃখ-অনটনের কথা বাদ দেওয়া যায়, তাহারা তো শত্রুরূপে আসিয়া মিত্ররূপেই বিদায় লইয়াছে, প্রথম জীবনে এক অহিভূষণের কথা বাদ দিলে মৃত্যু পর্যন্ত ওঁর কাছে আসিয়াছে নিতান্ত স্বাভাবিক রূপেই : পিতা, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা, শ্বশুর, শাশুড়ি আরও সবাই যাঁহারা গেছেন এক রকম সময়েই গেছেন। অকাল বা আকস্মিকতার উগ্র ভীষণতায় মৃত্যু গিরিবালার জীবনে দেখা দেয় নাই। এ দিকে, জীবনের কোন না কোন সময় মনে মনে যাহা কামনা করিয়াছেন—ধন, জন, সম্পদ—কে যেন অঞ্জলি ভরিয়াই দিয়া গেছে।....সব ভালো হইলেও কিন্তু এ ধরণের যাহার জীবন সে কোন আকস্মিক সুকঠোর আঘাত বা তাহার সম্ভাবনার সামনে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার জীবনের গতিই একেবারে বদলাইয়া যায়। গিরিবালার এই প্রশ্রয়-পাওয়া জীবনেরও শেষের দিকে খানিকটা সেই অবস্থা দাঁড়াইল :

মাঘ মাসের পয়লা। কয়েকদিন হইতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, রাত্রে আর সকালের খানিকটা পর্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে, কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়া যেন হাড় পর্যন্ত বিঁধিয়া দেয়। বেলা প্রায় দুইটা ; খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গিরিবালা একটি নাতিকে কোলে লইয়া উপরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দোতলার পাশে একটা খোলা ছাত, শীতের দুপুরে এটুকু একটি পরম আশ্রয়, কয়েক দিন থেকে যেন আরও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বড় বধূর নিকট হইতে পান লইয়া উঠান হইতে ছাতের দিকে পা বাড়াইবেন হঠাৎ গুম্‌-গুম্‌ করিয়া একটা শব্দ কানে গেল। একটু দূরেই রেলের মাল-গুদাম, কখনও কখনও ভারি বোঝা ফেলিবার জন্য এই ধরণের শব্দ ওঠে, পাশে রেলের প্রাঙ্গণ, সেখানেও শান্টিঙের সময় গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ওঠে একটা শব্দ মাঝে-মাঝে। এটা কিন্তু ওরই মধ্যে একটু অন্য ধরণের, ব্যাপক, একটা চাপা গ্যাঙানির মতো। নাতিকে কোলে লইয়া গিরিবালা ভ্রূ কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উপরের একটা ঘরে হরেন শুইয়াছিল, একটু বিস্মিত ভাবেই হাঁক দিয়া প্রশ্ন করিল—"মা, আওয়াজটা কিসের বলো তো ?"....শব্দের প্রকৃতিটা বুঝিতে আর হরেনের প্রশ্নে বোধ হয় আধ মিনিটও গেল না, ইতিমধ্যে গ্যাঙানিটা বাড়িতে বাড়িতে যেন চরমে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকট ঝাঁকানি।

"মা, ভূমিকম্প না কি?" বলিয়া হরেন খাট হইতে নামিতে গিয়া মেঝেয় পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ভূমিকম্প! বাইরে বেরিয়ে পড়ো সব!...." সন্দেহের আর তখন নাইও কিছু, সমস্ত সহর কাঁপাইয়া উৎকট আর্তনাদ..."ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!.... কেয়ামৎ!... নিকলো!.... বাহার আও!..." বিপিনবিহারী বাহিরের ঘরে ছিলেন, ছুটিয়া উঠানে নামিয়া চীৎকার করিতেছেন, সবাইকে বাহির করিতে যাইতেছেন—টলিয়া পড়িতেছেন—মেয়েরা ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া বাহিরে পলাইতে যাইয়া পা মুড়িয়া পড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে অসহায় ভাবে চীৎকার....সব চেয়ে ভীষণ মাথার উপর দোতলাটা—হরেন রেলিঙের ধারে ছোট ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া আর সবাইকে বাড়ি ছাড়িবার জন্য গলা ফাটাইয়া নির্দেশ দিতেছে; নিজে সম্পূর্ণ নিরুপায়, অগ্রসর হইবার কয়েক বার চেষ্টা করিয়া আছাড় খাইয়া এক হাতে ছেলেটি, অন্য হাতে রেলিং চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, কোলে নাতি, উপরে ছেলে আর নাতির ঐ অবস্থা—একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া "ভগবান বাঁচাও! হে ভগবান বাঁচাও!" বলিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। এ দিকে মনে হইতেছে, তিনখানা ঘর আর টানা বারান্দা সুদ্ধ সমস্ত দোতলাটা উঠানের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আবার সোজা হইয়া উঠিতেছে—যে কোন মুহূর্তে চুর-চুর করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া সব একাকার করিয়া ফেলিবে।.... নিচের আর সবাই কোন রকমে বাহির হইয়া পড়িল—টানিয়া বাহির করিতে বিপিনবিহারী কয়েক বারই আছাড় খাইলেন, পাগলের মতো উপরের পানে ছুটিয়া যাইবেন, এমন সময় সেই উৎকট ঝাঁকানি হঠাৎ থামিয়া গেল। "আপনি আসবেন না—কোন মতে না!" বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে বিপিনবিহারীকে যেন ধমক দিয়া আদেশ করিয়া—হরেন নামিয়া পড়িয়া মাকে এক রকম টানিতে-টানিতে বিপিনবিহারীকে পর্যন্ত জাপটাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমেই হিসাবের পালা; বড় সংসার, অনেকগুলি কচি-কাচা, উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের মধ্যে মিলাইতে কয়েক বারই গোলমাল হইল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সকলেই বাহির হইয়াছে, একটু-আধটু হয়তো কাটা-ছড়া ব্যতীত এক রকম অক্ষতই।....বাড়িটা?....দুই মিনিটের ভূমিকম্প—তাহার আগে পর্যন্ত ছিল পরম আশ্রয়, এখন আর কাছে যাইতে সাহস নাই কাহারও। দু'টি মিনিটেই পৃথিবীতে সব ওলট-পালট হইয়া গেছে—ঐ পরম মিত্র এখনই তো চরম শত্রুতা করিতে পারিত—এখনও তো পারে!

তাই হইয়াছেও। নিজেরা বাঁচিয়া বাহিরের দিকে নজর দিবার ফুরসৎ হইল—পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—সহরের চারিদিকেই গগনভেদী আর্তনাদ—সমস্ত আকাশ ধূলায় সমাচ্ছন্ন, এখনও ধূলার নূতন নূতন স্তম্ভ আকাশে উঠিতেছে, বাড়ি-পড়ার শব্দও মাঝে-মাঝে ভাসিয়া আসে—এখনও; এ ওর মুখের পানে চায়, এত অতর্কিত—এত অল্প সময়—কেহ যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছে না, বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কোলের কাছটা একটু সামলানোর সঙ্গে সঙ্গেই দূরের কথা মনে পড়িল—শশাঙ্ক, পূর্ণেন্দু, অরু আফিসে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে—কেমন আছে তাহারা—আছে তো ?····চিন্তার মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস যেন জোট পাকাইয়া গেছে····মনে পড়িল শৈলেনের কথা—একটা কর্ম উপলক্ষে পাটনায় গেছে—সেখানকারই বা কি অবস্থা ?···

বিপিনবিহারী মাথার ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না; কোথায়, কাহার কাছে যাইবেন ? এক রকম জ্ঞানশূন্য হইয়াই ছুটিয়া বাহির হইবেন, হঠাৎ পাশের শুক্‌নো ডোবাটার পানে নজর পড়িল—গর্ত হইয়া গিয়া তাহার ভিতর থেকে জল আর বালি উঠিতেছে—একেবারে কয়েক জায়গায়! "এ কি সর্বনাশ!" বলিয়া ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার পা বাড়াইয়া রাস্তার ধার পর্যন্ত গেছেন, দেখেন এক দিক্ থেকে পূর্ণেন্দু হন্-হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাবার দিকে চাহিয়া আছে কিন্তু মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না। কাছে আসিয়া কোন রকমে কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া প্রশ্ন করিল—"খবর কি ?"

বিপিনবিহারী কি ভাবিয়া বাড়িটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"কিছু হয়নি—বেঁচে গেছে।···তোমার খবর ?"

সামনে দেখিয়াও ক্ষত কি অক্ষত যেন সন্দেহ মিটিতেছে না। একটা উত্তরে পূর্ণেন্দুরও আশা মিটিতেছে না, প্রশ্ন করিল—"সবাই ?"

"হ্যাঁ, সবাই।···তোমার····?"

"কোন রকমে বেঁচে গেছি, কি করে যে তা বুঝতে পারছি না; বাইরে খোলা একটা রকে এসে দু'জনে দাঁড়ালাম—পেছনে যে একটা উঁচু দেয়াল আছে হুঁস নেই—চালুনির মতন জমিটা কে যেন চালাচ্ছে—হঠাৎ পেছন থেকে আমায় কে যেন একটা কড়া ধাক্কা দিলে—ছিটকে সামনে জমির উপর মুখ থুবড়ে পড়লাম—ফিরে দেখি দেয়ালটা পড়ে গেছে, পাশের লোকটা একেবারে তার মধ্যে শেষ।····

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

"অ্যাঁ—কোথায় ?....তুমি তো এসে গেছ, শশাঙ্ক, অরু....ছেলেমেয়েরা স্কুলে রয়েছে—খবর পেয়েছ কিছু ?"

"না....ঐ তারা আসছে, সবাই আছে—ও-বাড়ির ছেলেরাও..."

বিপিনবিহারী ঘুরিয়া দেখিলেন দূরে স্টেশন-রাস্তার মোড়ে ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, মেয়ে দু'টি একটু পিছনে, একটু পা নরম করিল, তাহার পর আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। বিপিনবিহারী অগ্রসর হইলেন। পূর্ণেন্দু আবার প্রশ্ন করিল—"কোথায় চললেন ?"

"লাহেরিয়াসরাই—শশাঙ্ক, অরুকে দেখি...."

"যাবেন না, পায়ের নিচে জমি ফাটছে এখনও...."

তাহার পর যাওয়াটার গুরুত্ব বুঝিয়া বলিল—"বরং ফিরুন বাবা, আমি যাচ্ছি—এই তিন মাইল পথ আপনি..."

বিপিনবিহারী ততক্ষণে অনেকটা চলিয়া গেছেন, ফিরিয়া হাতটা উঁচাইয়া বলিলেন—"একটা এক্কা ধরে নোব, তুমি বাড়িতে থাকো। তোমার গর্ভধারিণী কি রকম যেন হয়ে গেছেন, একটু লক্ষ্য রেখো।"

উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথ বাহিয়া চলিলেন, শক্তি শুধু এই একটা ক্ষীণ সান্ত্বনায় যে, ভগবান যখন এদিকে সবাইকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন, ও-দুজনকেও নিশ্চয় দিবেন বাঁচাইয়া, সমস্ত বুকের জোর এই সম্ভাবনাটুকুর মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন। একটা এক্কা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, থামিবার হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া তেমনি তীরবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পথে আরও এক্কা, ঘোড়ারগাড়ি দেখা গেল, ছুটিয়া আসিতেছে, অথবা তাঁহার দিক হইতে যাইতেছে, কোন চালক কথার একটা উত্তর দিলে, কেহ বা দিলে না ; চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে, কেহ উলটিয়া প্রশ্ন করিল—বাবু, অমুক মহল্লার খবর জানেন ? আছে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ? লোকেরা ?...পায়ে-হাঁটা লোকও চলিয়াছে কেহ ছুটিয়া, কাহারও গতি একেবারে মন্দ, ভয়ে আতঙ্কে স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে শিথিল হইয়া গেছে, পা' দুটাকে যেন কোন মতে টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে।...রাস্তার দুই পাশে এখানে, ওখানে, সেখানে গর্ত বাহিয়া জল বালি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে—বীভৎস দৃশ্য—ধরণীর গায়ে যেন দূষিত ব্রণ! আর ফাটল—পূর্ণেন্দু যাহার কথা বলিয়াছিল—লম্বা, গভীর ফাটল হাঁ করিয়া

রহিয়াছে, চাহিয়া দেখিতে ভয় করে, কয়েক স্থানেই রাস্তার এপার-ওপার চলিয়া গেছে—যেটা সব চেয়ে সঙ্কীর্ণ—হয়তো হাতখানেক চওড়া, সেটাকেও ডিঙ্গাইতে যেন সাহস হয় না—কে জানে, পাতাল পর্যন্ত নামিয়া গেছে কি না !....ঝাড়া তিন মাইল পথ কি ভাবে অতিক্রম করিলেন, কতক্ষণ লাগিল, কোন হুঁস নাই—ঐ একটি মাত্র সান্ত্বনা পায়ে শক্তি জোগাইয়া আসিয়াছে—ভগবান যখন এদিককার সবাইকে বাঁচাইয়াছেন—পূর্ণেন্দুকে আবার অমন অদ্ভুত ভাবে—তখন এ দু'জনকে নিশ্চয় দিবেন বাঁচাইয়া !....এক সময় আফিসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিরাট দুই তলা আদালত আফিস, উপর তলাটা কে যেন হাতুড়ি দিয়া চূরমার করিয়া দিয়াছে ; শশাঙ্ক আর অরু দু'জনেই আফিসে ছিল ওরই একটা ঘরে।

বহিঃচৈতন্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বিপিনবিহারীর একেবারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাহার পর আবার একটু হুঁস হইল। ত্রস্ত প্রশ্ন করিতে করিতে আগাইয়া চলিলেন—"শশাঙ্ক বাবুকো দেখা হ্যায়? অ্যাকাউণ্টেণ্ট শশাঙ্কবাবু? উস্‌কা ভাই অরুবাবু? উৎর গেয়া-থা উপরসে?...." কে কাহাকে উত্তর দেয়! অনেকে প্রতি-প্রশ্ন করিল—অমুকের খবর জানেন?....জজ-মুন্সেফ, আমলা-পিয়ন কেহই নাই, আছে যাহারা তাহারা বাহিরের লোক, ভাই-ছেলে-আত্মীয়ের খোঁজে আসিয়াছে—মুখে তীব্র আতঙ্কের ছায়া—অনেকক্ষণ হইয়া গেছে তবুও একটা জটিল কলরব—এক জায়গায় কতকগুলা কুলি তাড়াতাড়ি রাশীকৃত ইট-রাবিশ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেছে। বিপিনবিহারী সেই দিকে ছুটিতেছিলেন এমন সময় একটি বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, সেই প্রশ্ন করিল—"শশাঙ্কবাবুকে খুঁজছেন আপনি?"

"হ্যাঁ....আর অরু, তার ভাই....বেঁচে গেছে?"

ছেলেটি একটু থতমত খাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আপনি হাসপাতালে যান—শীগ্‌গির....অরু বাবুর কিছু হয়নি..."

"আর শশাঙ্কর?"

"আপনি যান হাসপাতালে শীগ্‌গির।"

"কেন?...."

গলা শুকাইয়া আসার জন্যই মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হইল না, বিপিনবিহারী এবার ছুটিলেন। খানিকটা দূরে আদালত তাহার বাহিরেই হাসপাতাল,

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন আর্তনাদ তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। গবর্ণ-মেণ্টের বিরাট হাসপাতাল, সমস্ত চূরমার হইয়া গেছে। এখানে-ওখানে মৃতদেহ, অনেক আহতও, জায়গায় জায়গায় ইট-রাবিশ সরানয় কুলি লাগিয়া গেছে। চরম অবস্থায় বিপিনবিহারীর যেন যৌবনের সেই শক্তি আর স্থৈর্য হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে তীব্র সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে আগাইয়া চলিলেন, সব কিছু দেখিবার জন্য মনটাকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। একটু অগ্রসর হইয়া এক সময় একেবারে থামিয়া পড়িলেন। ডান দিকে একটু দূরে একটা গাছ-তলায় অরু গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। সামনেই শয়ান অবস্থায় শশাঙ্ক। অরু কতকটা পিছন ফিরিয়া ছিল। পিতাকে হঠাৎ দেখিয়া ক্ষণমাত্রের জন্য যেন হকচকিয়া গেল, তাহার পর একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় শশাঙ্ক খুব স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া একবার ঘাড়টা ফিরাইলেন। বিপিনবিহারী মুখটা নামাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় লেগেছে?"

শশাঙ্ক উত্তর দিতে পারিলেন না; ক্ষণিক চৈতন্য আসিয়াছিল, বোধ হয় চেনেনও নাই; চোখ দুইটাও তখনই আবার বুজিয়া গেল। অরু এতক্ষণ অসহায় ভাবেই বসিয়াছিল, বাবাকে দেখিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কান্নার মাঝেই বলিল—"ঘাড়ে-পিঠে সর্বত্রই—বাঁ হাতটায় বড্ড বেশি চোট..."

বিপিনবিহারী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আকারে বলিলেন—"ডাক্তার....জল একটু?"

অরু ব্যাকুল ভাবে বলিল—"ছেড়ে উঠতে পারছি না—একটা এক্কা এইটুকু এনে দিয়ে চলে গেল—ডাক্তার কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, নেই বোধ হয়...."

"থামো"—বলিয়া বিপিনবিহারী চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া এক দিকে ছুটিলেন; ফাটলের মধ্যে দিয়া দূরে এক জায়গায় একটু জল জমিয়াছে, রুমালটা ভিজাইয়া আনিয়া মুখে ভালো করিয়া জল ছিটাইয়া দিলেন, তাহার পর হাঁ করাইয়া মুখের মধ্যেও দিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন; এত দিনের চেনা ধরিত্রীর উপর হঠাৎ বিশ্বাস হারাইয়া গেছে, কে জানে, জলের আকারে বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছে কি না!

অরুকে বলিলেন—"তুমি একবার দেখো—ডাক্তার কম্পাউণ্ডার যে কেউ এক জনকে পাও—ফার্ষ্ট এডের যা কিছু একটু নিয়ে...."

মিনিট দশেক পরে অরু একজন কম্পাউণ্ডারকে লইয়া আসিল, তাহার হাতে ভাঙ্গা শিশিতে একটু টিংচার আয়োডিন মাত্র, আর কিছুই নাই। শশাঙ্কর

একটু একটু চৈতন্য হইতেছে, তবে থাকিতেছে না। সর্বাঙ্গে আঘাত। একটু একটু করিয়া আয়োডিন লাগাইয়া কম্পাউণ্ডার হাতটা যতটা পারিল ঠিক করিয়া দিয়া অরুর দেওয়া ছেঁড়া কাপড়ের ফালি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল; বলিল—"যত শীগ্‌গির পারেন বাড়ি নিয়ে গিয়ে কোন ডাক্তারের হাতে দিন···· অনেক চোট····কয়েকটা সিরিয়াস্‌····"

বিপিনবিহারী বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় পাই ডাক্তার?"

অরু পাগলের মতো একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"একটা এক্কাও যে····"

কম্পাউণ্ডার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"ওটুকুর বেশি আর কিছুই বলতে পারছি না আমি—এখানে আর কোন রকমই সাহায্যের উপায় নেই—ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের মধ্যে কে আছে, কোথায় আছে, কিছু জানি না····যাই, ঐ আবার দু'টোকে টেনে বের করেছে—কেনই যে করা····আচ্ছা, নমস্কার।"

বিলম্বের জন্য একটা উদ্বেগ লাগিয়া আছে, তবুও গিরিবালা অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত আছেন। পূর্ণেন্দু বুদ্ধি করিয়া নিজের বাঁচিয়া যাওয়ার ইতিহাসটা আর জানায় নাই। স্কুল থেকে নাতি-নাতনিরাও অক্ষত শরীরে ফিরিয়াছে। বাড়ির ভিতর যাওয়া যাইতেছে না, তবুও বাহির হইতে মনে হয় গোটাই আছে বাড়িটা। চারিদিকের ধ্বংসের মধ্যে এই নিরাপত্তায় মনে হয় তবে বোধ হয় ভগবান করিলেনই রক্ষা। দু'মিনিটের মধ্যে এমন একটা খণ্ড-প্রলয়—যাঁহার এই লীলা তাঁহার ভৈরব রূপের সামনে গিরিবালা যেন অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তবু তাহারই মধ্যে সমস্ত মনটি আবার কৃতজ্ঞতায় ভরপূর। অতি-বিরাটের সামনে অতি-অসহায়ের কৃতজ্ঞতা তোষামোদেরই রূপ লইয়া ওঠে ফুটিয়া····হে হরি, তোমারই তো সব, বাঁচিয়েছ, তোমার পায়ে লক্ষ-কোটি প্রণাম জানাচ্ছি—ভালোয় ভালোয় এখন শশাঙ্ক আর অরুকে ঘরে ফিরিয়ে এনে দাও—আর, তুমি আনবেই ফিরিয়ে, এত কাণ্ডর মধ্যেও তোমায় দয়াল বলে সবাই···

এই রকম কৃতজ্ঞ চিন্তার মধ্যেই প্রায় সন্ধ্যার সময় শশাঙ্ককে অচৈতন্য অবস্থায় এক্কা হইতে নামাইয়া আনা হইল।

প্রচুর শান্তির মধ্যে, প্রবল বিশ্বাসের মধ্যে অতর্কিত এই আঘাতটা গিরিবালাকে যেন সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত করিয়া দিল—অহির মৃত্যুর চারি

দিকের দিনগুলি আসিল ফিরিয়া, শুধু আরও পরিপক্ক বিশ্বাসের মধ্যে বলিয়া আরও উগ্র ভাবে। কথা অল্প হইয়া আসিল, একটা আতঙ্ক, একটা অবিশ্বাস—মনের ভাবটা যেন এই যে, এত করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িয়া তো ভাল করেন নাই—এদিকে কোলের কাছে এই অবস্থায় শশাঙ্ক, ওদিকে এক শত মাইল দূরে শৈলেন—রেল-ডাক-টেলিগ্রাফ বন্ধ, একেবারেই কোন খবর নাই। এই অবস্থায় পনেরটা দিন কাটিয়া গেল—সেই সময় যখন একটা প্রহরকে একটা যুগ বলিয়া মনে হয়। পনের দিন পরে শৈলেন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল—রেল সমস্তটা খোলে নাই, পথ বিপজ্জনক, খানিকটা রেলে খানিকটা এক্কায় আসিয়াছে, খবর কিছুই দেওয়া সম্ভব ছিল না, বাড়ির খবর জানেও না কিছু। দেখে, বাড়ি থেকে দূরে খড়ের চালা করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে পরিবারের সবাই। মা শশাঙ্ককে কোলে লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন। শশাঙ্ক অবশ্য তখন অনেকটা সুস্থ, বিপদের গণ্ডিটা পার হইয়া গেছে।

মায়ের মুখে কিন্তু তখনও রাজ্যের ক্লান্তির সঙ্গে একটা যেন তীব্র আতঙ্কের ছাপ। শৈলেনকে দেখিয়া মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু খুব যে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন এমন মনে হইল না। চোখে বারংবারই একটা অভিমানের অশ্রু ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া লইতে লাগিলেন। শান্ত প্রশ্ন আর গল্প-গুজবে রাত্রিটা শেষ হইয়া গেল।

কয়েক দিন পরের কথা,—শশাঙ্ক যখন ভাল হইয়া গেছেন। এক দিন গল্প-প্রসঙ্গে শৈলেনকে প্রশ্ন করিলেন—"মা'র ভাবটা লক্ষ্য করেছিস ?"

শৈলেন বলিল—"হ্যাঁ দাদা, একটু ছাড়া-ছাড়া নয় কি ?"

শশাঙ্ক একটু মাথা নাড়িয়া হাসিয়াই বলিলেন—"ঠিক তাই। মা আমাদের সবার ওপর একটু চটে গেছেন বলা চলে....."

শৈলেন অবশ্য সে রকম কিছু পরিচয় পায় নাই, একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল—"চটে গেছেন ? তার মানে ?"

শশাঙ্ক এবার আর একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন—"তার মানে কে জানে, আমরা সবাই হয়তো অহির অভিসন্ধি নিয়ে বসে আছি, যে কোন সময় দাগা দিতে পারি। ভূমিকম্পে আমার এত-বড় একটা ফাঁড়া গেল—পিওর এক্‌সিডেণ্ট, কোনই হাত নেই আমার,—মা কিন্তু ঐ অর্থ দাঁড় করিয়ে বসে আছেন। আমিই যেন ইচ্ছে করে এত-বড় একটা তোড়জোড় করে ওঁকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম! হাসব কি কাঁদব তাই বল্ না।"

৩

ক্রমে ধীরে ধীরে এই আতঙ্কের ভাবটা মিলাইয়া আসিল। শুধু মিলাইয়া আসা নয়, মুখচ্ছবি হইয়া আসিল আগের চেয়ে প্রশান্ত,—একটা স্বচ্ছ সরোবরের ঝড়-ঝঞ্ঝায় সাময়িক বিক্ষোভের পর সামান্য বীচিভঙ্গটুকুও বিলীন হইয়া গেছে; এখন তাহার উপর পড়িয়া আছে নীল আকাশের একটি শান্ত প্রতিচ্ছায়া।

তাহাই হইয়াছে,—কোন্ অনন্ত-অসীমের প্রতিচ্ছায়াই পড়িয়াছে গিরিবালার সমস্ত সত্তাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া। আতঙ্কে ওদের প্রতি আসিয়া গিয়াছিল ক্ষুদ্র অবিশ্বাস, এখন কাহার উপর পরম নির্ভরতায় একটা অটল বিশ্বাস আসিয়া সেই জায়গাটি পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

আজ-কাল নাতি-নাতনি বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজবের সময়—বিশেষ করিয়া গল্পগুজব যখন খুব জমাট, কলহাস্যে উচ্ছল, গিরিবালা মাঝে মাঝে যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া যান, কাহারও দিকে থাকেন চাহিয়াই, মুখে হাসিও থাকে লাগিয়া, কিন্তু সে দৃষ্টি আর হাসিতে এক নূতন আলো পড়ে আসিয়া,—মনে হয় এরা যাঁহার দান, এদের অতিক্রম করিয়া গিরিবালার মন একেবারে তাঁহারই সামনা-সামনি গিয়া পড়িয়াছে। এটা সর্বদাই যে হয় তাহা নয়, স্থায়ীও হয়না—যখন হয়, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তেই যায় মিলাইয়া। কিন্তু এ নব জিনিষের মাপকাঠি তো স্থায়িত্বই নয়, এক মুহূর্তেই কত সুদূরের পাড়ি যে দিতে পারে মন তাহার হিসাব কেই বা পারে রাখিতে?

শৈলেন এক দিন শশাঙ্ককে কথাটা বলিতে শশাঙ্ক বলিলেন—"আমি লক্ষ্য করেছি শৈলেন, কিন্তু আমি তেমন খুশী হতে পারিনি; অবশ্য নিজেদের দিক্ থেকে কথাটা বলছি।"

শৈলেনকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"অবশ্য আমার মনের একটা সন্দেহের কথা—আমার কেমন একটা ভয় হয় মাকে আমরা হয়তো আর বেশি দিন পাব না—দৃষ্টির ও আলো যেন এখানে টঁ্যাকবার নয় বেশি দিন।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"এর মধ্যে হয়তো সত্যিকার কিছু নেই, তুই নেহাৎ কথাটা তুললি বলেই বললাম,—মনের একটা সন্দেহ কাউকে চেটে দিলে মনটা হাল্‌কা হয় বলে।"

একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাটা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিল,--কিছু কিছু তীর্থও, আবার নিজের যাহারা সেখানে আছে তাহাদেরও। তীর্থের সঙ্গী ভালো,—ননীবালা ; এমনই পূর্ণতার মধ্য দিয়া তিনি এখন জীবনের এই প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ সব দিক্ দিয়া তিনি বেশ দক্ষই। ছাড়িয়া ছাড়িয়া বছর খানেকের বেশ একটা বড় ছক তৈয়ার হইল, শুধু তীর্থ-ভ্রমণেরই, আর যেখানকার সে পরে হইবে। ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরে মানুষে মিশিয়ে দিয়ে চিরকালটা তো একটা জগাখিচুড়ি পাকানো গেল, আর কেন? এবার ওঁদের পাওনাটা আগে মিটিয়ে দিয়ে এসো।"

প্রথম ঝোঁকে মাস তিনেকের একটা ব্যবস্থা ঠিক হইল। কাছাকাছি কয়েকটা ছোটখাট তীর্থ শেষ করিয়া গিরিবালা একদিন বলিলেন—"এবার একবার ঘুরে এলে হয় না বাড়ি থেকে?"

ননীবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বাড়ি! এর মধ্যে কি গো? তিন মাসের ঠিক করে বেরিয়েছি, এখনও দিন দশেকও হয়নি,—হিসেব নেই আমার?"

গিরিবালা মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিলেন।

ননীবালার মুখেও হাসি ফুটিল, সেটা গাম্ভীর্যে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া, চোখ বড় বড় করিয়া বলিলেন—"তিন মাসের ব্যবস্থা যে, ও বৌদি!.... বড় বৌমা বললেন—পিসিমা, মার মনটা যেন উঠে যাচ্ছে সংসার থেকে, আমরা পারি কখনও সামলাতে? আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।....আমি মনে মনেই বললাম—আমার বয়ে গেছে, চিরদিনই মুখ গুঁজড়ে থাকবে না কি সংসারে? সুমতি হয়েছে, এবার বরং একটু বাইরে টেনে নিয়ে যাই।....ওমা, এই তোমার সংসার থেকে মন ওঠা!...ফিরে গেলে ওদের চাপা হাসিই কি করে সামলাবে তাই নয় একবার ভাবো, ঠাকুরের কথা না হয় বাদই দিলাম।"

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালাও যোগ দিলেন, যাওয়াটা স্থগিতও রহিল, কিন্তু দিন চারেক পরে কাছের আর একটা তীর্থ সারার পর ননীবালা বুঝিলেন এ রকম তীর্থ করায় ফল নাই, এ যেন জোর করিয়া টানিয়া ঘুরানো হইতেছে।

ফিরিলেন।

বাড়িতে সবাই খুশী হইল, তবে বিস্মিতও হইল কম নয়। একটু একান্তে পাইয়া বধূরা ননীবালাকেই কারণটা জিজ্ঞাসা করিল। ননীবালা একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৌমা, মনের কথা

পুষে রাখা পাপ—বিশেষ করে ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার নিয়ে। দোষটা অবশ্য তোমার শাশুড়ির ঘাড়েই চাপিয়ে ফিরলাম, কিন্তু আমারই কি মন টেঁকছিল বাছা ?....মিলিয়ে দেখলাম, ও বয়েসকালেই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান চলে, এখন যত যাবার দিন এগিয়ে আসছে ততই যেন ভগবান্ নগদ যেটুকু দিয়েছেন সেইটুকু আঁকড়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তোমার শাশুড়ির ঘাড়ে দোষ চাপালে কি হবে ? দেখলাম তো নিজেও।"

সেজ বৌ বলিল—"তোমাদের সুবুদ্ধি হওয়ায় বাঁচলাম পিসিমা, এবার তোমরা ননদ-জায়ে দিন কতক সামলাও তোমাদের সংসার, আমরা দু'বাড়ির বৌয়েরা মিলে বয়েস থাকতে থাকতে সেরে আসি গোটাকতক তীর্থ এই বেলা।....নিদেন একবার বাপের বাড়ি...."

একটু হাসি পড়িয়া গেল ; বড়বৌ বলিল—"হ্যাঁ, যেও ভাল করে, এসেই গেয়ে রেখেছেন নিজেই বাপের বাড়ি চললেন, মনটা না কি বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। কেমন সেয়ানা বাপের মেয়ে !"

ননীবালা বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ওমা, আর আমায় যে বললে দিন আষ্টেকের মধ্যেই আবার বেরুব গো ! আমার সঙ্গেও এমন লুকোচুরি যদি খেলে তো সে মানুষকে নিয়ে কি করে চলবে।...."

আসল কথা নিজের মনই লুকোচুরি খেলিতেছে গিরিবালার সঙ্গে, কি যে চান কি না চান বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কাছে থাকিলে মনে হইতেছে—আর কেন, এইবার ধীরে ধীরে মুক্ত হই, দূরে গেলে সেই বাঁধনের মায়াতেই টানিতেছে আবার।....কেমন আছে সবাই ? উনি যখন থাকিবেন না—একেবারেই, ওরা সব কেমন থাকিবে ?....দেখিলেন ভালোই আছে, যিনি সব দিয়াছেন, যিনি শশাঙ্ককে দিয়াছেন ফিরাইয়া—তাঁহার দৃষ্টি সজাগ আছে। নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নির্ভরতা আরও গেল বাড়িয়া।

একটা কথা কিন্তু গিরিবালা মনের কাছে গোপন করিতে পারিতেছেন না—বাহিরে বাহিরে সেই দেবতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে যেন মনে সরিতেছে না। মায়া যেন কেমন করিয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে—বেশ তো, যাহারা আপন, যাহারা জীবনের অপরাংশ, তিনি যদি তাহাদের মধ্যেই একটি আলাদা জায়গা করিয়া লইয়া থাকেন তো কাজ কি দূরে দূরে তাঁহাকে এ ভাবে সন্ধান করিয়া ফেরার ?

ননীবালা বলিলেন—"শুনলাম না কি কচি মেয়ের মতন বাপের বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরেছ ?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন— "তোমার এই সহরেই বাপের বাড়ি, আবার এইখানেই শ্বশুরবাড়ি, চিরকালটা তাই কচিই থেকে গেলে, বুড়োর যে আবার কি মায়া তোমায় কি করে বোঝাই বলো ?....না, ঠাকুরঝি, একবার হয়ে আসি, দেখা-শুনো একটু করে আসি একবার; আর তো ডাক আসবার সময় হোল।"

ননীবালা হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সে ভাবনা নেই, এখনও তোমার দেরি আছে ; এমন ভাবে যে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাকে টেনে তুলতে যমের মেহনৎ হয়, সময় লাগে।"

এবারে অনেক দিন পরে আসিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই পারেন আসিতে এখন, কিন্তু ইচ্ছাটাই আর সে-রকম নাই। আসল কথা, মেয়েদের বাপের বাড়ির টান তত দিনই থাকে যত দিন শাশুড়ি থাকে বাঁচিয়া। পণ্ডিতমশাই বলিতেন—"উমা কি পারে না আসতে বাপের বাড়ি? চায় না তাই বছরে ঐ তিনটি দিন এসে একটা ঠাট্ বজায় রাখে।" সেবারে রসিকলাল গুরুর কথার উপর একটু রং ফলাইয়া কন্যাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"আসলে তাও নয় গিরি, তোরা হচ্ছিস্ আবদেরে জাত, আবদার করে না নিতে পারলে তোদের কোন জিনিষ মিষ্টি লাগে না, শাশুড়ি না থাকলে তো আবদার করে আসবার উপায় থাকে না, বাপের বাড়ির দিকে আর তেমন টানও থাকে না তাই।"

অনেক দিন পরে সবার সঙ্গে একসঙ্গে হইল দেখা। ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠিতেছে, নূতন কয়টিও আসিয়াছে, ধীরে ধীরে সংসারটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। একেবারে নূতনের মধ্যে মেজবৌ। আগে যিনি ছিলেন তিনি অনেক দিন মারা গেছেন, তার পর হরিচরণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। সে-ও প্রায় আট নয় বৎসরের কথা, তবে গিরিবালার এর মধ্যে আর আসা হয় নাই।

মন পুরানোকেই খোঁজে, কিন্তু নূতন বধূটি যেন সে অবসরই দিল না। শিবপুরেরই মেয়ে, কিন্তু দেহে বা মনে সহরের একটুও যেন ছোঁয়াচ লাগে নাই। আসিয়া প্রণাম করিয়া দু'-একটা কথার পর এমন একটা সলজ্জ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইল যে গিরিবালার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা মায়া বসিয়া গেল। তবে তাঁহাকে একটু সঙ্কোচেও ফেলিল, দু'-একবার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলেন,

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কি এক যেন অপূর্ব জিনিষ দেখিতেছে। আর সবার সঙ্গে কথা কহিয়া গিরিবালা অপ্রতিভ ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রণাম করিয়াই প্রথম প্রশ্ন—"তোমার নতুন ভাজকে কেমন দেখলে দিদি, আগে তাই বলো।"

গিরিবালা আর একবার দেখিয়া লইলেন, হাসিয়া বলিলেন—"চমৎকারই তো, লক্ষ্মী প্রতিমের মতন; কিন্তু কথা যে বড্ড কম, শিবপুরের মেয়ে অথচ...."

"কম নয়, এর পরে টের পাবে। তবে টপ করে মুখ খুলতে যে চান না তার কারণ...."

"আঃ, ঠাকুরপো!—" বলিয়া মেজবৌ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই কিশোর গিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"সমস্ত সহর উটকে আমরা এক অজ পাড়াগেঁয়ে বের করেছি দিদি। দাদার অসুখে সেবারে দেওঘরে গেলাম না? তপোবন দেখতে গেছি, ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে স্বামীজীর সামনে খানিকটা বসলাম। কথাবার্তা খানিকটা হোল, আরও সব লোক ছিল। স্বামীজী পূজোর জন্যে উঠে যেতে আমরা সবাই তাঁর কথা কইতে কইতে বাড়ি ফিরেছি, মেজবৌদি আমায় একলা পেয়ে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করছেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো, সবাই স্বামীজী স্বামীজী বলছে, উনি কার স্বামী যে এত নাম-করা গা?"

বাড়ির মধ্যে একটা ক্ষ্যাপানে গল্প দাঁড়াইয়া গেছে, সবাই হাসিয়া উঠিতে মেজবৌ আরও গুটাইয়া গেলেন। গিরিবালা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"থাম্ বাপু, তোরা সব এক দিনে পণ্ডিত হয়েছিস। তোকে জিজ্ঞেস করেই ভুল করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, একেবারে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেই ঠিক হোত।"

আর এক তোড়ে হাসি নামিল।

সত্যিই এত অজ্ঞ নয়, আর এ অনেক দিন আগেরও কথা, তবে কথাবার্তার মধ্যে এখনও একটা অদ্ভুত সারল্য আছে। সন্ধ্যার সময় ছাতে বসিয়াছিলেন গিরিবালা, কোলের শিশুটিকে লইয়া মেজবৌ আসিয়া মাদুরের এক পাশে বসিলেন। দু'-এক কথার পর বলিলেন—"বড্ড দেখবার ইচ্ছে ছিল তোমায় দিদি; এমনি ইচ্ছে হয়ই' নিজের বড় ননদ তো, কিন্তু শুধু সে জন্যেই নয়...."

গিরিবালা একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তবে আর কি জন্যে?"

মেজবৌ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর নূতন লোকের কাছে যেন

একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—"এখানে সবাই তোমার বড্ড নাম করেন, তিন ভাইয়েই দিদি বলতে অজ্ঞান...."

একটু হাসিয়া অস্বস্তিটা কাটাইয়া গিরিবালা বলিলেন—"তাদের দিদিই তো ?"

"দিদি তো অনেকেরই হয় ।...তা ভিন্ন আর একটা কথা—কিন্তু ঠাকুরপোকে বলো না দিদি, দোহাই তোমার, ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে আমায় অস্থির ক'রে তোলে।...বলছিলাম আট ছেলের মাকে দেখাও তো একটা পুণ্যি গা ; বলো না।" তাঁহাকেই সাক্ষী মানিবার ভঙ্গিতে বড় হাসি পাইল গিরিবালার ; সেটুকু সামলাইয়া লইয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাহার পরই বড়বৌ, দু'-তিন জন ছেলে-মেয়ে ; গল্পের স্রোতটা বিভিন্ন মুখে ছুটিল। বেলেতেজপুরের কথাই হইল বেশি। গিরিবালাই তুলিলেন, যাইবেন ; কত দিন যে দেখেন নাই। কিশোরকে বলিলেন—"তোরা তিন জনেই কয়েক দিনের ছুটি নে, একবার সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে আসি, কি জানি আমার মনটা এদিকে অনেক দিন থেকে তেজপুর তেজপুর করছে ; আর সত্যি আমার পক্ষে তো এই শেষ দেখাই !"

বড়বৌ কিশোরের পানে চাহিয়া কি একটা যেন ইঙ্গিতচ্ছলে শুধু বলিলেন —"ঠাকুরপো...."

কিশোরের মুখে একটি ম্লান হাসি জাগিয়া উঠিল, বলিলেন—"দিদি, বেলেতেজপুরে আর যেও না।"

একটু উৎসুক ভাবেই গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কেন রে ?"

"সে বেলেতেজপুর তো নেই-ই, এমন কি সেবারে যা দেখে এসেছিলে ততটুকুও নেই। তোমার তবু ভাগ্যি, খানিকটা ভালো ধারণা নিয়ে থাকবে ; আমাদের মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে—চোখ ফেটে জল আসে। চারি দিকে আগাছার বন—মানুষ চোখে পড়ে না—অমন যে বেলেতেজপুর..."

কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়াই রহিলেন সবাই, গিরিবালার চোখের তারা দুইটি খুব আস্তে আস্তে ঘুরিতে-ফিরিতেছে—স্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। একটু পরে বলিলেন—"যেতে একবার হবেই আমায় কিশোর। তবুও বেলেতেজপুরই তো যেটুকু পাই সেটুকুই মিষ্টি। ধর্না—মার কথা ছেড়ে দিই, জেঠাইমার কথাই ধর, যদি বেঁচে থাকতেন সে-জেঠাইমাকে তো পেতাম না—সেই টক্-টক করছে রং, সেই হাসিখুশি—হয়তো জবু-থবু হয়ে পড়ে থাকতেন বিছানাতে, কিন্তু তবুও তো...."

কিশোর বলিলেন—"তোমার তুলনাটা মন্দ হোল না দিদি, শুধু তফাৎ এই যে বেলেতেজপুর আর বেঁচেই নেই...."

তাহার পর প্রসঙ্গটার বেদনাটুকু যেন না বাড়াইবার জন্মই বলিলেন "বেশ যেও, আর সত্যিই তো একবার দেখে আসতে করেই মন।"

একটু যেন বানাইয়া বানাইয়া ভালোর দিকটা বলিয়া গেলেন, অনুগত অপেক্ষিতদের মধ্যে হারানের ছেলেদের অবস্থা ভালো। হারান নিজে নাই, তবে জোত-জমি, খামার-পুকুর রাখিয়া গেছে, দু'টি ছেলে একসঙ্গে আছে, ভালোই আছে। দুলাল বাগদি এখনও বাঁচিয়া আছে ; বয়স হইয়াছে—তা বছর পঁচাত্তর তো বটেই ; এখনও কিন্তু প্রতি বছর আমের সময় একটি ঝুড়ি গাছের আম মাথায় করিয়া দেখা করিয়া যাওয়া চাই-ই"...

এক সময় সাতকড়ি আর হরিচরণ আসিলেন, ছেলেমেয়েদের খাওয়াইবার জন্য বৌয়েরা নিচে নামিয়া গেলেন, বেলেতেজপুরের গল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া ভাই-বোনে যখন নামিয়া আসিলেন, রাত্রি তখন বেশ গভীর হইয়া আসিয়াছে।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল শিবপুরে, দেখা-শুনা, ঘোরা-ফিরার মধ্যে বেলে-তেজপুরে যাইবার দিন ঠিক হইতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে, শিবপুরেই যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনটাকে তৃপ্তিতে মন্থর করিয়া দিতেছে—বেলে-তেজপুর হইবে'খন—হাতের পাঁচই তো। ভাইয়েদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া মনটা হয়তো একটু অবসাদগ্রস্তও হইয়া থাকিবে ভিতরে ভিতরে।

দিন দশেক পরের কথা। হরিচরণ আহারাদি সারিয়া আফিসে বাহির হইতেছিলেন আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"দিদি একবার বাইরে এস তো, দেখোসে কে এসেছে।"

গিরিবালা রকে আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি ছেলে পদধূলি লইয়া লজ্জিত ভাবে অল্প হাসিমুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মোটা খদ্দরের কাপড়-পরা, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় একটা খদ্দরের টুপি ছিল, সেটা নামাইয়া হাতে ধরিয়া আছে ; পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল। সবাই চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে সামনে যেন একটা হেঁয়ালি ধরিয়া দিয়াছে। একটু ধোঁকা লাগিল গিরিবালার, একেবারেই অদেখা, তাহার পর ঐ পরিচ্ছদ ; কিন্তু বেশি বিলম্ব হইল না, একটা খুব ক্ষীণ স্মৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; এই রকমই একটি যুবা তাঁহার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ঠিক এই রকমই, বেশ মনে পড়ে ; শুধু অন্য বেশে ; গিরিবালার মুখখানা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন—"বিকাশ দাদার ছেলে না ?"

তাহার পরই কিন্তু বুকটা উদ্বেল হইয়া উঠিল, চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল, খানিকক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না গিরিবালা। আজ তিন বছর হইল বিকাশ দাদা মারা গেছেন, শেষ দেখা হয় নাই; মস্ত বড় একটা ত্রুটি থাকিয়া গেছে জীবনে। মনটা একটু হালকা হইলে দুই পা আগাইয়া গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"তোমার নাম কি বাবা?....ঠিক একেবারে বিকাশ দাদা বসানো!"

হরিচরণ বলিলেন—"নাম দিয়েছেন সমীর, সিমুরের সঙ্গে মিলিয়ে। দেশ আর গ্রাম নিয়েই তো সমস্ত জীবনটা কাটালেন।"

তাহার পর সমস্ত দিন সিমুরের গল্প চলিল, বিকাশ দাদাকে কেন্দ্র করিয়া যে-সিমুর। স্কুল ছাড়িয়া নিজের স্কুল গড়িয়াছিলেন—ঠিক এ-ধরণের স্কুল নয়, আশ্রম বলা হয় সেটাকে—সমীরের এই খদ্দর ঐ আশ্রমেই তৈয়ারি; সমীর একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল—"আমার নিজের হাতেই বোনা পিসিমা।... একবার লজ্জাটা কাটিয়া গেলে বেশ মুক্ত ভাবেই গল্প করিয়া গেল।....বেশ সুস্থ সবল চেহারা। বিকাশ দাদার মুখে এক একবার যে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িত এর মুখে তাহার যেন লেশমাত্রও নাই। কথাও বলে বেশ আশায় ভরা, বিশ্বাসে ভরা, সাহসে ভরা; বিকাশ দাদা ছেলের মধ্যে নিজেকেই যেন নিখুঁৎ করিয়া রাখিয়া গেছেন।

আশ্রমের তাগিদ আছে, তবুও তিন দিন ধরিয়া রাখিলেন গিরিবালা। রাত্রের আসরে সমীরের গল্পই একটানা চলে—ঐটুকু ছেলে কতই বা বয়স?—কুড়ি-একুশ, এই, কিন্তু অনেক জানে অনেক দেখিয়াছে এর মধ্যে। একবার জেল পর্যন্ত হইয়া আসিয়াছে···

ক্রমাগতই বকাইয়া যান গিরিবালা; সমস্তটা কি গল্পেরই মোহ?—এক-এক সময় মনে হয় বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন, দৃষ্টিটাই শুধু সমীরের দিকে আছে মন কিন্তু কোথায় বহু দূরে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে গল্পের মধ্যেই এক সময় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"ছেলেবেলায় যে কামিনী গাছটার তলায় খেলতাম আমরা, তার চারাটা বেশ ডাগর হয়ে উঠছে, সেবার দেখলাম,—আছে সেটা রে সাতকড়ি?"

সাতকড়ি উত্তর দিলেন—"থাকে কখনও? তুমি গেছলে সেও প্রায় এক যুগ হোল, কত বার বন জঙ্গল, কত বার কাটা হোল তার মধ্যে···"

গিরিবালার দৃষ্টিটা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, কিছু বলিলেন না কিন্তু। কথাটা

ভাইদের সবাই আর বড়বৌ অল্পে অল্পে বুঝিলেন। একটি ম্লান মৌন সবার মুখে রহিল ছাইয়া, সমীর অবশ্য না বুঝিয়া করিয়াই চলিল গল্প।

মাস খানেক কাটিয়া গেল। একবার বেলেতেজপুর দেখিয়া আসিতে হইবে, সমীর আসার পর থেকে সিমুর যাওয়ারও ঝোঁক হইয়াছে আরও বার-দুয়েক আসিয়াও ছিল সে। ভাইয়েরা ছুতানাতা করিয়া দিনটা পিছাইয়া দিতেছেন; ও দু'টো জায়গা হইলেই তো দ্বারভাঙ্গায় ফিরিবার তাড়া পড়িবে। গিরিবালা ভাইদের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়াছেন নিশ্চয়, জানিয়া শুনিয়াই এলাকাড়ি দিতেছেন। ...তাহার পর এক দিন আচম্বিতেই ফিরিবার জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিলেন।

খান-কতক বাড়ি পরেই গোঁসাইদের বাড়ি, গিন্নির সঙ্গে খুব ভাব হইয়াছে গিরিবালার। বাড়িতে বিগ্রহ ওঁদের গোপাল : নিজের পূজা সারিয়া গিরিবালা রোজ একবার প্রণাম করিতে যান, গিন্নির সঙ্গে গল্পস্বল্পও হয়। আজ গিয়াই দেখেন বাড়িতে হৈ-চৈ পড়িয়া গেছে,—গোপালের ভোগ রান্না হইয়া ওঠে নাই, গিন্নি বকাবকি লাগাইয়া দিয়াছেন, দু'টি বৌ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। গিরিবালা যাইতে গিন্নি তাঁহাকেই সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"বলুন দিদি, ঠাকুর শুনতেই ঠাকুর, অবোধ বালক বৈ তো কিছু নয়, বাড়িতে বেঁধে রেখে এই রকম করে উপোস করিয়ে রাখা—পূজোর নামে এ নিগ্রহ কেন বাপু?...."

গিরিবালা অবশ্যই বৌদের পক্ষই একটু লইয়া গিন্নিকে ঠাণ্ডা করিলেন। ভোগ হইয়াই আসিয়াছিল, ঠাকুরের আহার হইলে কিন্তু প্রণাম করিয়া দু'একটা কথার পরই তিনি উঠিয়া আসিলেন। সামলাইয়াই ছিলেন, বাড়িতে আসিয়া কিন্তু মনের বিষণ্ণতাটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বড় ভাজকে প্রশ্ন করিলেন —"বৌ হরিচরণ বেরিয়ে গেছে?"

কিশোর ছিলেন, বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন গা দিদি?"

গিরিবালা সহজ ভাবটা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"বলছিলাম ...বলছিলাম যে গাড়িটা কখন্?"

"বেলেতেজপুরের? গাড়ি তো অনেকগুনো...."

গিরিবালা বাধা দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"বেলেতেজপুরে আর যেতে দিলি কোথায়? দ্বারভাঙ্গার গাড়ির কথা বলছিলাম—ফিরতে হবে না?"

তিন বৌয়েই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ যাওয়ার কথায় সকলেই বিস্মিত হইয়া গেছেন, গিরিবালা মুখে হাসি টানিয়া রাখার চেষ্টা করুন, কিন্তু

হঠাৎ কিছু যে একটা হইয়াছে সেটা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বড়-বৌয়ের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য বেশি না হওয়ায় একটু সাহসের সঙ্গেই কথা বলেন, বলিলেন—"হঠাৎ এত তাড়া কেন দিদি? দু'দিন থাকবে আমরা এই জানি, হঠাৎ বাড়ি ঢুকেই গাড়ির খোঁজ? সেখানে শত্রু-মুখে ছাই দিয়ে সব ক'টি বৌ রয়েছে, কি আর তোমার এমন মাথা-ব্যথা গা যে…"

গিরিবালা হাসিবার চেষ্টা করিয়াই আরম্ভ করিলেন—"সেই জন্যই কি বৌ?—কতদিন হোল, যেতে হবে না?…"

তাহার পরই রাগিয়া উঠিলেন—"তুই যখন তুললিই কথা বৌ,—ঐ শৈলেনটা—মানুষের মতন মানুষ হয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হোত, নিশ্চিন্দি থাকতাম—এখন কি যমের বাড়ি গিয়েও আমার সোয়াস্তি আছে?…সময়ে ভাতের থালাটা সামনে পড়ল কি না পড়ল….অবিশ্যি, করছে না কি? বৌয়েরা আরও বেশি করেই করে বরং….কি কথায় কি কথা এসে পড়ল; তা নয়, ছেলেদের ভাবনা নয়; অনেক দিন হোলও তো এখানে…"

বেশ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ভাইয়েরা চেনেন, শৈলেনের কথাটা যে নিতান্ত হঠাৎ আসিয়া পড়ে নাই সেটা বেশ বুঝিলেন, বেশি জিদ করিলেন না। সেদিনই আর হয় না, তাহার পরের দিন যাওয়া ঠিক হইল।

যাওয়ার কিছুক্ষণ আগের একটি ছোট ঘটনা: মেজবৌ সকাল থেকেই যেন সুযোগ খুঁজিতেছেন, কিছু বলিতে চান। বিকালে একটু একান্তে পাইয়া বলিলেন—"দিদি, একটা কথা রাখবে?"

মুখে লজ্জা আর সঙ্কোচের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভয় লাগিয়া আছে; বড় কৌতূহল হইল গিরিবালার, প্রশ্ন করিলেন—"কি কথা, বল্ না।"

"যেন মাথায় সিঁদূরটুকু নিয়ে যেতে পারি; তুমি পুণ্যবতী, আশীর্বাদ করো দিদি।"

হিন্দু মেয়ের সাধারণ ভিক্ষা হইলেও, বিশেষ করিয়া চাহিবার কি এমন কারণ ঘটিয়াছে! কয়েক মুহূর্ত গিরিবালার মুখে কোন কথাই জোগাইল না। তাহার পর কারণটা বুঝিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বয়সের তফাৎটা একটু বেশি, তাই এই শঙ্কা; পিঠে হাত দিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"তাই যাবি বোন, আমার আশীর্বাদে যদি কিছু থাকে বল তো তাই যাবি।"

"বল খুবই আছে দিদি, আমি যাবই, দেখে নিও তুমি।"

গিরিবালা রাগ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মরণ! আমি বর দিলাম, ও

আমায় শাপ দিচ্ছে উলটে!—তুমি যাবে, আর আমায় তাই দেখতে হবে, আমিই বুঝি মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে এসেছি?”

ভাজকে দেওয়া আশীর্বাদ গিরিবালার নিজেরই একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

প্রায় বছর খানেক পরের কথা। চাকরি লইয়া শৈলেন গেছে বাহিরে। এই একটা বড় পরিবর্ত্তন সংসারে। গিরিবালা গিয়া গোছগাছ করিয়া দিয়া কিছু দিন থাকিয়া আসিলেন, সংসার আবার পুরানো খাতে বহিয়া চলিল; বাড়তির মধ্যে ছেলের উপর অভিমানটুকু আবার জাগিয়া উঠিল গিরিবালার মনে—এ-চিন্তাটুকু সে সঙ্গের সাথী করিয়া রাখিলই তাঁহার?

বর্ষার সন্ধ্যা। শরীরটা একটু খারাপ ছিল, শৈলেন আজ আফিসে যায় নাই, বাড়িতে বসিয়াই দিনের কাজগুলা আস্তে আস্তে শেষ করিয়া যাইতেছে। হঠাৎ টেবিলের উপর টেলিফোন্‌টা বাজিয়া উঠিল রিসিভারটা উঠাইতে খবর পাওয়া গেল একটা ট্রাঙ্ক কল আসিয়াছে। কানেক্‌শন দিল।

শশাঙ্ক দ্বারভাঙ্গা থেকে কথা কহিতেছেন। বাবার অসুখ; চিন্তার কারণ নাই, তবে শৈলেন যেন শীঘ্র চলিয়া আসে। তিন মিনিটের মেয়াদ, আরও দু'একটা এদিক-ওদিক কথা কহিতে সময়টা শেষ হইয়া গেল।

একটু ভুল হইয়া গেল। শশাঙ্কর উদ্দেশ্য এইটুকুই ছিল যে শৈলেন যেন অতিরিক্ত চঞ্চল না হইয়া পড়ে। শৈলেন কিন্তু সংবাদটা তাঁহার বলা মতোই গ্রহণ করিল, শরীরটাও ছিল খারাপ, রাত্রে যে একটা গাড়ি ছিল, সে-গাড়িতে আর গেল না।

পরদিন দুপুরে আবার একটা কল্। বোকার মত খবরটা যথাযথ ভাবেই লওয়ায় বিরক্ত হইয়াছেন শশাঙ্ক; বাবার অসুখটা খারাপই, শৈলেন যেন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসে।

বৈকালেই একটা গাড়ি। যেমন ছিল সব ফেলিয়া ছড়াইয়া শৈলেন যাত্রা করিল। মনে উদ্বেগের সঙ্গে অপরাধের গ্লানি লাগিয়া রহিয়াছে। কি দেখিবে গিয়া?—দেখিতে পাইবে কি?....কেন এমন ভুলটা হঠাৎ হইয়া গেল এমন করিয়া? বাবা আজ দুপুর পর্যন্ত ছিলেন—কাল যাইলে দেখা হইতই, এখন তো সবই অনিশ্চিত।

আর মা?—দু'জনকেই হারাইতে বসিল না কি শৈলেন? দাদার আঘাতের সময় মায়ের মুখে যে উদ্বেগ আর আশঙ্কা দেখিয়াছিল শৈলেন সেটা তো মৃত্যুর কাছাকাছিই একটা ব্যাপার; আর বয়স হইয়াছে মা'র, আরও

দুর্বল—সে-দুর্বলতার মধ্যেও আছে তাহারই অপরাধ···মা সহিতে পারিবেন না, তাঁহাকেও হারাইতে হইবে ; ভগবান দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্যই কি এই ভুলটুকু করাইলেন ?

রাত্রি বারোটার সময় শৈলেন আসিয়া স্টেশনে নামিল। বাড়ি পর্যন্ত পথটা যেন পৃথিবীর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত পড়িয়া আছে—সুদীর্ঘ ক্লান্তিতে ভরা, অথচ এ-ও সাহস হয় না যে এক কথাতেই গিয়া পৌছাইয়া যাই।····কী দেখিতে হইবে ?

বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। বাবার ঘরের একটা দরজা বাহিরের দিকে ; সেটা খোলা রহিয়াছে। শৈলেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বাবা বিছানার মাঝখানে চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, পাশে মা আছেন বসিয়া। পা দুইটি ছড়ানো। বোধ হয় দুই-তিন দিন আগে আলতা পরিয়াছিলেন, হালকা রাঙা দাগ লাগিয়া আছে।

শুধু সুস্থ দেখাই নয়, দুই জনের সংস্থানের মধ্যে এমন অনির্বচনীয় কিছু একটা ছিল যাহার জন্য শৈলেন প্রণাম ভুলিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল,—যেন একটি পৌরাণিক উপাখ্যান মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে সামনে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বিলম্ব ; তাহার পর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে বিপিনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"ভালো ছিলে তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া শৈলেন মা'র মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। গিরিবালা বলিলেন—"এখন অনেকটা সামলেছেন, তবে হয়েছিল ভয়ানক ; দু'টো দিন আর দু'টো রাত যে কি ভাবে কেটেছে, বুকের আর পিঠের যন্ত্রণায় ক্রমাগত ছটফট করেছেন, উঠে স্বস্তি নেই, শুয়ে স্বস্তি নেই, বসে স্বস্তি নেই, দাঁড়িয়ে যেন দেখা যায় না—এমন কাৎরানি—বাবাঃ, ঢের অসুখ দেখেছি, এ রকম যন্ত্রণার অসুখ দেখিনি···"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"অতিরিক্ত ভয় পেয়ে গেছে এরা শৈলেন।"

গিরিবালা বলিলেন—"তুমি চুপ করো বাপু, ভয় পেয়ে গেছে সাধে ! সে যদি দেখতিস শৈল, ডাক্তারের পর্যন্ত ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছল। এখন তো সামলেছেন অনেকটা আজ দুপুরের পর থেকে, সকাল পর্যন্ত যে কি অবস্থা গেছে, মনে হলে জ্ঞান থাকে না। কী যে হবে, আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না শৈল···"

শৈলেন মা'র পানে চাহিয়া আছে, এক অদ্ভুত দৃশ্য, একেবারে অপ্রত্যাশিত বলিয়া আরও অদ্ভুত বোধ হইতেছে,—মা খুব শুকাইয়া গেছেন, চোখে-মুখে

রাজ্যের শ্রান্তি ; দু'দিন দু'রাত এক মুহূর্তের জন্য চক্ষু বোজেন নাই, সমস্ত ঝড়টার মধ্যে সাধ্যমতো যে নিজেকেই আগাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, এর চিহ্ন সমস্ত শরীরে সুস্পষ্ট। কিন্তু এই বিশুষ্কতা—বিশৃঙ্খলার পাশেই আরও একটি জিনিষ আছে যাহাতে মনে হয় মা যেন তপস্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন—সিদ্ধি একেবারে হাতে লইয়া। দাদার আঘাতের সময় মাকে দেখিয়াছিল, আজও দেখিতেছে—কত তফাৎ যে যেন হিসাব হয় না। সে উদ্বেগ, সে আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই, ক্লান্তির সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে একটি গাঢ় শান্তি ; ভয়ের ভাষাতেই অবস্থাটা বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আছে একটি গভীর নিশ্চিন্ততার সুর। মুখে বলিতেছেন—আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না শৈল, কিন্তু বেশ বোঝা যায় কূলের রেখা তাঁর দৃষ্টিতে খুব স্পষ্টই একেবারে।

বাড়ির ভিতরে আরও কয়েক জন জাগিয়া তখনও, ছোট ভাই খোকা, ডাক্তার, ওষুধ লইয়া আসিল, শৈলেন আসিয়াছে শুনিয়া শশাঙ্ক আসিলেন। ঘরেই একটু গল্প-স্বল্প করার পর বলিলেন—"ভেতরে চল, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক্।"

ভিতরে আসিয়া শৈলেন সমস্ত ইতিহাসটা ভালো করিয়া শুনিল। শক্তিমান্ লোক নিজের শক্তিমত্তায় অতিরিক্ত বিশ্বাসে এক এক সময় যে বিপদ আনিয়া ফেলে এ ও হইয়াছে তাই। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে কিছু জমি আছে, রেলে করিয়া যাইতে হয়। পাণ্ডুল থেকেই জমির উপর টান, ছেলেদের মানা সত্ত্বেও বিপিনবিহারী নিজে গিয়া দেখা-শুনা করেন। এবার ট্রেন ধরিবার সময় বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় বাড়ির গাড়ি হইতে নামিয়া প্লাটফর্ম আর পুলের উপর দিয়া খানিকটা ছুটাছুটি করেন। সেখানে গিয়া পিঠে একটা বেদনা ওঠে, এবং বুক পর্যন্ত চারাইয়া পড়ে। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ডাক্তারকে না দেখাইয়া বিপিন-বিহারী জমির মুন্সিকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসেন। ওদিককার মেটো রাস্তা, তারপর রেলগাড়ি, পরে ঘোড়ারগাড়ি—সমস্ত ধকোলটা অসুস্থ শরীরের উপর বহিয়া বিপিনবিহারী যখন বাড়ি পৌঁছিলেন তখন রোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায়।

শশাঙ্ক বলিলেন—"ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েই চিকিৎসা আরম্ভ করলে শৈল,—'থ্রম্বসিস অব দি হার্ট'—বাঁচে খুব কম, এ বয়সে তো নয় বললেই চলে—তায় যে ভাবে আরম্ভ হয়েছে আর যে ষ্টেজে চিকিৎসা সুরু হয়েছে.... দু'টো দিন আর দু'টো রাত যে কি ভাবে কেটেছে! তুই পরের গাড়িতেই না এসেই ভুল করেছিলি নিশ্চয়, কিন্তু সামলে যখন গেছে এখন মনে হচ্ছে

না এসে ভালোই হয়েছিল—বাবার সে বিশ্রী ছটফটানি চোখে দেখতে হয়নি।"

তাহার স্মৃতিতেই যেন শশাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শৈলেন প্রশ্ন করিল—"এখন ডাক্তাররা কি বলছেন, বিপদটা কেটে গেছে?"

"অতটা ভরসা দেন না, বয়সটা তো খারাপই। তবে আমি এ সব ব্যাপারে লক্ষণটা আবার অন্য জায়গাতেও খুঁজি....তুই মা'র মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করেছিস?"

শৈলেন দৃষ্টি তুলিয়া একটু হাসিল, বলিল—"করেছি দাদা, অথচ তুমি যখন ভূমিকম্পে চোট খেয়ে পড়েছিলে, কি আতঙ্ক মা'র চোখে!"

ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে মা বড় দুর্বল শৈল, স্বভাবটাই ঐ রকম ওঁর,—একটু কিছু হোলে তাই যেন ভেঙে পড়েন, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে ওঁর অদ্ভুত একটা শক্তি আছে যেন। আমি এমনই একটু আশাবাদী, জানিসই, তায় এই মায়েরই ছেলে তো, ওঁর এই অদ্ভুত নিশ্চিন্দি ভাব দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে বিপদ যেন কাটিয়ে উঠেছি আমরা।"

হয়ত এ সবই কল্পনা মাত্র,—মা লইয়া ছেলের তো থাকেই গুমর—গিরিবালার ছেলের তো আরও বেশি করিয়াই থাকিবার কথা, নয়তো পরমায়ু কি এতই দেওয়া-নেওয়ার জিনিষ? গিরিবালার যে প্রশান্তি, যে নিঃসংশয় নিশ্চিন্ততা সেটা হয়তো ওঁর জীবনেরই সহজ পরিণতি, যিনি সব দিয়াছেন তাঁহার উপর অটল বিশ্বাসেরই একটা দিক,—যদি ফিরাইয়াই লন তিনি আবার সব তো করিবারই বা আছে কি? প্রসন্ন মনেই তাঁহার এই বঞ্চনাকেও মাথা পাতিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় কি আছে আর?

শৈলেন ভাবে এ কথা; যুগটাই যে এই রকম—জ্ঞানের আলোয় পদে-পদেই বিজ্ঞানের সংশয়-ছায়া আসিয়া পড়িতেছে,—সম্ভব ছিল কি সাবিত্রীর তপস্যা? মৃত্যুর অসপত্ন অধিকারের মধ্যে মানুষ তার চিন্তা, বাসনা, আশা লইয়া এমন ভাবে কি পারে বিপর্যয় ঘটাইতে? প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, তবে তা'তে শৈলেনের গর্বের এতটুকু হয় না লাঘব,—ঐ যে অটল বিশ্বাসের প্রশান্তি, সে-ও তো একটা তপস্যাই—তার মায়েরই....এই বিশ্বাসই কি আরও বড় তপস্যাই নয়?

কিন্তু বিশ্বাসের তপস্যাই হোক বা আয়াসের তপস্যাই হোক, গিরিবালাকে

তাহার মূল্য চুকাইয়া দিতে হইল। বিপদ কাটিল, কিন্তু সময় হইল এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গিরিবালার স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বাহিরটা কিন্তু ক্রমেই হইয়া উঠিতে লাগিল আরও প্রশান্ত আরও প্রসন্ন, আরও উজ্জল।....এ তো হয়ই—ইন্ধন যত আসে দগ্ধ হইয়া শিখার উজ্জলতা তো ততই আরো বাড়ে।

৫

বিপিনবিহারী অসুখে পড়িয়াছিলেন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, ভাদ্রের শেষের দিকে এক দিন ডাক্তারেরা বলিলেন, আর ভাবনার তেমন কিছু নাই।

গিরিবালা পূজা করিতেছিলেন, আসিলে বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"এবার আমার ছুটি, ডাক্তাররা বাইরে ঘুরে-টুরে বেড়াবার হুকুম দিয়ে গেল। একটু থামিয়া বলিলেন—"তোমারও ছুটি....বড্ড ভুগলে দু'টো মাস ধরে...."

গিরিবালা একটু হাসিয়া স্বামীর মুখের ওপর দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—"দিলে তো ছুটি নিজের মুখে?"

বিপিনবিহারীর হাসিটা সঙ্গে-সঙ্গেই মলিন হইয়া যাইতেই গিরিবালার হুঁস হইল। কথাটা যেন অতর্কিতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে—শেষ বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আগে যাওয়া লইয়া হয় রহস্য—হয়তো সেই অভ্যাসেই। তবুও ঠিক এই সময়টিতে বলিবার কথা নয় যেন। চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়াই বলিলেন—"ঘোরাঘুরি কিন্তু বুঝে করতে হবে। নিজের ভোগান্তির কথা এত শীগগির ভুললে চলবে না। আমার আর কতটুকু ভুগতে হয়েছে?"

আরও অন্য কথা আনিয়া ফেলিলেন—ঐ দু'টি কথা কিন্তু সমস্ত দিন থাকিয়া থাকিয়া বিঁধিতে লাগিল মনে—নূতন কথা নয়, কিন্তু কেমন যেন বেমানান হইয়া গেছে।

আশ্বিন আসিয়া পড়িল। এবারে বর্ষাটা ছিল প্রবল—শুধু আকাশেই নয়, মনেও, তাই আশ্বিনটা লাগিতেছে বড় মিষ্ট। আরও একটা কারণ আছে, বিপিনবিহারীর অসুখের উপলক্ষে পূজার ছুটির সঙ্গে কিছু বেশি ছুটি লইয়া, বাহিরে যে ছেলেরা আছে কিছু দিন আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের আসা নিয়মিত নয়, এবারে তাহারাও আসিয়াছে, এমন কি নাতনিদের লইয়া

নাৎজামাইয়েরাও ; আত্মীয়দের মধ্যেও কেহ কেহ আসিবে চিঠি দিয়াছে।....
একটা বড় কঠিন অসুখ হইতে তো উঠিলেন বিপিনবিহারী, নূতন করিয়া
একবার দেখিবার আগ্রহ জাগিয়াছে সবার মনে। বহু দিন পরে সংসারটি পরি-
পূর্ণতায় যেন নিটোল হইয়া উঠিয়াছে। আরও পূর্ণ বরং আগের চেয়ে,—সবারই
তো এখন নিজের নিজের সংসার—শাখায় শাখায় প্রশাখা,— প্রশাখায় পল্লব....

ছোটরাই থাকে সর্বক্ষণ ঘিরিয়া। তাহাদের গল্পের চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু
সময় বাঁচে সেটুকু পূজা, সংসার ছেলেমেয়ে আর বিপিনবিহারীর মধ্যে ভাগাভাগি
হয়।....ছেলেরা একটু বেশি আদায় করিবার চেষ্টা করে—বিশেষ করিয়া যে
কয় জনের বাহিরে বাহিরেই কাটিতেছে। বলে—"গল্প তোমার ফুরোয়
না মা ?—ঝুলিতে যা আছে ঝেড়ে দিয়ে হঠাও না ওদের।....নতুন আরব্যোপন্যাস
ফেঁদেছ না কি ?"

চলতি গল্পের ঝুলি অনেক দিনই খালি হইয়াছে, গিরিবালা এখন অবলম্বন
করিয়াছেন নিজের জীবনকে। আরব্যোপন্যাসই বটে ; জীবনের এ-প্রান্ত
থেকে কি অপরূপই লাগে ও-প্রান্তের ছবিগুলি—যেখানটা হাসির আলো,
আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে ; যেখানটা বিষাদের ছায়া, কি অপরূপই যে
তার স্নিগ্ধতা !....গল্প বলিয়া চলেন—বেলেতেজপুরের—কামিনী গাছের তলা—
সিংহবাহিনীর উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গণ ; সিমুর—সাঁতরার গঙ্গার সেই প্রথম
দিনের রূপ, জীবনে যাহা কেমন করিয়া চির নূতনই রহিয়া গেল ; পাণ্ডুলের
অবরোধ আর তার বাইরের মুক্ত জীবনের স্বপ্ন ; এই দ্বারভাঙ্গারই পুরানো
ইতিহাস— যেদিন অশ্রুজলের সঙ্গে প্রথম আসিলেন, তার পরে....

চুপ করিয়া সবাই শোনে, নাতি-নাতনিদের মধ্যে যারা হয় তো একটু বেশি
ভাবুক হাঁ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে—এত প্রত্যক্ষ—এই 'গিন্নি', ঐ
দাদু, ঐ বাবা মা-কাকারা এদের ঘিরিয়া এত রূপ-কথা !....গল্প শেষ হয় না—
আরব্য উপন্যাসের মতোই পার্বে-পার্বে শৃঙ্খল যায় বাড়িয়া ; অনেক শ্রোতা,
বিপুল তাদের কৌতূহল—প্রশ্ন ওঠে, মূল গল্প পায় বাধা, নস্তি থেকে গিয়া পড়ে
দুলারমনে, দুলারমন থেকে হয় তো পালের মতো মোটা খসখসে শাড়ি-পরা
খজনী, খজনী থেকে ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে দুলালের বৌ।....একটি অপরূপ
আনন্দে-বিষাদে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সমস্ত জীবনটি যেন ঘুরিয়া বেড়ান্
গিরিবালা—যত গোড়ার দিকের, স্মৃতি ততই যেন আরও মিষ্ট ; যত মধু সব
ফুলের কেন্দ্রটিতেই জমা।

পূজা আসিয়া পড়িল। এমন পূজা গিরিবালার জীবনে আসে নাই, নিজের বলিতে যে যেখানে আছে সবাইকে মা দিয়াছেন আনিয়া—নিজে যেমন করিয়া সবাইকে লইয়া আসেন। কৃতজ্ঞতায় মনটা যায় ভরিয়া—তাহার মধ্যেই এক একবার হঠাৎ বিষাদের রেখাপাত হয়—খুব স্পষ্ট, ঠিক বোঝা যায় না; বিষাদের কোন কারণ নাই বলিয়া গিরিবালা চেষ্টাও করেন না বুঝিবার।...শরীরটা দু'দিন থেকে একটু যেন খারাপ যাইতেছে—খুব সামান্য একটু—হয় তো সেই জন্যই।

সহরে পূজা হয় কয়েক জায়গায়, বাঙালীর মেয়েরা তিন জায়গায় যায় মূর্তি দেখিতে—বারোয়ারি নদীর তীরে কালীস্থান আর বড়বাজারে এক বাঙালীর বাড়ির পূজায়। শরীরকে খুব আমল দিলেন না গিরিবালা—সময়ের পরিবর্তনে পূজার সময় হয়ই একটু খারাপ। তবে কাল মহাষ্টমী, উপোসের ব্যাপার আছে, স্নান করিয়া নিকটে বারোয়ারি-তলা হইতেই প্রতিমা দেখিয়া অঞ্জলি দিয়া আসিলেন। শরীরটা ভালো হইল কি আর একটু খারাপই, চেষ্টা করিয়াই সে-খোঁজটা যেন এড়াইয়া গেলেন। ভরা বাড়িতে বাড়িভরা আনন্দের হট্টগোল, একটি প্রসন্ন, স্মিত হাস্যে তাহারই মধ্যে রহিলেন মিশিয়া, অষ্টমীর দিন ভালো করিয়াই স্নান করিলেন, তাহার পর গাড়ি আনাইয়া গেলেন কালীস্থান। অন্যান্য বার যে তৈয়ার রহিল তাহাকেই সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান; এবারে সব কিছুতেই কেমন একটা পূর্ণতার আবেগ আসিয়াছে, নিজেই তাগাদা দিয়া বধূদের, মেয়ে দু'টিকে এবং বড় নাতনিদের স্নান করাইলেন, তাহার পর তাহারা প্রস্তুত হইলে সবাইকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কালীস্থান, বড়বাজার, বারোয়ারিতলা হইয়া ফিরিতে প্রায় বৈকাল গড়াইয়া গেল। কাপড় বদলাইয়া গিরিবালা বারান্দায় পাতা একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন, উঠানে কচিদের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া গেছে, শৈলেন আসিয়া পাশে বসিল, দু'-একটা কথার পর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"মুখটা বেশি যেন শুক্‌ন মা তোমার!..."

"উপোস করে আছি তো?...ঘুরেও এলাম এই।"

"এই দেখো করেছ তো উপোস?....আর তোমার এ সব চলে না মা; কত বার বারণ করেছি সবাই। খেয়ে নাও তুমি।"

"এইটুকুর জন্যে আবার খাবো? আরতিটা দেখে একেবারে—"

একটা কেমন সন্দেহ হওয়ায় শৈলেন কপালে হাত দিল, তাহার পরই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"মা তোমার গা গরম।—এ কি, কচি মেয়ের মতম জ্বর লুকিয়েছ কেন মা?"

প্রবীণ এক দিক দিয়া হইয়াই পড়ে কচি; অবুঝ কচি মেয়েরই মতো মুখ ভার করিয়া গিরিবালা অনেকখানি অপ্রসন্নতার সঙ্গেই গিয়া বিছানায় শুইলেন —সবাই যেন জোর করিয়া তাঁহাকে এত সঙ্গীর মধ্যে পূজার এমন আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিল।....একটি ছায়া পড়িল বাড়িতে, তবে ছেলেপুলের বাড়ি, একটা চাঞ্চল্য রহিলই জাগিয়া।

এদিকে মাঝে-মাঝে কয়েক বার হইয়াছেও বাতিকের জ্বর, একেবারে চরম কিছুর আশঙ্কা জাগিল না কাহারও মনে। সে রকম কিছু লক্ষণ দেখা দিল না। নবমীর রাত্রি পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসাতেই জ্বরটা রহিল এক ভাবে আটকাইয়া। কিছু যে হয় নাই উৎসবের বাড়িতে সে-ভাবটা বজায় রাখিবার জন্যই যেন গিরিবালা নাতি-নাতনিদের বেশি করিয়া ডাকিয়া গল্প করিলেন।...প্রবঞ্চনা দিয়া নিজেকে লুকাইয়া সংসার করাই তো অভ্যাস; অসুখ শরীরে খালি-পেটে পান চিবাইয়া এক দিন তো স্বামীকে করিয়াছিলেন বঞ্চিত, পুত্রকেও চাহিয়া-ছিলেন বঞ্চিত করিতে।

দশমীর দিন আর বঞ্চনা চলিল না; বাড়াবাড়ি হইল, ডাক্তার শুষ্ক মুখে বলিলেন—ম্যালিগনেণ্ট ম্যালেরিয়া—ব্রেন অ্যাফেক্ট করতে পারে যে কোন সময়েই।

বিজয়ার রাত্রি বলিয়াই সবার মুখ যেন আরও শুকাইয়া গেল; একটা অন্ধ ভয়—গিরিবালার বিদায় হওয়ারই যে রাত্রি এটা।

কিন্তু অপূর্ণতা জীবনে কোনখানেই ছিল না, আজও রহিল না; সজ্ঞানেই স্বামীর বিজয়ায়-পদধূলি লইলেন গিরিবালা, সজ্ঞানেই সবাইকে বিজয়ার পদধূলি দিলেন।

পর দিন সকাল হইতেই চৈতন্য লোপ পাইল। আশা তবু ধরিয়াই রহিল সবাই, বিজয়া যখন কাটিয়া গেছে তখন আর ভয় নাই নিশ্চয়।... সন্তানদের উপর আশার শেষ আশীর্বাদটুকুও দু'দিন ধরিয়া বিতরণ করিয়া, ত্রয়োদশীর দিন সকালে গিরিবালা জীবনের শেষ নিশ্বাস মোচন করিলেন।